STUDIES IN A DYING CULTURE

CHRISTOPHER CAUDWELL

Translated by

Ranendranath Bandyopadhaya

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশক :

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ এম. এ.

পপুলার লাইব্রেরী

১৯৫/১ বি, বিধান সরণী,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর :

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী

ক্যালকাটা সিটি প্রেস

৯এ, মনোমোহন বসু স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বিষয় সূচী

অনুবাদকের ভূমিকা

বিশের দশকের রমরমা তেজী বাজারে হঠাৎ মন্দা দেখা দিল। পৃথিবীর তখনকার সব থেকে অগ্রসর পুঁজিপতি দেশ ইংলণ্ড। সেখানেও বেকারের লাইন লম্বা হতে থাকে; ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত কর্মচারীরাও এই প্রথম দেখতে পেলেন যে তাঁদের অবস্থাও শিল্পশ্রমিকের মতই অসহায়। শিল্পসমৃদ্ধি ঘটেছে অভাবনীয় অথচ সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যদুর্দশা বেড়েছে বহুগুণ। জাঁদরেল ভবিষ্যৎবক্তা পণ্ডিতদের যেসব উপদেশ পরামর্শ আগে অনেকে বেদবাক্যের মত অমোঘ মনে করতেন, তাঁদের সেসব কথায় আর কাজ হচ্ছে না। অবস্থার উন্নতির জন্য দ্রব্যমূল্য ঠিক রাখতে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে খাদ্য ও শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজ সম্পদ ধ্বংস করা হতে থাকল। অতি উৎপাদনের কুফল এড়ানোর জন্য কোন কোন পণ্ডিত গুরুত্ব দিয়েই বললেন শিল্প-উৎপাদনে উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার এখন কিছুদিন বন্ধ থাক, সেটাই একমাত্র দাওয়াই। কেউ বললেন কায়িক শ্রম বাঁচানোর জন্য নতুন যন্ত্রের প্রয়োগ ত বন্ধ করতেই হবে, এমন কি যন্ত্রের সাহায্যে যেসব কাজ হত সেসব কাজও বরং কায়িক শ্রমের সাহায্যেই হোক। বেকার সমস্যার সমাধান হবে! শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষ কিন্তু বুঝলেন অন্যরকম। পৃথিবীর অন্যতম পুঁজিবাদী দেশ বৃটেনের ইতিহাসের সব থেকে বড় সাধারণ ধর্মঘট হল ১৯২৬ সালে এবং সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে তা পঙ্গু করে দিল। বৃটেনের জনসাধারণ এক সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু 'জেনারেল কাউন্সিল অব দ্য ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেস'এর দুর্নীতি গ্রস্ত নেতৃত্ব সংগ্রাম প্রত্যাহার করে নিয়ে বিপ্লবী সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে যে ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কোনওদিন মার্ক্সের অস্তিত্বকে স্বীকার করেনি, একটা শিক্ষকতার চাকরি দিতেও ইংলণ্ডপ্রবাসী মার্ক্সকে রাজি হয়নি, যে ইংলণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের ছোট ছোট অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান চাঁদা তুলে কোন মতে চিকাগোর কার কোম্পানি থেকে মার্ক্সের রচনাবলী কিনে আনত সেই মার্ক্সের পথনির্দেশের মধ্যে এখন বুদ্ধিজীবী সমাজ বাঁচার পথের দিশারী আলোর সন্ধান পেতে থাকল।

ক্রিস্টোফার কডওয়েলের আসল নাম ক্রিস্টোফার সেণ্ট জন স্প্রিগ। জন্ম ইংলণ্ডের পাটনি শহরে ১৯০৭ সালের ২০ অক্টোবর। লেখাপড়া শেখেন ইলিঙের সেণ্ট বেনেট রোমান ক্যাথলিক কলেজে। ছোট থেকেই কাব্য ও বিজ্ঞান দুদিকেই তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। সতের বছর বয়সে লেখাপড়া শেষ করে রিপোর্টার হিসাবে

ইয়র্কশায়ার অবজার্ভার কাগজে বছর তিনেক কাজ করেন। তারপর লণ্ডনে ফিরে 'বৃটিশ মালয়' পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং ভাইয়ের সঙ্গে একটি বিমান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশন সংস্থা গড়ে তোলেন। জীবিকার প্রয়োজনে পঁচিশ বছর বয়সের আগেই বেশ কিছু ছোট গল্প, কবিতা, ডিটেকটিভ উপন্যাস ও বিমানবিদ্যার উপর নিবন্ধ রচনা করেন। ১৯৩৪এর শেষ দিকে মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে পড়াশুনা সুরু করেন। ১৯৩৫এর মে মাসে কডওয়েল ছদ্মনামে একটি গুরুগম্ভীর মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস লেখেন, নাম 'দিস মাই হ্যাণ্ড'। কর্ণওয়ালে কিছুদিন কাটিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসে তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ইলিউশন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটির' খসড়া করেন। ডিসেম্বরে লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে পপলারে বাসা নেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 'পপুলার ফ্রণ্ট' আন্দোলন সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে কয়েকমাস পরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিতে যান। ইতোমধ্যে জুলাই মাসে স্পেনের গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। সেখানকার পপুলার ফ্রণ্ট সরকারকে সাহায্য করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির পপুলার শাখা নভেম্বর মাসের মধ্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করে একটি অ্যাম্বুলেন্স কেনে। ফ্রান্স পার হয়ে স্পেন সরকারের হাতে সেটি তুলে দেওয়ার জন্য কডওয়েলকে নির্বাচিত করা হয়। সেই দায়িত্ব পালনের পর সেখানকার আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বৃটিশ বিভাগে তিনি যোগ দেন। সেদিন ছিল ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৬।

নভেম্বর বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর সফল সংগ্রাম সেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম দিল। এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশের নিপীড়িত ও শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনিশ্চিত করে তোলে। ১৯২৯এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় পুঁজিপতিদের মরীয়া চেষ্টা চলতে থাকে আর সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চরম পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে ইতালিতে ফ্যাসিবাদ ও জার্মানীতে নাৎসিবাদ কায়েম হয়। তিরিশের দশকে এই বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্বের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠল স্পেন। সেখানে আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের সঙ্গে লড়াইয়ে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হচ্ছিল।

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ স্পেনের সাধারণ নির্বাচনে সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট অ্যানার্কিষ্ট ও বিভিন্ন রিপাবলিকপন্থী পার্টি জয়লাভ করে পপুলার ফ্রণ্ট সরকার গঠন করে। নির্বাচনের পরের দিনই দুপুরে সোস্যালিস্ট নেতা কাবালেরো ও আলভারেজ ভাইয়ো যান অস্থায়ী কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রী পোর্তেলো ভালাদারেসের সঙ্গে দেখা করতে। ভালাদারেস তাঁদের জয়লাভে অভিনন্দন জানান। সেই সঙ্গে এটাও জানান যে সেইদিনই সকাল চারটায় জিল রোবলস ও কালভো সতেলো তাঁর সঙ্গে

দেখা করে জানিয়ে গেছেন যে নির্বাচনে পরাজিত সমস্ত দলগুলি তাঁকে সমর্থন করতে প্রস্তুত যদি তিনি একনায়কত্বের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সেইদিনই সন্ধ্যা সাতটায় ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোও তাঁকে একই প্রস্তাব করেন। রোবলস ছিলেন ভূতপূর্ব লেরুকস মন্ত্রীসভার যুদ্ধমন্ত্রী। কালভো সতেলো ছিলেন তথাকথিত 'ন্যাশানাল ব্লকের' প্রতিষ্ঠাতা। নির্বাচনে এঁর দল মোট পাঁচশ সাতটি আসনের মধ্যে পেয়েছিলেন তেরটি। মরক্কোর সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন ফ্রাঙ্কো। নির্বাচনের পর ম্যানুয়েল আজানিয়া ই দিয়াস প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রীসভা গঠন করার আগেই তাড়াহুড়ো করে ভালাদারেস অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

এদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী শক্তি দ্রুত আগ্রাসী রূপ নিতে থাকে। ৫ মার্চ হিটলার গায়ের জোরে রাইনল্যাণ্ড পুনরধিকার করে। ফ্যাসিবাদের নখ দেখে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে স্পেনের পপুলার ফ্রন্টের নির্বাচনী সাফল্য বেশি করে মনে দাগ কাটল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে বিশেষ করে তার প্রভাব দেখা গেল। ফ্রান্সে এপ্রিল-মে মাসে সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা প্রাধান্য পেতে থাকে। ৫ মে মুসোলিনি আবিসিনিয়ার রাজধানী দখল করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সরকার পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার পথ নিল। ইউরোপের মানুষের অন্ততঃ বুঝতে দেরি হল না এইসব সরকারের আসল উদ্দেশ্য কি। ৫ জুলাই ১৯৩৬ ফরাসী রিপাব্লিকের প্রথম পপুলার ফ্রন্ট সরকার গড়লেন লিয়ঁ ব্লুম। সেই বসন্তে ইউরোপে এই দুমুখী হাওয়া বইলেও সর্বসাধারণ তখনও বামশক্তিগুলির একান্ত ঐক্যের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেনি।

মে মাসে আজানিয়া স্পেন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হলে কিরোগা প্রধানমন্ত্রী হলেন। ফ্রাঙ্কো, গদেদ, কাবানেল্লো, নানো, আরান্দা, মোলা দলবেঁধে এসে প্রথমেই তাদের আনুগত্য ঘোষণা করল। ১৭ জুলাই বিকেল পাঁচটায় আফ্রিকান বাহিনী বিদ্রোহ করে মেলিলায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দ্রুত গোটা মরক্কোয় ছড়িয়ে পড়ে। কাদিজ, করদোভা, গ্রানাদা, সেভিল, মালাগা—এককথায় পামপ্লোনা থেকে করুন্না পর্যন্ত গোটা উত্তর এলাকা বিদ্রোহীদের হাতে চলে যায়। আজানিয়া প্রেসিডেণ্ট হলে যাঁরা সব থেকে আগে এসে তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিল তারাই হল এই বিদ্রোহের নেতা। ১৯ জুলাই সকালে আজানিয়া মার্তিনেজ বারিওকে সরকার গঠন করতে বললে আন্দালুসিয়ার বৃহৎ জমিদারদের বন্ধু বারিও 'ন্যাশানাল রিপাবলিকান পার্টির' নেতা রোমানের সঙ্গে পরামর্শ করে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে। মাদ্রিদের জনগণ তীব্র ঘৃণায় চিৎকার করে ওঠে 'বিশ্বাসঘাতকতা', 'অস্ত্র নাও,' 'অস্ত্র নাও'। বিকেল চারটেয় মার্তিনেথ বারিও পদত্যাগ করে। 'স্পেনের

জনগণের উপর ফ্যাসিবাদের যুদ্ধ ঘোষণার' মোকাবিলা করার মত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত এমন এক নতুন সরকার গড়ার আশ্বাসও ঘোষণা করা হয়। জোসে জিরাল সেই সরকারের নেতা হবেন। দুজন রিপাবলিকান পার্টির অফিসার জেনারেল কাস্থেলো এবং জেনারেল সেবাস্তিয়ান পোথার উপর যুদ্ধ ও প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হল। অর্থাৎ এবারেও শ্রমিক ও বামপন্থী প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে পুরাপুরি রিপাবলিকান পার্টির সরকার গড়তে দিলেন আজানিয়া। ফলে এই সরকারও অচিরে অকেজো হয়ে পড়ল ; শেষ অবধি ডাকা হল সোস্যালিষ্ট নেতা লার্গো কাবালেরোকে। ৪ সেপ্টেম্বর স্পেনের প্রথম সোস্যালিষ্ট প্রধানমন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে নতুন সরকার গড়লেন কাবালেরো। স্পেনের মানচিত্রের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে ইতিমধ্যে দেশটি কার্যতঃ দুভাগে দুই পক্ষের দখলে চলে গেছে। একদিকে শিল্পসমৃদ্ধ এলাকা যেখানে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি বর্তমান এবং তা রয়েছে সংগঠিত শ্রমিকদের প্রভাবাধীনে। অপরদিকে রয়েছে পশ্চাৎপদ অঞ্চল। সেখানে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বর্তমান ; হতভাগ্য কৃষক ও গ্রামবাসীরা যেখানে বৃহৎ জমিদার, লাতিফুন্দিস্ত, ও গির্জার দ্বারা পুরাপুরি প্রভাবিত।

অগাস্টে মেরিদা ও বাদাহুথের পতন ঘটল। ফ্যাসিবাদী দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ সম্পন্ন। নভেম্বরের মধ্যেই বিদ্রোহী রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা গ্রহণ করে ফ্রাঙ্কো। রাজধানী মাদ্রিদ দখল করার সে হুমকি দিল, জানিয়ে দিল যে ৭ নভেম্বর সেখানে সমবেত প্রার্থনাসভায় সে যোগ দেবে। অর্থাৎ নভেম্বর বিপ্লবের স্মরণীয় দিনটিকে কুড়ি বছরের ভেতর সে পৃথিবীর লোককে ভুলিয়ে দেবে, ডুবিয়ে দেবে সেই স্মৃতি ফ্যাসিবাদের হিংস্র তাণ্ডবে। ৬ নভেম্বর কাবালেরো সরকার গোপনে মাদ্রিদ ত্যাগ করে ভালেন্সিয়ায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু পঞ্চম রেজিমেন্টের স্পর্ধিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনসাধারণ অস্ত্র তুলে নিলেন হাতে। মাদ্রিদের পথে পথে রক্তক্ষয়ী দিন ইতিহাস গড়ে তুলল। অলৌকিক সে ইতিহাস, স্পর্ধিত সে ইতিহাস, যে ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটেছিল রাজধানী মাদ্রিদের বেতারকেন্দ্র থেকে ১৮ জুলাই তারিখেই ঘোষিত নারীকণ্ঠের দৃপ্ত অহ্বানে। দোলোরেস ইবারুরি (লা পাসিওনারিয়া নামে যিনি খ্যাত) জানিয়েছিলেন প্রতিরোধের আহ্বান—No Passaran! 'ওদের জিততে দেব না।' 'হাঁটু গেড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মরাও ভালো!'

এই প্রতিরোধকে কেউ বলেছেন গৃহযুদ্ধ, কেউ বলেছেন অসমাপ্ত বিপ্লব, কেউ বলেছেন প্রতিবিপ্লবের ড্রেসরিহার্সাল বা পূর্ণাঙ্গ মহলা। স্পেনের সেই প্রতিরোধ সংগ্রামে পপুলার ফ্রন্ট সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা যুক্তরাষ্ট্র

কেউই রাজি ছিল না। জার্মানী ও ইতালির কথাই ওঠে না। সেখানে তখন ফ্যাসিবাদ কায়েম। তাদেরই আগ্রাসী 'স্বেচ্ছাসেবকরা' স্পেনের উপর হামলা চালাচ্ছে। 'হস্তক্ষেপ না করার' নীতির মুখোশ খুলে দিয়ে সোভিয়েত পাঠায় তার সাহায্য। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বিশ্বের যাবতীয় ফ্যাসিবিরোধী ও গণতন্ত্রকামী মানুষের কাছে ডাক দেয়: নিজ নিজ দেশে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে স্বাধীনতার সপক্ষে লড়াইয়ের জন্য তাদের স্পেনে পাঠাও। ২০ নভেম্বর রলাঁ এক মর্মস্পর্শী আবেদন জানান: 'মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারি। এসো, স্পেনকে সাহায্য কর! আমাদের সাহায্য কর! তোমাদের সাহায্য কর! কেন না তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন…!"

স্পেনের সেই দুর্দিনে পপুলার ফ্রন্টের হয়ে লড়াই করতে পৃথিবীর চুয়ান্নটি বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন প্রায় চল্লিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক। অবশ্য এঁরা সকলেই একই সঙ্গে একই সময়ে যে এসেছিলেন, তা নয়: বিশ্বস্ত সূত্র থেকে বলা হয়েছে যে এককালে সতের হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক কখনই স্পেনে ছিলেন না। এবং কোনও একক সংঘর্ষে ছ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবক কখনও অংশগ্রহণ করেননি। এঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। মোট পাঁচটি। এগার থেকে পনের নম্বর।

জার্মান স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গড়া এগার নম্বর ব্রিগেডের নাম ছিল থেলমান ব্রিগেড। জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কমিউনিস্ট নেতা আর্নেষ্ট থেলমান ৩ মার্চ ১৯৩৩ বার্লিনের সার্লটেনবুর্গ অঞ্চলে নাৎসিদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর হিটলারের বন্দীশিবিরে দীর্ঘকাল অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করেন। অবশেষে ১৮ অগাষ্ট ১৯৪৪ ওরা তাঁকে গোপনে হত্যা করে কুখ্যাত বুখেনভাল্ড বন্দীশিবিরে মাটিচাপা দেয়। জার্মান স্বেচ্ছাসেবকদের বেশির ভাগেরই ছিল সামরিক প্রশিক্ষণ, না হয়তে ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা। এঁরা সকলেই ছিলেন নাৎসিবিরোধী। মুয়েলা ত্ত তেরুয়েলের যুদ্ধে (১৮ ডিসেম্বর ১৯৩৭—২২ ফেব্রুয়ারি ৩৮) এঁদের শেষ স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু হয়। মাদ্রিদ রক্ষার সংগ্রামে জন্ম নিয়েছিল যে 'থেলমানের গান' (স্পেনের আকাশে ঝলমল করে তারা…ইত্যাদি) তা এই বীর বাহিনীরই সৃষ্টি। ফ্রান্ৎস ডাহ্‌লেম, হানস বেইমলার, হেনরিখ রাউ, গুস্তাফ ৎসিস্তা, হাইনৎস হফমান, লুই স্থার, লুডভিগ রেন, হান্‌স কাহ্‌লে ছিলেন এই ব্রিগেডে।

বার নম্বর ব্রিগেডটি প্রথমে তৈরি হয়েছিল জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী ফ্যাসিবিরোধীদের নিয়ে। ইতালির স্বাধীনতা ও ঐক্যের পক্ষে প্রথম যোদ্ধা বীর

গ্যারিবল্ডির নামে এটির নামকরণ হয়। মুসোলিনির ব্ল্যাক আরো এবং লিতোরিও বাহিনী নাকি অজেয়। গুয়াদালহারার সমতলভূমিতে বৃহয়েগার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে, আর আইবারা প্রাসাদদুর্গের প্রতিটি পাথরে সেই ফ্যাসিস্তবাহিনীর দর্প চূর্ণ করে দিয়েছিল এই গ্যারিবল্ডি বাহিনী। ইতালি থেকে যেসব পোড়-খাওয়া ফ্যাসিবিরোধী সহযোদ্ধারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা লুইজি লঙ্গো, সোশ্যালিস্ট নেতা পিয়েত্রো নেন্নি, ত্ম ভিত্তোরিও, নিনো নানেত্তি, ভিত্তোরিও ভিদালি, পাকিয়ার্দি, রোসেল্লি।

পোল, চেক ও পূর্ব ইউরোপের স্লাভভাষাভাষী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গড়া তের নম্বর ব্রিগেডের নামকরণ হয়েছিল পোল বীর দমব্রাউস্কির নামে। জারের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে পোলাণ্ডের সংগ্রামে অমর এই বীরের নাম পোলরা আজও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন।

চোদ্দ নম্বরটি গড়া হয়েছিল ফরাসী ও বেলজিয়ান স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে। এটির নাম ছিল ফ্রাঙ্কো-বেলজি ব্রিগেড। এতে ছিলেন দুমঁ, আঁদ্রে মার্তি, ফাবিয়েন, ডা.-রকে, আঁদ্রে মালরো, রল তাঙ্গি'র মত জগদ্বিখ্যাত সব বীর। ফরাসী বিপ্লব, প্যারি কমিউন, এবং আরও আধুনিক কালের ফরাসী ও বেলজিয়ান সর্বহারা শ্রেণীর গৌরবময় জয়গাথায় একদিন মুখর হয়ে উঠেছিল স্পেনের বাতাস এঁদের কণ্ঠে। সেই বছর শীতের শেষে মাদ্রিদে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের বীর সৈনিকদের সমাধিপ্রাঙ্গনে তাঁদের স্মৃতিফলকের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হত 'এযেন প্যারিরই কোনও রাস্তা।'

পনের নম্বর লিঙ্কন ব্রিগেডে ছিলেন ইংরেজিভাষীরা ১৯৩৬ এর নভেম্বরের শুরুর দিকে এবং মাদ্রিদ রক্ষার লড়াইয়ের সময়ের কথা বাদ দিলে, স্পেনের যাবতীয় বিখ্যাত রণাঙ্গনে বাতাসে হিল্লোলিত হয়েছে এঁদের পতাকা, মাটি ভিজেছে এঁদের রক্তে। অন্যান্য ব্রিগেডের মত এটিতেও প্রথমে ছিলেন নানা ভাষাভাষী, যেমন স্লাভ দিমিত্রভ ব্যাটেলিয়ন এবং ফরাসী '৬ ফেব্রুয়ারি' ব্যাটেলিয়ন। বুলগার জনগণের বীর বিপ্লবী নেতা জর্জি দিমিত্রভ ছিলেন বুলগেরীয় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের পরে ৯ মার্চ ১৯৩৩ নাৎসি শান্ত্রীদের হাতে বন্দী হন। কিছুদিন আটক রাখার পর লাইপৎসিগে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে শুরু হয় ঐতিহাসিক 'রাইখস্টাগ বিচার' (২০. ৯. ১৯৩৩)। মিথ্যা অভিযোগের মামলা থেকে মুক্তিলাভের পর তাঁকে হত্যার জন্য ফ্যাসিস্তরা চক্রান্ত করে। কিন্তু সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে সোভিয়েত বিমান তাঁকে সোভিয়েত দেশে নিয়ে যায় এবং সেই দেশের নাগরিকত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। সমস্ত বলকান রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি, ক্রোট,

বুলগার, রুমানীয়, সার্ব ও প্যারির যুগোস্লাভ ছাত্রদের নিয়ে গড়া হয় এই দিমিত্রভ ব্যাটেলিয়ন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই ব্রিগেডে থাকে চারটি ব্যাটেলিয়ন ও তার সাহায্যকারীরা। এর মধ্যে তিনটি ইংরেজিভাষী ও চতুর্থটি স্প্যানিশ। প্রথমটি ইংলণ্ডের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গড়া শাকলাতওয়ালা ব্যাটেলিয়ন। শাকলাতওয়ালা ছিলেন বৃটিশ পার্লামেন্টের লণ্ডন জেলা থেকে নির্বাচিত ভারতীয় সদস্য। এই ব্যাটেলিয়নে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে খ্যাতনামা মহিলা শিল্পী ফেলিসিয়া ব্রাউন, র‍্যালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, জন কর্নফোর্ড, ক্লাইভ ব্রানসন (ভারতে জন্ম, বৃটিশ নাগরিক), ভারতীয় কৃষক নেতা গোপাল মুকুন্দ হুদ্দার ও মুলক রাজ আনন্দের নাম সুপরিচিত। দ্বিতীয়টি কানাডাবাসীদের নিয়ে গড়া ম্যাকেঞ্জি পাপিনো ব্যাটেলিয়ন। ১৮৩৭ সালে এই ইংরেজ কলোনির দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতা ও ফাটকাবাজদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি ও পাপিনো একত্রে এক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। তৃতীয়টি কিউবা, মেক্সিকো, পুয়ের্তো রিকো এবং অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকাবাসী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গড়া ২৪ নম্বর (মতান্তরে ৫৯ নং) স্প্যানিশ ব্যাটেলিয়ন। চতুর্থটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গড়া আব্রাহাম লিঙ্কন ব্যাটেলিয়ন।

নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিখ্যাত অনেক মানুষ এই সব ব্যাটেলিয়নে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা কেউ স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছে, কেউ পরে অন্যান্য ক্ষেত্রে আরও সম্মান অর্জন করেছেন। যাঁরা এই যুদ্ধের পরেও বেঁচেছিলেন তাঁরা অনেকেই পরে বিশ্বযুদ্ধের কালেও অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন অথবা পরবর্তীকালের ইতিহাসে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাক্ষর রেখেছেন। পোলাণ্ডের বীর জেনারেল স্বোয়াইয়ের জিউস্কি স্পেনে জেনারেল 'ওয়াল্টার' নামে সুপরিচিত ছিলেন; রিপাবলিকান আর্মির ৩৫ নম্বর ডিভিসনের সেনাপতি হয়েছিলেন। পরে হিটলারের সেনাবাহিনীর হাত থেকে যে পোল বাহিনী ওয়ারশকে মুক্ত করে, তিনি তার সেনাপতি হন। প্যারিকেও একইভাবে মুক্ত করে যে স্বাধীন ফরাসী বাহিনী তার সেনাপতি হয়েছিলেন ১৪ নম্বর ব্রিগেডের ভূতপূর্ব কমিশার কর্নেল রল তাঙ্গি। গ্যারিবল্ডি ব্রিগেডের রন্দলফ পাকিয়ার্দি বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রথম ইতালীয় সরকারের (গ্যাসপেরি) মন্ত্রী হয়েছিলেন। লুইজি লঙ্গো পরে উত্তর ইতালিতে জার্মানদের বিরুদ্ধে পার্টিজান আন্দোলন পরিচালনা করেন, যেমন করেন নিজ নিজ দেশে বুলগরিয়ার পার্টিজান বীর সাবি দিমিত্রফ বা যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো। ঔপন্যাসিক আঁদ্রে মালরো স্পেনে আন্তর্জাতিক বিমান বাহিনীর প্রথম স্কোয়াড্রনের সংগঠক। ইতালীয় ও জার্মান কণ্ডর লেজিয়নের বাছাই করা বিমান বহরের বিরুদ্ধে আকাশযুদ্ধে নামে এই

স্কোয়াড্রনটি, রুশ বিমান তখনও এসে পৌঁছায়নি। হিটলার-অধিকৃত ফ্রান্সে গোপন এফ. এফ. আই সংগঠনেরও তিনি ক্যাপটেন ছিলেন এবং পরে ফরাসী মন্ত্রীসভাতেও যোগ দেন। যুক্তরাষ্ট্রের আর্নেস্ট হেমিংওয়ে উপন্যাসের ক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছেন। সেই দেশেরই আর্থার এচ. ল্যান্ডিস পনের নম্বর ব্রিগেডের ইতিহাস লিখেছেন, লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Spain ! The Unfinished Revolution ! ল্যান্ডিস ছিলেন ম্যাকেঞ্জি-পাপিনো ব্যাটেলিয়নের স্বেচ্ছাসৈনিক। কানাডার নরম্যান বেথুন স্পেনে ব্লাডব্যাঙ্ক ব্যবস্থার জনক। ইনি পরে চীনা অষ্টম রুট বাহিনীর সঙ্গে আহতদের চিকিৎসার কাজে জীবন দান করেন।

আলবাথিটে প্রথম আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছিল এবং আশা করা গিয়েছিল যে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিভিশনের রূপ দেওয়া যাবে। কিন্তু তার আগেই পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটায় মাদ্রিদ রক্ষার প্রয়োজনে ৫ ও ৬ নভেম্বর তাঁদের রাজধানী রক্ষার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হল। মাদ্রিজ রক্ষায় প্রথম আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেনাপতি হয়ে এসেছিলেন হাঙ্গেরির কমিউনিস্ট নেতা এমিল ক্লেবার। ৭ নভেম্বর ১৯৩৬ মাদ্রিদের রাজপথ শিহরিত হল স্বেচ্ছাবাহিনীর প্রথম পদসঞ্চারে, মুখ তাঁদের কঠোর, মাথা উঁচু, কাঁধে রাইফেল, রোদে ঝলসে ওঠা কিরীচ। 'লা পাসিওনারিয়া' নামে খ্যাত খনি-শ্রমিকের কন্যা দোলোরেস ইবারুরি ছিলেন ফ্যাসিস্ত প্রতিবিপ্লবের ও গণপ্রতিরোধের রক্তঝরা দিনে স্পেনের প্রতিরোধ সংগ্রামের উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি। তাঁর জগদ্বিখ্যাত আত্মজীবনীতে সেদিনের উচ্চকিত আতঙ্কিত মাদ্রিদের বর্ণনায় আছে :

"জানালার পিছনে গণবাহিনীর যোদ্ধাদের হাত বন্দুকের ট্রিগারে, বোমা তৈরি। উদ্বিগ্ন চোখে ওরা তাকিয়ে রয়েছে এই অভিযাত্রী সেনাদলের দিকে। মেয়েরা হতাশায় ছেলেদের কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে বলছে : 'ওরা ঢুকে পড়েছে! আমরা কেন অপেক্ষা করছি ?'

"এমন সময় রাস্তা থেকে বিদেশীভাষায়, তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ শোনা গেল— বাতাসে যেন চাবুকের শিষ। তারপরেই অজানা একাধিক বিদেশী ভাষায়, অভিযাত্রীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল আমাদের অতি পরিচিত, অতি প্রিয় সেই গানের কলি : 'জাগো, জাগো, জাগো সর্বহারা...'। আকাশ বাতাস ভরে গেল গানের সেই বজ্রনিনাদে। মাদ্রিদের জনতার স্নায়ুতে শিহরণ খেলে গেল। মেয়েরা আনন্দে কেঁদে ফেলল : 'আমরা কি স্বপ্ন দেখছি ?' মাদ্রিদের রাজপথ পদভারে কাঁপিয়ে অভিযাত্রীরা তখন 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে ফরাসী ও ইতালীয়, জার্মান ও পোলিশ, রুমানীয় ও হাঙ্গেরীয় ভাষায়। এরা ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের স্বেচ্ছাসেবক

বাহিনী। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের দেশে, আমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে এবং হয়ত মরতে এসেছে।"

'অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি'। অনুবাদ: গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পৃ ২৫, পরিচয়, ফ্যাসিস্টবিরোধী সংখ্যা, ১৯৭৫

স্পেনের জনগণ ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবকদের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের শেষ দিকে এল চরম লজ্জা ও গ্লানির পর্যায়। ঘৃণ্যতম সেই বিশ্বাসঘাতকার পূর্ব মুহূর্তে ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ লীগ অব নেশনসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্পেনের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী খুয়ান নেগ্রিন সমস্ত রণাঙ্গন থেকে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের (আন্তর্জাতিক ব্রিগেডগুলিকে) সরিয়ে নেওয়ার এবং তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরৎ পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ফ্রাঙ্কোর পক্ষ থেকে অবশ্য কোনও অপসারণ ঘোষণা করা হল না; বরং ডিভিসনের পর ডিভিসন ফ্যাসিস্ত 'স্বেচ্ছাবাহিনী' আসতেই থাকল। এই পরিস্থিতিতে বার্সিলোনায় আন্তর্জাতিক ব্রিগেডগুলিকে রিপাবলিকের তরফ থেকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল ২৯ অগাষ্ট ১৯৩৮, বিকেল সাড়ে চারটায়। পরিদর্শন-মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নেগ্রিন ও তাঁর সমর-পরিষদ। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় মাথার উপর টহল দিচ্ছে রিপাবলিকের প্রতিরক্ষা বিমান। রাস্তার দুধারে হাজার হাজার মানুষ। গর্বে আনন্দে অশ্রুতে সিক্ত সেই বিদায়সম্বর্ধনা। সমস্ত বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। Vincent Sheehan তাঁর 'Not peace but a sword পুস্তকে লিখেছেন (পৃ ২২৬ ৭):

'Malreaux told me about it a day or so later. "C'etait toute la Revolution qui s'en allait", he said. Perhaps that was why the people wept. These boys—all these Lardners, their average age was about twenty-three—had come to Spain to help save the Republic. The impulse which had sent all these Lard'ners to Spain had been a reflex of the conscience of the world."

বিশ্বের বিবেক সেদিন স্পেন থেকে বিদায় নিল, বিদায় নিল বিপ্লব!

কডওয়েল শাকলাতওয়ালা ব্যাটেলিয়নে যোগ দেন ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৬। ডিসেম্বরে মিয়াজা জুন্টার নেতৃত্বে মাদ্রিদ রক্ষা পেল। সামনাসামনি আক্রমণ করে ফ্যাসিস্তদের মাদ্রিদ দখলের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। জানুয়ারি ১৯৩৭ দক্ষিণ উপকূলের মালাগা সহরের উপর ফ্যাসিস্তরা যেমন আক্রমণ স্বরু করল, তেমনি পূর্ব উপকূলের

ভ্যালেন্সিয়া শহরের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ বন্ধ করার জন্য জারামা নদী বরাবর আক্রমণও সুরু হয়। রাজধানী থেকে মাইল পঞ্চাশেক উত্তর-পূর্বে গুয়াদালহারা শহরের দিকে ইতালীয় ফ্যাসিস্তরা যাতে আক্রমণ করতে পারে সেই ছিল উদ্দেশ্য। মাদ্রিদের দক্ষিণে পুবমুখো বিরাট পার্শ্বআক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল ফ্রাঙ্কোর সেনাপতি ভারেলা আর অরগাজ। ভালদেমোরো, পিণ্টো, সেসেনা আর গেতাফে শহর পড়ল এই আক্রমণ-লাইনের উপর। কুড়ি কিলোমিটার জুড়ে ফ্রন্ট। জারামা আর তাজুনিয়া নদী ঘেরা ত্রিভুজের মধ্যে আরগান্দা শহর হল তাদের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য। তারপর জারামা-হেনারেস নদীকে বাঁদিকে রেখে উত্তরপূর্বে আলকালা দ্য হেনারেসের দিকে হবে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাহলেই মাদ্রিদ কার্যতঃ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

জারামা পরিসীমার উপর চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ফ্রাঙ্কোবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭। আটচল্লিশ ঘণ্টায় তারা প্রায় আট কিলোমিটার এগিয়ে গেল। লা মারনোজা পাহাড় মাদ্রিদ থেকে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে; বিদ্রোহীরা সেটা দখল করে। তার দক্ষিণপূর্বে জারামা নদীর উপর পিন্দোক সেতু। ফরাসী আঁদ্রে মার্তি ব্যাটেলিয়ন সেটি রক্ষা করে ১০ তারিখ পর্যন্ত। পরের দিন দুপুরে ফ্রাঙ্কোবাহিনী জারামা পার হয়ে পিনগারন পাহাড় দখল করে।

১২ ফেব্রুয়ারি অবিরাম সৈন্য-সংস্থাপন ও লড়াই চলে। ভাসিয়া-মাদ্রিদের কাছে বিদ্রোহীরা মানথানারেস নদী পার হলেও আরগান্দা সহরের সামনে এলে তাদের রুখে দেওয়া হয়। মোরাতা দ্য তাজুনিয়ার দিকে বিদ্রোহীরা এগিয়ে যেতে থাকে। বেলা দশটার সময় রিপাবলিকান বাহিনীর গোলন্দাজ বিভাগের প্রথম সাড়া পাওয়া যায়। বত্রিশটি রুশ ট্রাঙ্ক এগিয়ে আসে। পিন্দোক সেতু পুনরুদ্ধার হয়। রিপাবলিকান পক্ষের স্পেনীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাটেলিয়নের ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল তেজের মুখে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিস্ট সেনাপতি ভারেলা বিমান থেকে আক্রমণের চাপ বাড়িয়ে দেয়। এই সময় রিপাবলিকান পক্ষের প্রায় চল্লিশটি জঙ্গী বিমান সেতুর উপর দেখা দিতে বিদ্রোহীদের বিমানগুলি সরে পড়ে। জারামা নদীর উত্তর দিক অনেকটা সুরক্ষিত হল। ভারেলা তখন মোরাতা দ্য তাজুনিয়ার দিকে আক্রমণের মুখ ঘুরিয়ে দেয়। একটি রাস্তা সান মার্তিন দ্যলা ভেগার সঙ্গে এই শহরটিকে যুক্ত করেছে। তাজুনিয়া নদীর উপত্যকা থেকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এই রাস্তাটি গেছে জারামা উপত্যকার দিকে। পনের নম্বর আন্তর্জাতিক ব্রিগেড (লিঙ্কন) আর এগার নম্বর থেলমান ব্রিগেড নিয়ে কর্নেল গাল মোরাতার সামনে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে আছেন।

১২ই সকালে পনের নম্বর বিগেডের বৃটিশ ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহীদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সান মার্তিনের দিকের রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা টিলার উপর তারা ঘাঁটি করে। দিনের প্রথম সাত ঘণ্টা ধরে এই ঘাঁটি রক্ষা করা দেখে রিপাবলিকান পক্ষের দুর্বলতা চাপা পড়ে যায় এবং বৃটিশ ঘাঁটির দক্ষিণে তিন মাইল জুড়ে পুরাপুরি অরক্ষিত একটা জায়গা যে রয়েছে বিদ্রোহীরা তা বুঝতে পারে না। মরক্কোবাহিনী বার বার আক্রমণ করে। বৃটিশ সৈন্যরা অটল। উত্তর দিকে লাইন বরাবর '৬ ফেব্রুয়ারি' ব্যাটেলিয়ন লড়ছিল। তার ডান দিকে আরও উত্তরে দিমিত্রভ ব্যাটেলিয়নের আট শ' সৈন্য। দুপুরের মধ্যে '৬ ফেব্রুয়ারি' ব্যাটেলিয়নের দুটি কোম্পানি কামানের গোলা আর মেশিনগানের সামনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পুরাতন কোল্ট বন্দুক কাজে লাগে না। ফলে টিলার উপর বৃটিশসৈন্যদের সাহায্য করতে কেউ রইল না। কয়েকটি ট্যাঙ্ক এগিয়ে গেল, আর ফরাসীরা। কিন্তু ট্যাঙ্ক হঠে আসতে বাধ্য হল। ফলে বৃটিশ ফরাসী ও দিমিত্রভ ব্যাটেলিয়নের মাভরা ফ্যাসিস্ত ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ আর মেশিনগান বাহিনীর সামনে যতদূর সম্ভব আত্মরক্ষা করতে থাকল। বোল্ট-টানা রাইফেল ছাড়া তাদের হাতে আর কিছুই বিশেষ ছিল না। গোটা ব্রিগেডে একটা হাতবোমাও ছিল না। বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যদের চাপে বিদ্রোহীরা হঠে যেতে বাধ্য হয়। দিমিত্রভ ব্যাটেলিয়নের উপর তারা আক্রমণ করে। কিন্তু বেয়নেটের মুখে ফ্যাসিস্তরা পাঁচবার পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলেও প্রত্যেক বারেই তারা এগিয়ে আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালেও এইরকম ঘটনা অল্প কয়েক বারই মাত্র ঘটে এই দিনের যুদ্ধে কডওয়েল যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের সম্মান অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ। তাঁকে শেষ দেখা যায় সহযোদ্ধা সঙ্গীরা যাতে নিরাপদে পিছনের দিকে সরে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে টিলার উপর মেশিনগান হাতে লড়াই চালাচ্ছেন। আক্রমণকারী মুররা তখন মাত্র ত্রিশ গজ দূরে।

কডওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর ইলিউশন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটি (১৯৩৭), স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার (১৯৩৮), ক্রাইসিস ইন ফিজিক্স (১৯৩৯) এবং ফারদার স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার (১৯৪৯) প্রকাশিত হয়। কডওয়েল যখন স্পেন রওনা হন তখন 'ইলিউশন' যন্ত্রস্থ। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মহলে সাড়া পড়ে যায়। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে পরবর্তী পুস্তকগুলিও প্রকাশিত হতে থাকে। মার্ক্সবাদ যে সমসাময়িক কালের আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যাগুলির গোলকধাঁধার মধ্যে সমাধানের পথের সুনিশ্চিত ঠিকানা হাজির করেছিল এটা যেমন কডওয়েলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেইরকম নিজের —

ব্যাপক পড়াশুনাকেও সুবিন্যস্ত করে মূল পথের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন চিন্তার ক্ষেত্রে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের নিরিখে বর্তমান কালের মুমূর্ষু সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করলেন সমাজের সাধারণ চলনের মধ্যকার প্রকৃত চরিত্রটিকে; বুঝলেন এই যন্ত্রণা মৃত্যু আশঙ্কার নয়, এ হল নতুন যুগের জন্ম-যন্ত্রণা।

এই পুস্তকের ভূমিকায় জন স্ট্রেচি কডওয়েলের রচনা সম্পর্কে যা লিখেছেন তার থেকে ভালো করে কিছু লেখার স্পর্ধা অনুবাদকের নেই। আমাদের কালের থেকে মাত্র বছর পঞ্চাশেকের ব্যবধানে হলেও কডওয়েলের কাল সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠক সাধারণের কাছে অবান্তর মনে হবে না এই বিশ্বাসে সামান্য দু একটি কথা বলার চেষ্টা করা গেল। ভুলত্রুটি কিছু থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত।

এমন এক কালে আমরা আজ বেঁচে আছি যখন মমূর্ষু সংস্কৃতির ভাঙন ক্রমেই আরও বেশি বেশি করে তার নগ্নরূপ নিয়ে আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টতর হচ্ছে, যেন এক 'জলহীন, ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।' চেতনার এই দানবীয় মূঢ় অপব্যয়ের মধ্য থেকেই জন্ম নিচ্ছে যে নতুন চেতনা, নতুন সংস্কৃতি, নতুন যুগের সম্ভাবনা তাকে জানার সাগ্রহ প্রয়াসে পাঠকসাধারণের উৎসাহকে সামান্য পরিমাণেও স্পর্শ করা যদি সম্ভব হয় সেটাই হবে এই অনুবাদের সার্থকতা।

এই উপলক্ষ্যে অনুবাদটি প্রকাশের ব্যাপারে অনেকের কাছে আমি ঋণী। প্রকাশক সংস্থার সক্রিয় সহৃদয়তার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। প্রতিশব্দ ও পরিচিতির ব্যাপারে বন্ধু ডঃ ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. সুনির্মল মৈত্র ও অরুণ দে'র কাছেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

র. না. ব.

ভট্টাচার্যপাড়া

গোবরডাঙা

৬. এপ্রিল ১৯৮৫

ভূমিকা

'আপনারা জানেন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার গুরুত্ব আমার কাছে কতখানি। স্পেনের গণফৌজের খুবই সাহায্যের দরকার ; তাঁরা যদি ব্যর্থ হন, তাঁদের আজকের সংগ্রাম আগামী দিনে অবশ্যই আমাদের সংগ্রাম হয়ে উঠবে এবং আমার বিশ্বাস অনুযায়ী আমার কর্তব্য যে কি তা আমার কাছে স্পষ্ট।'

আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের বৃটিশ ব্যাটেলিয়নে যোগ দেওয়ার সপক্ষে এই পুস্তকের লেখক উপরের এই যুক্তি পেশ করেন। ১ ডিসেম্বর ১৯৩৬ ঐ বাহিনীতে তিনি যোগ দেন।

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ এক ডালস্টান বাসকর্মীর নেতৃত্বাধীনে মেশিনগান সেকশনের একজন হিসাবে জারামা নদীর তীরে একটি ছোট পাহাড় তিনি রক্ষা করছিলেন। সেইদিনই অপরাহ্নে তিনি নিহত হন।

'...গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার গুরুত্ব আমার কাছে কতখানি।' এখন কডওয়েল ত ছিলেন কমিউনিস্ট। এদিকে অনেকে সত্যসত্যই মনে করেন যে কমিউনিস্টরা হল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বিপজ্জনক শত্রু। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কমিউনিস্টরা যদি গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার প্রতি তাদের আনুগত্যের কথা বলে তাহলে কেবল ধাপ্পা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই ওই সব কথা তারা বলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন এক জন কমিউনিস্টকে আমরা দেখছি যিনি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা শুধু যে ঘোষণাই করেছেন ; বা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তিনি যে মরতে প্রস্তুত একথা কেবল ঘোষণাই করেছেন, যেমন সম্প্রতি মিঃ নেভিল চেম্বারলেন করেছেন, তাই নয়, গণতন্ত্রের জন্য সত্য সত্যই মৃত্যুবরণও তিনি করেছেন।

ব্যাপারটা কি রকম গোলমেলে মনে হচ্ছে না? একটা রাজনৈতিক চালবাজির জন্য কি মানুষ লড়াই করে বা মরে? নাকি তারা ফ্যাসিস্ট আক্রমণের মুখোমুখি হয়, নারকীয় বিজ্ঞানের যত কলাকৌশলে সজ্জিত নয়া বর্বরতার আক্রমণের কি তারা মুখোমুখি হয়? জার্মান ও ইতালীয় বিমানবাহিনীর নিপুণতম আবিষ্কারে পুষ্ট যুদ্ধোন্মাদ মুর উপজাতীয়দের যে আক্রমণে কডওয়েল নিহত হয়েছেন সেই হামলার কি তারা মুখোমুখি হয়? যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় মানুষ সত্য সত্যই বিশ্বাস করে না, তার জন্য কি তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে এই সবের মুখোমুখি হয়?[১] অথচ কডওয়েল ছিলেন কমিউনিস্ট ; গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন এমন এক কমিউনিস্ট।

এলিজাবেথীয়রা বলতেন মৃত্যু বাঙ্ময়। সম্ভবতঃ কডওয়েলের মৃত্যু, আর লণ্ডন গ্লাসগো মিডলসব্রা বা কার্ডিফ থেকে যে সব মানুষ তাঁর সঙ্গে স্পেনে মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁদের এই মৃত্যু এমনভাবে বাঙ্ময় হবে যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য কমিউনিস্টরা কেন লড়াই করে এবং মৃত্যু বরণ করে সে কথা বৃটেনের মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে সুরু করবেন; কারণ দেখে মনে হয় যে মৃত্যুর সন্দেহাতীত স্বাক্ষর ভিন্ন কোনও কিছুই তাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস জন্মাতে পারবে না।

কডওয়েল অবশ্য নিজ বিশ্বাসের জন্য মৃত্যু বরণের থেকেও বেশি কিছু করেছেন। সেগুলির জন্যই উনত্রিশ বছর ধরে তিনি বেঁচে ছিলেন। আর লক্ষ্যণীয় সক্রিয়তায় এই সময়টাকে তিনি ভরাট করে তুলেছিলেন। যে বইগুলি তিনি লিখে গিয়েছেন সংখ্যার দিক থেকে তা বিস্ময়কর। যেমন ধরুন, নিজের প্রকৃত নাম ক্রিস্টোফার সেণ্ট জন স্প্রিগ নামে তিনি লিখেছেন অন্ততঃ সাতটা ডিটেকটিভ গল্প (তার একখানি আমি পড়েছি এবং প্রকৃতপক্ষে সেটি আমার খুবই খেলো মনে হয়েছে), বিমান চালনা সম্পর্কে পাঁচটি আর প্রচুর ছোট গল্প ও কবিতা।

আর এগুলি ছিল নিছক জীবনধারণের প্রয়োজনে লেখা। যে লেখা সম্পর্কে প্রকৃতই তাঁর আগ্রহ ছিল সেগুলির জন্য তিনি কডওয়েল ছদ্ম নামটি আলাদা করে রেখেছিলেন। এই ছদ্মনামে তিনি ভারিক্কি চালের একটা উপন্যাস 'দিস মাই হ্যাণ্ড' (আমার মতে এটা ব্যর্থ রচনা) এবং তিনটি মুখ্য পুস্তক রচনা করেন: ইলিউশ্যন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটি, দি ক্রাইসিস ইন ফিজিক্স ও বর্তমান পুস্তকটি।

যে ছবিটি আমরা দেখতে পাই তা এক তরুণের, সৃজনীশক্তি যার উপর ভর করেছে; ভালো, মন্দ, গতানুগতিক সৃষ্টির বন্যা রচনা করে চলেছে সেই তরুণ; সম্ভাবনার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সুদুর্লভ যে লক্ষণ সেই প্রকৃত রচনা-প্রাচুর্যের লক্ষণ অবশ্য এই তরুণের মধ্যে বর্তমান। তিনি ছিলেন এমন এক তরুণ যিনি জীবনবহ্নির সামনে নিজের হাত দুটিকে কেবল যে উষ্ণ করেছেন তাই নয়, প্রচণ্ড আবেগে সেই অগ্নিশিখাকে তিনি উদ্দীপিত করেছেন; এমন এক তরুণ বিমান চালনা থেকে সুরু করে কাব্য, ডিটেকটিভ গল্প, কোয়াণ্টাম মেকানিক্স, হেগেলীয় দর্শন, প্রেম, মনঃসমীক্ষণ পর্যন্ত সব কিছুতে যাঁর এমন উৎসাহ ছিল যে এই সবকিছু সম্পর্কেই তাঁর যে কিছু বক্তব্য আছে সে কথা তিনি অনুভব করেছিলেন।

বিশের কোঠায় পা ফেললে মানুষের এই রকমই হওয়ার কথা। একথা ঠিক যে এই রকম একজন মানুষ বিমান চালনা, প্রেম বা কোয়াণ্টাম মেকানিক্স সম্পর্কে চূড়ান্ত কিছু বলবেন এটা খুব প্রত্যাশিত নয়।[২] বছর তিরিশেক বয়স হলে অবশ্য

এই রকম মানুষের সর্বগ্রাসী মনোযোগ কোনও বিশেষ একটি বা দুটি নির্বাচিত ক্ষেত্র সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়নের জন্য অভিনিবিষ্ট হয়; এবং নানা দিকে ছুটতে থাকা দর্শকের থেকে সেই মনোযোগ তখন তুলনাতীতভাবে সমৃদ্ধ হয়।

কডওয়েলের বয়স যখন সবে উনত্রিশ, নিজেকে তিনি তখন আবিষ্কার করছেন; তাঁর শেষ দিকের পুস্তকগুলিতে যথাযথভাবে বলার, কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতার প্রভূত উন্নতি দেখা যায়; আর ঠিক সেই সময়েই এল মৃত্যুবাহিনী।

তাঁর অন্য দুটি মূল্যবান গ্রন্থ ইলিউশন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটি এবং দি ক্রাইসিস ইন ফিজিক্স সম্বন্ধে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই ভূমিকার উদ্দেশ্য হল বর্তমান গ্রন্থটির আটটি আলোচনার প্রতিটির অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু এবং যে আদর্শের জন্য সেগুলির রচয়িতা মৃত্যু বরণ করেছিলেন, এই দুইয়ের মধ্যকার ঐক্যটিকে তুলে ধরা; কডওয়েলের তত্ত্ব ও তাঁর প্রয়োগের মধ্যকার অপরূপ ঐক্যটিকে তুলে ধরা; আমার মনে হয় লোকে যখন আন্তরিকতার কথা বলেন তখন এই ঐক্যটিকেই বোঝাতে চান।

কারণ এই গ্রন্থটি বন্ধনমুক্তি [Liberty] সম্পর্কে। বন্ধনমুক্তি কি, কমিউনিস্টরা কেন তার জন্য লড়াই করে এবং মৃত্যু বরণ করে এবং কেন তারা একথা জানে যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কমিউনিজমই হল বন্ধনমুক্তি, সেটাই ব্যাখ্যা করার এক শ্রমসাধ্য, জটিল, বিস্তারিত ও বলিষ্ঠ প্রয়োগ এই গ্রন্থটি।

গ্রন্থটিতে আছে শ, টি. ই. লরেন্স, ডি. এচ. লরেন্স, ওয়েলস ও ফ্রয়েডের মত সমসাময়িক কয়েকজন ব্যক্তির উপর কয়েকটি প্রবন্ধ, নিষ্ক্রিয়তাবাদের [pacifism] উপর একটি আলোচনা এবং প্রেমের উপর আর একটি এবং তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে বন্ধনমুক্তি বিষয়টিরই উপর একটি উপসংহার। এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের কারণে গ্রন্থটি অগোছালো এবং যোগসূত্রহীন হয়ে পড়ারই সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু তা হয়নি। প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাই এক কেন্দ্রীয় ও সদা অস্মিত বিষয়বস্তুর দ্বারা গ্রথিত। সেই আলোচ্য বিষয়বস্তুটি হল, সমস্ত দিক থেকে, মানুষের বন্ধনমুক্তি বিষয়ক ধারণার বিশ্লেষণ। কডওয়েল যে পদ্ধতি নির্বাচন করেছেন তা হল সমসাময়িক কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বেশি প্রভাবশীল কয়েকটি মন সম্পর্কে আলোচনার সাহায্যে তাঁর বিষয়বস্তুটির দৃষ্টান্ত দেওয়া। গ্রন্থটি যেখানে সহজেই তুচ্ছ ও বিমূর্ত হয়ে উঠত সেই জায়গায় নির্বাচিত পদ্ধতিটি গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ ও মূর্ত করে তুলেছে।

কডওয়েলের লেখা প্রবেশক পরিচ্ছেদটি তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তুকে তুলে ধরেছে। সকলেই স্বীকার করেন যে সমসাময়িক সংস্কৃতির মধ্যে কোথায় একটা

গোলমাল দেখা দিয়েছে। বিংশ শতকের বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রত্যেকেই অনুভব করছেন যে বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম ও দর্শন নিয়ে গঠিত সংস্কৃতির সমগ্র বিপুল দেহে পচন ধরেছে। অথচ রোগটা যে কি তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারছেন না।

'এর ব্যাখ্যাটা কি?' কডওয়েল লিখছেন:

'হয় প্রভূত ক্ষমতা নিয়ে শয়তান এসে হাজির হয়েছে আমাদের মধ্যে, না হয়ত অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের একই সাধারণ ব্যাধির একটা কার্যকারণগত ব্যাখ্যা আছে। তাহলে সমস্ত মনঃসমীক্ষকরা, এডিংটন, কীইন্‌স্, স্পেংগলার এবং বিশপরা— যাঁরাই অবস্থাটা সমীক্ষা করেছেন তাঁরা যাবতীয় আধুনিক সংস্কৃতিরই এক সাধারণ সংক্রমণের উৎসটির,—এবং সেই কারণে নিশ্চয়ই সেটা সুপ্রত্যক্ষ অথচ তার, স্থাননির্দেশ করতে পারলেন না কেন? উত্তর দিতে হলে নিজেদের প্রতি হাৎসেনের [Herzen] কথাটাই এই সব মানুষদের প্রয়োগ করতে হয়: "আমরা চিকিৎসক নই, আমরাই ব্যাধি।"

গ্রন্থটির অবশিষ্ট সমগ্র অংশটিতে কডওয়েলের উত্তরটি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রবেশক অধ্যায়ে এবং বন্ধনমুক্তির উপর তাঁর শেষ প্রবন্ধটিতে তিনি তার সারসংক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর উত্তর হল এই যে, আজকের মানুষ, যে সব মানুষ আমাদের যুগের মানসিক পরিমণ্ডলকে নির্ধারিত করেন তাঁরা, মানুষের বন্ধনমুক্তির প্রকৃতিটিকে বুঝতে ভীষণ ভুল করেছেন। সমস্ত মানুষই যেহেতু সুপ্রকাশিতভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে বন্ধনমুক্তি অর্জনের সর্বজনীন লক্ষ্যের জন্য কাজ করে চলেছেন, সেই কারণে বন্ধনমুক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধেই যদি কোন ভুল হয় তাহলে তা আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে গোড়া থেকেই কলুষিত করে দেয়। অল্প কয়েকটি বাক্যে (কিন্তু অল্প কয়েকটি বাক্যে কোনও ধারণাকে বিবৃত করার অর্থ হল তাকে বিকৃত করা ও তার গুরুত্ব লাঘব করা) তিনি বলেছেন যে সমসাময়িক সংস্কৃতির নেতৃবর্গ তাঁদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, এই রুশোপন্থী বিশ্বাসের এখনও বশবর্তী যে মানুষ জন্মেছিল স্বাধীন হয়ে কিন্তু সামাজিক সম্পর্কের এক দাসত্বজালে নিজেকে সে আবদ্ধ করে ফেলেছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন: সর্বাপেক্ষা স্বাধীন মানুষ হল সর্বাধিক বিচ্ছিন্ন; 'স্বাভাবিক মানুষের' ['natural man'] স্বাধীনতা ফিরে পেতে হলে আমাদের যা করণীয় তা হল সমাজের সমস্ত দমনমূলক কাজ [coercions] এবং বন্ধনসূত্রগুলিকে শিথিল করা; সমাজকে বন্ধনমুক্ত করে তার আদিম উপাদানগুলিতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কডওয়েল বার বার যে আলোচ্য সামগ্রীতে ফিরে এসেছেন তা এই যে, এই

ধারণাটিই হল সেই আদি ভুল যা আমাদের যাবতীয় বিভ্রান্তির মূলে বিরাজ করছে। সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল ঘোচানোর যে কর্তব্য, যে অচল জরাজীর্ণ সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থার [system] মধ্যে মানবজাতির ক্ষমতা আটক রয়েছে তাকে চূর্ণ করার যে কর্তব্য, তা যখন মানুষের সামনে ছিল তখন এই পুরাপুরি নঞর্থক ধারণাটির স্বপক্ষে একটা যুক্তি ছিল। তখন আপেক্ষিকভাবে এবং কালিক দিক থেকে [temporally] এটা সত্য ছিল যে, যে অকেজো সামাজিক সম্পর্কাবলীর সাহায্যে মানুষ সচেতনভাবে পরস্পরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করত তার অবসান ঘটানো মুক্তিদাতার কর্তব্য। এই পুরাতন সত্য আজ মৃত আর সেই মৃতদেহ হয়ে উঠেছে আজ সব থেকে ক্ষতিকর ভুলভ্রান্তির উৎস।

এ কথার অর্থ এই নয় যে, মানুষের সর্বোত্তম লক্ষ্যবস্তু হিসাবে বন্ধনমুক্তি সন্ধানের প্রয়োজন এখন আর আমাদের নেই।

'বাট্রাণ্ড রাসেলের অনেক প্রবন্ধ আছে যেখানে বন্ধনমুক্তির গুরুত্ব, বন্ধনমুক্তি ভোগ করাই যে মানুষের সর্বোচ্চ ও সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, এ সব কথা এই দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। ফিশার দাবি করেছেন যে বিগত দুই বা তিন শতকের ইউরোপের ইতিহাস শুধু বন্ধনমুক্তির জন্য সংগ্রাম মাত্র। শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকরাও অবিরাম এবং নানাভাবে বন্ধনমুক্তির এই রকম প্রশংসা করেছেন এবং মানুষের তা ভোগ করার অধিকারের কথাই প্রবল পরাক্রম জোর দিয়ে বলেছেন।

'আমিও একথার সঙ্গে একমত। যে সমস্ত সামান্যীকৃত [generalised] সামগ্রী—যেমন ন্যায়বিচার, সৌন্দর্য, সত্য—যা সহজেই আমাদের মুখে আসে, তার মধ্যে বন্ধনমুক্তিই আমার কাছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।'

কিন্তু আজকের দিনে বন্ধনমুক্তি অর্জন করা সামন্ততন্ত্রবিরোধী মুক্তিদাতারা যে প্রক্রিয়া [process] গ্রহণ করেছিলেন তার বিপরীত এক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। যে সচেতন, প্রকাশ্য [overt], সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনগুলির সাহায্যে একজন মানুষ বা মানুষের কোনও একটি শ্রেণী অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে তার অবসান ঘটানো আজকের দিনের প্রশ্ন নয়। বরং বিংশ শতকের মুক্তিদাতার কর্তব্য একটা ত্রিগুণিত কর্তব্য।

প্রথমতঃ তার বিশ্লেষণাত্মক কর্তব্য হল মানুষ ও শ্রেণীর যে সব কাজ সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করেছিল, সেগুলির ফলে সমাজে যেসব সমকালীন, অচেতন, ও অলক্ষ্য সামাজিক বন্ধন এবং বাধ্যবাধকতাগুলি দেখা দিয়েছে সেগুলিকে সচেতন করে তোলা। বিংশ শতকের মুক্তিদাতার কর্তব্যের এই দিকটি হল মানুষকে এই বিষয়ে

সচেতন করে তোলা যে মানুষ যখন ভূস্বামীর কাছে ভূমিদাসের এবং দাসমালিকের কাছে ক্রীতদাসের প্রকাশ্য সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনটিকে সঠিকভাবে ধ্বংস করেছিল তখন তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রভুত্বের নতুন, সূক্ষ্ম, অদৃশ্য বন্ধনগুলি গড়ে তুলেছিল। এইগুলির মধ্যে মালিক ও কর্মচারীর মধ্যকার বন্ধনটি হল টাইপ; আর এই বন্ধনগুলি তাদের যাবতীয় অস্পর্শবেদ্যতার [intangibility] কারণে দাসত্বের পুরাতন প্রকাশ্য বন্ধনগুলির থেকে অনেক দিক থেকে আরও বেশি নিষ্ঠুর ও দমনমূলক হয়ে উঠেছে।

সামন্ততন্ত্রবিরোধী—উদারপন্থী—মুক্তিদাতারা যে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কাজ করছিলেন সেই লক্ষ্যের ধারণার মধ্যকার এক গভীর এবং সম্ভবতঃ ইতিহাসের দিক থেকে আবশ্যকীয় [necessary] দ্বন্দ্বের কারণে এই ট্র্যাজিক পরিণতি ছিল অপরিহার্য। কারণ তাঁরা মনে করতেন যে সর্বাধিক স্বাধীন মানুষ হলেন সব থেকে বেশি বিচ্ছিন্ন মানুষ। কডওয়েল দেখিয়েছেন যে তার কারণ এই যে, যেসব উদারপন্থী উদারপন্থাকে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যান, জঙ্গলের পশু হল তাঁদের কাছে স্বাধীনতার চূড়ান্ত আদর্শ। কারণ এটা তাঁরা লক্ষ্য করেন না যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ দেহের [body politic] গলিত সংযোজক সূত্রগুলিকে যখন তাঁরা ধ্বংস করছেন তখন তার জায়গায় এক নতুন সামাজিক সংযোজক সূত্র [connective tissue] তাঁদের উদ্ভাবন করতেই হবে; তাঁদের কর্তব্যের সমগ্র গঠনমূলক দিকটিকেই তাঁরা অবহেলা করেছিলেন।

তাঁরা তাঁদের কর্তব্য করতে ভুলে গেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নতুন সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেটা অসম্ভব। তার অর্থ তাহলে দাঁড়াত মানব সমাজ চুরমার হয়ে যাওয়া। তার অর্থ শুধু এই যে, যে নতুন সামন্ততন্ত্রোত্তর সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা বাস করছি সেগুলি অচেতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি পুঁজিবাদের সামাজিক সম্পর্ক, বাজারের সামাজিক সম্পর্ক। প্রত্যেক মানুষই আজ স্বাধীন [free], অপরের উপর কারও আইনগত, বাধ্যবাধকতামূলক ক্ষমতা নেই। সমাজ স্বাধীন পরমাণু দিয়ে গঠিত।

কিন্তু এই সব মানব পরমাণুগুলির পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ আদৌ ঘটবে কি ভাবে? সংঘবদ্ধ শ্রমের [associated labour] জন্য সহযোগিতার একটা কোনও রূপ [form] মানুষ গড়ে তুলবে কিভাবে? কোন-না কোন ধরনের সামাজিক সহযোজক সূত্র [interconnections] কিভাবে আয়ত্ত করা যাবে? তার উত্তর এই যে, সামন্ততন্ত্রোত্তর সমাজের তত্ত্বে কেনাবেচার যে বাণিজ্যিক সম্পর্কগুলি ছিল সামাজিক আদানপ্রদানের [intercourse] একমাত্র স্বীকৃত রূপ, তার মধ্য থেকেই

মানুষের অলক্ষ্যে নতুন ও দৃঢ়তর বন্ধনসূত্র গড়ে উঠেছে, যদিও বর্তমানে সেগুলি অচেতন ও অদৃশ্যমান। কেনাবেচার এই একক সম্পর্কই মানুষের শ্রম করার ক্ষমতাকে কেনাবেচার সম্পর্কে পরিবর্তিত ক'রে মালিক ও কর্মচারীর মধ্যকার বাধ্যবাধকতা—মূলক [compulsive] সম্পর্ক হয়ে উঠেছে। এটি হয়ে উঠেছে প্রভুত্ব বিস্তারের এক তীব্র রূপ। আধুনিক সমাজে যে একমাত্র সম্পর্কের বিষয়ে মানুষ সচেতন তা হল যে পণ্যগুলি [commodity] তারা কেনাবেচা করে সেগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। কিন্তু পণ্যের সঙ্গে এই সম্পর্কের পিছনে লুকানো রয়েছে একটা সামাজিক সম্পর্ক, অন্য মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের একটা সম্পর্ক। আধুনিক মুক্তিদাতার কর্তব্যের প্রথম বিশ্লেষণাত্মক ধাপ হল সকলকে এই বিষয়ে সচেতন করা; মানুষকে উপলব্ধি করানো যে এক উচ্চ পর্যায়ের, যদিও তা অদৃশ্যভাবে স্তরে স্তরে ভাগ করা [intergraded], সমাজে তারা বাস করে।

কর্তব্যের দ্বিতীয় ধাপ হল মানুষকে এটা উপলব্ধি করানো যে পুঁজিবাদী সমাজের যা কিছু ভালো, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের থেকে যে যে বিষয়ে তা উন্নততর তার প্রতিটি বিষয়ই এক অতীব ঐতিহাসিক আপাতঃ-অসম্ভাব্যতা [paradox] হিসাবে দেখা দিয়েছে; সমাজের নতুন রূপটি অচেতন ভাবে যে উন্নততর পর্যায়ের সমন্বয়সাধনের [integration], যে সামাজিক সংযোজক সূত্রের সমৃদ্ধতর বিকাশ ঘটিয়েছে তার থেকে এটি দেখা দিয়েছে। মানুষকে উপলব্ধি করাতে হবে যে পুঁজিবাদী সমাজের যা কিছু মন্দ; মানুষের কাছে মানুষের দাসত্ব; সমগ্র ব্যবস্থাটির চরম ও চিরবর্ধমান অস্থায়িত্ব; তার মন্দা ও যুদ্ধ, এবং তার বর্তমান ভাঙন দেখা দেওয়ার কারণ হল এই নতুন, ঘনিষ্ঠ ও প্রভুত্ববিস্তারী সামাজিক সম্পর্কের অচেতন, এবং সেই কারণে অনিয়ন্ত্রিত ও অনুপলব্ধ, প্রকৃতি।

সমসাময়িক কালের মুক্তিদাতার তৃতীয় ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হল মানুষকে এটা উপলব্ধি করান যে সামাজিক সম্পর্কাবলী ও দমনের বর্তমান, অচেতন গুচ্ছটিকে (set) প্রথমে ধ্বংস করে তবেই বন্ধনমুক্তির মুখ তারা দেখতে পাবে। একথা ঠিক। কিন্তু তারপর, যদি তাদের স্বাধীন হতেই হয়, তাহলে নতুন সচেতন, সমৃদ্ধ, ঘনিষ্ঠ ও জটিল সামাজিক সম্পর্কাবলী তাদের গড়ে তুলতেই হবে। যেভাবে হোক মানুষকে আমাদের বোঝাতেই হবে যে বন্ধনমুক্তির সন্ধান জঙ্গলে পাওয়া যায় না। জঙ্গল হল পৃথিবীর সব থেকে বেশি দুঃখজনক দমনমূলক স্থান। বন্ধনমুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় সামাজিক সহযোগিতার সর্বাধিক সম্ভবপর পর্যায়ে। বন্ধনমুক্তি কোনও নেতিবাচক প্রত্যয় নয়, তা ইতিবাচক; বন্ধনমুক্তি বিধিনিষেধের অনুপস্থিতি নয়, বরং তা হল সুযোগের উপস্থিতি, আমরা যা চাই তা করার যোগ্যতাই হল

বন্ধনমুক্তি। আমাদের সহযাত্রী মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সচেতন ও সংঘবদ্ধ সহ-যোগিতা ছাড়া এই কঠোর পৃথিবীতে সেটা আমরা কিছুতেই করতে পারি না।

বন্ধনমুক্তির প্রত্যয়কে একটা ইতিবাচক সামাজিক সম্পর্ক হিসাবে, সর্বোন্নত পর্যায়ের সহযোগিতা আয়ত্ত করা হিসাবে কডওয়েল যেভাবে তুলে ধরেছেন, অল্প এই কয়টি বাক্যে তা প্রকাশ করলে সেটি হীনবল ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। বইটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাঠক দেখতে পাবেন এই প্রত্যয়টিকে নানাভাবে উদাহরণ দিয়ে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

আবার বলি, বন্ধনমুক্তির উপর এটি একটি প্রবন্ধ মাত্র একথা বললে কডওয়েলের পুস্তকটিকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করা হয়। একথা ঠিক যে সমগ্র পুস্তকটি জুড়ে এই আলোচ্য বিষয়টি বর্তমান; এই আলোচ্য বিষয়টিই পুস্তকটিতে ঐক্য এবং উদ্দেশ্যের এককত্ব ঘটিয়েছে। কিন্তু পুস্তকটিতে আরও অনেক ব্যঞ্জনাময় ও আগ্রহসঞ্চারী আলোচ্য বিষয় রয়েছে। কডওয়েল এক যথার্থ অবদান রেখেছেন, যেমন ধরুন, ফ্রয়েডীয় মনোবিদ্যাকে একটি সামাজিক প্রতিভাস [phenomenon] হিসাবে আলোচনার ক্ষেত্রে। আবার ওয়েলস এবং শ সম্বন্ধেও কিছু মজাদার ও বিচক্ষণ কথা তাঁর বলার আছে।

বাস্তবিক পক্ষে যে বিশেষ প্রবন্ধটিতে আমার আগ্রহ সব থেকে বেশি করে জেগেছে সেটি হল টি. ই. লরেন্স সম্পর্কে। প্রবন্ধটিতে কডওয়েল, যাকে আমি বলতে পারি বীরত্বের একটা তত্ত্ব, তাই গড়ে তুলেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বীর কাকে বলে? পৃথিবীর যে অংশটা পুঁজিবাদী সমাজের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আর্তি তাদের মধ্য থেকে কোনও বীরের জন্ম দিতে পারল না কেন? যে মানুষটি এক মহান জনগণের জন্য সেই গণ্ডীগুলিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন, আমাদের যুগকে তার তুলনাবিহীন মধ্যমধর্মিতা থেকে উদ্ধার করতে সেই লেনিনের মূর্তি কেন এককভাবে ভাস্বর? ইংরেজ শাসকশ্রেণী বীরের সব থেকে কাছাকাছি যে মানুষটিকে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তিনি হলেন টি. ই. লরেন্স, যিনি বীর হলেও হতে পারতেন, কিন্তু হননি। সেই টি. ই. লরেন্স সম্পর্কে আলোচনা করে কডওয়েল এই প্রশ্নটির জবাব দিয়েছেন।

এই অতীব মৌলিক, অতীব অসুখী, প্রতিভার সম্পর্কে কডওয়েলের আলোচনাটিতে গভীর বোধশক্তি ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। কডওয়েলের মৃত্যুতে আমাদের যে কত গভীর ক্ষতি হয়েছে তা এই প্রবন্ধটি থেকে, অন্যগুলির তুলনায় সম্ভবতঃ এইটি থেকেই সব চেয়ে বেশি করে, আমরা অনুভব করি। এই প্রবন্ধটিতে কডওয়েল যে পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলনের লেখক ও

নেতাদের মধ্যে তা আজ পর্যন্ত সকরুণভাবে সুদুর্লভ। উপলব্ধির প্রসারতা, সহানুভূতির ঔদার্য এবং মানুষের মনকে দোলা দেয় যে সব শক্তি সেগুলিকে বোঝবার মত পারঙ্গমতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। ব্যক্তিগত মানুষের ট্র্যাজেডিকে বোঝবার উদ্দেশ্যে নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক শক্তিগুলির ক্ষেত্রে তাঁর মার্ক্সবাদী অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগের যোগ্যতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন।

কডওয়েল যে নিহত হলেন তার কারণ পৃথিবীকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের ক্রীড়াক্ষেত্র হয়ে ওঠার হাত থেকে রক্ষার জন্য আমাদের দেশ তার ভূমিকা পালন করছে কি না সেটা লক্ষ্য করার ব্যাপারে আমরা খুবই অলস, খুবই স্বার্থপর আর খুবই ভীত ছিলাম। এবং এই রকম আরও অনেক মানুষ যাঁরা বেঁচে থাকলে জগতের কল্যাণ হোত তাঁরা নিহত হবেন। রক্তস্নাত বিশের দশকে যেসব নরনারী সাবালক হয়ে উঠছেন, কডওয়েল কিসের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন সেকথা যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন তার জন্য আসুন আমরা কডওয়েল যে কথাগুলি আমাদের জন্য রেখে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন সেই কথাগুলির অন্ততঃ সদ্ব্যবহার করি।

পাদটীকা ১॥ তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া গেল ঃ

'স্প্রিগের (কডওয়েল নামটি লেখক হিসাবে গৃহীত ছদ্মনাম) সেকশন প্রথম দিন একটা পাহাড়ের চূড়ায় ঘাঁটি আগলাচ্ছিল। সব দিক থেকেই তাদের অবস্থা ছিল সঙ্গীন, প্রথমে গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণ, তারপর বিমান থেকে মেশিনগানের গুলি এবং তারপর স্থলবাহিনীর মেশিনগানের আক্রমণ। এর পর মূররা বিপুল সংখ্যায় পাহাড়ের উপর আক্রমণ চালায় এবং যেহেতু আমাদের সঙ্গীদের অল্প কয়েক জনই মাত্র তখন অবশিষ্ট, যার মধ্যে স্প্রিগও ছিল এবং অমিতবিক্রমে তার মেশিনগান চালাচ্ছিল, সেই কারণে আমাদের কোম্পানি কম্যাণ্ডার, ডালস্টন বাসকর্মী, পিছু হঠার আদেশ দেয়।

'পরবর্তীকালে সেকশনের পিছু হঠার সময়ে আহত এক সাথীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। সে আমাকে বলে যে শেষবার যখন স্প্রিগকে তারা দেখে তখন আগুয়ান মূরবাহিনীর থেকে ত্রিশ গজেরও কাছ থেকে সঙ্গীদের পিছু হঠার পথ উন্মুক্ত রাখার জন্য সে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাণ থাকতে সেই পাহাড় থেকে সে ফেরেনি, কমরেডদের জীবন রক্ষার জন্য কেউ যদি নিজের প্রাণ বলি দিয়ে থাকে তাহলে সে মানুষের নাম স্প্রিগ।'

২। অসাধারণ ব্যাপারটা এই যে অধ্যাপক লেভি বলছেন যে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কথা কডওয়েল যথার্থই বলেছেন।

পূর্বকথা

'ইতিহাসের এক অত্যন্ত বিশিষ্ট মুহূর্তে আমরা বাস করছি। এ হল আক্ষরিক অর্থে এক সংকটের মুহূর্ত। আমাদের আত্মিক ও বস্তুগত সভ্যতার প্রতিটি শাখায় এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে এসে আমরা পৌঁছেছি বলে মনে হয়। জনসাধারণ সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ের প্রকৃত অবস্থার ক্ষেত্রেই কেবল নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মৌলিক মূল্যের প্রতি সাবিক দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও এই মানসিকতা দেখা যাচ্ছে।

'...আগেকার দিনে, বিশেষতঃ তার শাস্ত্রগত [doctrinal] ও নৈতিক [moral] ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রে এক মাত্র ধর্মই ছিল সংশয়বাদী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু; তারপর দেখা গেল শিল্পের ক্ষেত্রে যেসব আদর্শ ও নীতিগুলি এতদিন পর্যন্ত স্বীকৃত ছিল বিগ্রহধ্বংসকারী সেগুলিকে চুরমার করতে সুরু করেছে : এখন বিজ্ঞানের মন্দিরও সে আক্রমণ করেছে। বিজ্ঞানবিষয়ক এমন কোনও স্বতঃসিদ্ধ আজ বিশেষ অবশিষ্ট নেই যা কেউ না কেউ অস্বীকার করেছেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের নামে যে কোনও আজগুবি তত্ত্বই কেউ পেশ করুক না কেন, কোথাও না কোথাও সেগুলিতে বিশ্বাসী ও মন্ত্রশিষ্যের সন্ধান পাওয়া প্রায় সুনিশ্চিত।'[১]

উপরের উদ্ধৃতিটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি যে গুরুতর অসুস্থ একথা বলার জন্য মার্ক্সবাদী হওয়ার দরকার হয় না। শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম, অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে এবং আইনস্টাইন থেকে ফ্রয়েড পর্যন্ত সমকালীন সংস্কৃতির সর্বজনস্বীকৃত নেতাদের রচনা থেকে উদভ্রান্ততা ও নৈরাশ্যের শত শত স্বীকারোক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে। এক শতাব্দী আগেকার সেই পুরাতন সহজ আস্থা আজ নিঃশেষে লোপ পেয়েছে। ধর্মের যে একমাত্র সান্ত্বনা রয়েছে তা এই যে বিজ্ঞান কার্যকারণতাকে [causality] অস্বীকার করছে ; আর বিজ্ঞানীরা এই ঘটনা থেকে স্বস্তি লাভ করছেন যে 'কাজের' মানুষরা রাষ্ট্রতরীকে নিয়ে গিয়ে পাথরের উপর সেটাকে ধাক্কা খাওয়ানো ছাড়া অন্যভাবে চালাতে পারছেন না।

অথচ বিগত পঞ্চাশ বছরে বুর্জোয়া সংস্কৃতি অনেক কিছু অর্জন করেছে। তার অভিজ্ঞতামূলক [empirical] বিকাশগুলির অন্তর্ভুক্ত হল রিলেটিভিটি ও কোয়াণ্টাম পদার্থবিদ্যা, জনিবিদ্যা [genetics], মানুষের মনের গভীরতর স্তরগুলি সম্পর্কে নতুন অন্তর্দৃষ্টি, নৃতত্ত্ব কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত বিভিন্ন প্যাটার্নের সামাজিক সম্পর্ক

---

[১] ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক : 'বিজ্ঞান কোথায় চলেছে ?' ১৯৩৩।

এবং বিমান, বেতার, মোটর যানবাহন ও বিদ্যুৎশক্তির মত শত শত কারিগরি—বিদ্যামূলক আবিষ্কার। এই প্রমাণিত নথি থাকা সত্ত্বেও তার নৈরাশ্য কেন?

তার নৈরাশ্য এই কারণেই যে প্রতিটি আবিষ্কারই মিদাসের স্পর্শের মত নতুন হতাশার সৃষ্টি করছে। কার্যকারণতাকে অস্বীকার করে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা বিজ্ঞানের এলাকা থেকে বাস্তবকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের আবিষ্কারগুলি এক আশাহীন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে যেখানে মূলগত দিক থেকে ভিন্ন শত শত মনোবিদ্যাবিষয়ক মতগোষ্ঠী নেতৃত্বের জন্য লড়াই করছে। সমাজের স্থায়িত্ব বিভ্রমের উপর নির্ভর করে, এই কথা প্রমাণ করেছে বলে বর্জোয়া নৃতত্ত্ব দাবি করে। কিন্তু আধুনিক মানুষের কোনও বিভ্রম নেই—অথবা তার কোন বিভ্রম নেইর্য বলে সে বিশ্বাস করে। আর উৎপাদন ক্ষমতার অতুলনীয় বৃদ্ধির ফলে শান্তি, প্রাচুর্য ও সুখের সৃষ্টি হয়নি, হয়েছে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর দুর্দশার সৃষ্টি। যাবতীয় ক্ষেত্রের এই সংকটের মূল সুর হল নৈরাজ্য। সংকটটির এই নৈরাজ্য সুলভ বৈশিষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, যদিও তাদের প্রচেষ্টার পরিণতি হিসাবে একটা জিনিস সব লোকে ইচ্ছা করছে, তা সত্ত্বেও যেটা তারা সৃষ্টি করছে সেটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। এর আরও একটা নৈরাজ্যসুলভ বৈশিষ্টা হল এই যে, মানুষ যতই একটা সাধারণ সত্তা, একটা সাধারণ বিশ্বাস, একটা সাধারণ [common] বিশ্বদৃষ্টি লাভ করতে চাইছে মতাদর্শগত নির্মিতির (construction) জন্য তাদের প্রচেষ্টা ততই বাস্তব সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী ও আংশিক দৃষ্টিভঙ্গীর অংককে বাড়িয়ে তুলছে।

এর ব্যাখ্যাটা কি? হয় প্রভূত ক্ষমতা নিয়ে শয়তান এসে হাজির হয়েছে আমাদের মধ্যে, না হয়ত অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের একই সাধারণ ব্যাধির একটা কার্যকারণগত ব্যাখ্যা আছে। তাহলে সমস্ত মনঃসমীক্ষকরা, এডিংটন, কীইন্‌স, স্পেংগলার এবং বিশপরা, যাঁরাই অবস্থাটা সমীক্ষা করেছেন তাঁরাই যাবতীয় আধুনিক সংস্কৃতিরই এক সাধারণ সংক্রমণের উৎসটির (infection)—এবং সেই কারণে নিশ্চয়ই সেটা সুপ্রত্যক্ষ অথচ তার—স্থান নির্দেশ করতে [locate] পারলেন না কেন? উত্তর দিতে হলে এই সব মানুষদের নিজেদের প্রতি হার্ৎসেনের [Herzen] কথাটাই প্রয়োগ করতে হয়: 'আমরা চিকিৎসক নই, আমরাই ব্যাধি।'

মার্কসবাদীর প্রথম কর্তব্য হল, যে উপাদানগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক আবিষ্কারগুলিকে সূচিত করে সেগুলিকে এই বিভ্রান্তি থেকে পৃথক করা এবং তাঁর সংশ্লেষণাত্মক বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে সেগুলিকে খাপ খাওয়ানো। এ কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রতিটি আবিষ্কারের ক্ষেত্রেই যে কারণটি, বলতে গেলে, আবিষ্কারকের

হাতেই আবিষ্কারটিকে বিগড়িয়ে দেয় সেই কারণটির বিশ্লেষণ আরও বেশি শ্রমসাধ্য। বুর্জোয়া সংস্কৃতির উপর এই রহস্যজনক সর্বনাশ কেন ঘনিয়ে আছে যাতে তার অগ্রগতি তার ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করছে বলে মনে হয়? আর, একটি কারণই বা এত রকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে এত বিভিন্ন ধরনের অবক্ষয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে কি করে?

সংশ্লেষণাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক এই দুটি কর্তব্যই এই আলোচনাগুলির বিবেচ্য। কিন্তু এই পর্যায়ে দ্বিতীয়টিকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে গণ্য করা হয়েছে। সুরুতেই লেনিনের উদ্ধৃতি দেওয়া কোন কোন রচনার সুর বড় বেশি রকমের সমালোচনামূলক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখার একটা মূল্য এই যে তা সর্বদাই একই পদ্ধতির প্রয়োগ। শিল্প, দর্শন পদার্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা এবং জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কৃতির 'সংকট' সর্বদা একই কারণের জন্য দেখা দিয়েছে। আর এটা কোন আকস্মিক ঘটনাও নয়, কারণ সেই ধ্বংসাত্মক অসুস্থতাটা আদিতে ছিল বুর্জোয়া সভ্যতার গতিশীল শক্তি [dynamic force]; কিন্তু এখন, তার সমস্ত সম্ভাবনাগুলি নিঃশেষে সাধিত হওয়ার পর তা একটা অশুভ শক্তি হয়ে উঠেছে। জীর্ণ এঞ্জিন গতিরোধকারী শক্তি [breaks] হয়ে যায়। জরাজীর্ণ সত্যগুলি হয়ে যায় বিভ্রম (illusion)। বুর্জোয়া সংস্কৃতি একটা কপোলকল্পনার (myth) কারণে মরতে বসেছে।

কিন্তু বলা হবে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি বিভ্রমের ব্যাধিতে ভুগছে না, ভুগছে বিভ্রমভঙ্গের ব্যাধিতে। ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, ডি. এচ. লরেন্স এবং ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ প্রত্যেকেই এই কথা বলেছেন। ঠিকই, কারণ বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিভ্রমের বিপদই হল এই যে সে নিজেকে বিভ্রমমুক্ত বলে বিশ্বাস করে। ধর্ম, ঈশ্বর, নৈতিকতা, গণতন্ত্র, উদ্দেশ্যসাধনবাদ [teleology] ও তত্ত্ববিদ্যার [metaphysics] যাবতীয় গৌণ বিভ্রমগুলি সে পরিহার করেছে। কিন্তু নিজেকে সে মূলগত বুর্জোয়া বিভ্রম থেকে মুক্ত করতে পারছে না, আর যেহেতু এই বিভ্রম সম্পর্কে সে অবহিত নয়, এবং যেহেতু এই বিভ্রমের যাবতীয় আবরণ ঘুচে গিয়ে তার নগ্ন সারবস্তু আজ বেরিয়ে পড়েছে, সেই কারণে সমকালীন মতাদর্শের গোটা বুননটাকে [fabric] তা প্রচণ্ড ভাবে বিকৃত করে ফেলেছে।

বিভ্রমটা এই যে মানুষ হল স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন—'স্বাভাবিকভাবে' এই অর্থে যে, সমাজের সমস্ত সংগঠনগুলিকে এই হিসাবে গণ্য করা হয় যে সেগুলি মানুষের স্বাধীন সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে [instincts] সীমাবদ্ধ ও পঙ্গু করছে এবং বাধানিষেধ

হাজির করছে, যেগুলি তাকে সহ্য করতেই হবে এবং যতদূর সম্ভব সেগুলিকে ছোট করে তুলতেই হবে। একথার পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, মানুষ যখন তার নিজের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতে পারে তখনই সে সর্বোত্তম ও মহোত্তম।

এই বিভ্রম অবশ্যই বুর্জোয়া শ্রেণীর নবজাগরণের যুগে পাওয়া সনদ। 'স্বাভাবিক মানুষের' জন্য এই সনদ যা তাঁর সামন্ততান্ত্রিক বাধানিষেধ [restrictions], বিশেষ সুযোগসুবিধা [privileges] ও একচেটিয়া অধিকারের হাত থেকে স্বাধীনতার দাবি করেছিল। সমাজের মূলগত সম্পর্কটিকে হতে হবে যে কোনও ধরনের সম্পর্কের হাত থেকে স্বাধীনতা—স্বাধীন বণিক, স্বাধীন শ্রমিক আর স্বাধীন পুঁজি। জোর দিয়ে এই কথা বলা হল যে, এইভাবে প্রত্যেক মানুষ যদি তার আকাঙ্ক্ষাকে স্বাধীনভাবে অনুসরণ করে তাহলেই সমাজের সর্বোত্তম স্বার্থ সামগ্রিক ভাবে সাধিত হবে। সামন্ততান্ত্রিক নীতির থেকে উন্নততর এই নীতি বুর্জোয়া শ্রেণীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গতিশীল করে তুলল, এবং কিছু দিনের জন্য, এই নীতিকে শাশ্বত সত্যের অনুমোদন দিল। আর এখনও পযন্ত এই পূর্ব-অনুমানের [assumption] উপরেই বুর্জোয়া সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

এটা যদি সত্য হত তাহলে সব কিছুই বেশ ভালো হত। স্বাধীনতা যদি এতই সোজা হত যে মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীন তাহলে তো ভালোই হত। কিন্তু সেটা যে সত্য নয়। স্বাধীনতা সহজপ্রবৃত্তির ফসল নয়, তা সামাজিক সম্পর্কগুলিরই সৃষ্টি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে স্বাধীনতা নিঃসৃত হয় [is secreted]। বুর্জোয়া সংস্কৃতির এই চাহিদা বাস্তবায়িত হওয়া ছিল বস্তুতঃ অসম্ভব। মানুষ তার সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারলে সে আর মানুষ থাকে না। তবে হাঁ, এই সামাজিক সম্পর্কগুলির দিকে সে চোখ বুঁজে থাকতে পারে। সেগুলিকে সে পণ্যের সঙ্গে, নৈর্ব্যক্তিক বাজারের সঙ্গে, নগদের সঙ্গে, পুঁজির সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে ঢেকে রাখতে পারে এবং তার সম্পর্কগুলি তখন অধিকারাত্মক [possessive] হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তখন সে পণ্য, নগদ ও পুঁজির 'মালিক' হয়ে যায়। তার যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কগুলি কোনও একটা সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বলে প্রতীয়মান হয়, এবং মানুষ যেহেতু সামগ্রীর থেকে বড় অতএব সে এখন স্বাধীন, সে এখন আধিপত্য বিস্তার-কারী। কিন্তু এটা একটা বিভ্রম। মানুষে মানুষে যত কিছু সম্পর্ক দিয়ে সমাজ গঠিত এবং যা তার প্রকৃত উপাদান সামগ্রী ও সারবস্তু [stuff and substance] তার দিকে চোখ বন্ধ রেখে মানুষ নিজেকে সেই সব শক্তির দাস করে তুলেছে যে

শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা এখন তার সাধ্যাতীত, কারণ সেগুলির অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। সে এখন বাজারের, পুঁজির চলনের এবং তেজী ও মন্দার দাস। নিজেই সে নিজেকে প্রবঞ্চিত করেছে। ঘটনার নিষ্করুণ পরীক্ষায় তা প্রমাণিত।

বুর্জোয়া স্বাধীনতায় প্রত্যেক মানুষেরই তার নিজের স্বাধীন আকাঙ্ক্ষার জন্য, নিজের মুনাফার জন্য সংগ্রাম করার স্বাধীনতা আছে। সেই কারণেএই বুর্জোয়া স্বাধীনতা আমাদের স্বাধীন করা দূরে থাক, বহুদিন হল আকস্মিকতার হাতে আমাদের তুলে দিয়েছে। যুদ্ধ, বেকারি, মন্দা, নৈরাশ্য ও মানসিক ব্যাধির রূপে অন্ধ নিয়তি [Fate] 'স্বাধীন' বুর্জোয়াকে আর তার 'স্বাধীন' অনুচরদের আক্রমণ করছে। তার সংগ্রাম তাকে ফিনান্স-পুঁজির দাস করেছে, ট্রাস্টভুক্ত করেছে, অথবা সে যদি 'স্বাধীন' শ্রমিক হয় তাহলে তাকে ব্যাপক—উৎপাদনের কারখানায় একত্রিত করেছে। স্বাধীন হওয়া দূরে থাক সামাজিক পরিবর্তনের ঝড়ের মুখে কুটার মত সে ঘূর্ণিপাক খেতে থাকে। আর এই সব নৈরাজ্য, আর ক্লীবত্ব আর মতপার্থক্যের জগাখিচুড়ি তার সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হতে থাকে। উৎপাদিকা শক্তিগুলি স্বাধীন বুর্জোয়াকে ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং তাকে আর তার বিভ্রমকে নির্দয়ভাবে পিষে ফেলছে।

এই রকম একটা সহজ ভুল, যদি তা ভুল হয়, কি পদার্থবিদ্যার নিরুত্তাপ অধিকারক্ষেত্রকে, শিল্পের সুদূর লোককে এবং মনোবিদ্যার গহীন জগৎকে সংক্রামিত করতে পারে? দর্শনকে সে কি বিকৃত করতে পারে, পারে কি বীরকে তার সাফল্য থেকে দূরে রাখতে? সর্বদাই এক বিকৃতিসাধনকারী উপাদান হিসাবে, অথচ সেই ভাবে পরিলক্ষিত না হয়ে, মতাদর্শের সর্বত্র কি করে সেটা দেখা দিতে পারে? কিন্তু যেহেতু সেটা ইথারের গতিবেগ পরিমাপের ক্ষেত্রে ফিটজেরাল্ড সংকোচনের মত তার মতাদর্শের মধ্যে সর্বত্র দেখা দেয়, সেইজন্যই বুর্জোয়া এটিকে লক্ষ্য করতে পারে না, পদার্থবিজ্ঞানী যেমন পারে না ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতিবেগ লক্ষ্য করতে।

এই 'মুমূর্ষু সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনাগুলি' বিভিন্ন রকমের, যদিও তাদের প্রসঙ্গগুলিকে আলোচ্যবিষয়ের দিক থেকে একটি সূত্রে গাঁথা যেতে পারে। সমকালীন সংস্কৃতির কেন্দ্রে অবস্থিত যে মিথ্যা, যে মিথ্যা তাকে হত্যা করছে, সেটাই হল এই আলোচ্যবিষয়, আর আরও গভীরে এক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যে সত্য হল এই মিথ্যার পূরক [complement], যে সত্য সংস্কৃতিকে একদিন রূপান্তরিত করবে, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবে।

এক

জর্জ বার্নার্ড শ

॥ বুর্জোয়া অতিমানব সম্পর্কে একটি আলোচনা ॥

'ফ্যাবিয়ানদের খপ্পরে পড়া এক ভালোমানুষ।'—লেনিন।

ইংলণ্ড আর আমেরিকা এই দুই দেশেরই 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত' সাধারণ মানুষের কাছে শ তাঁর জীবদ্দশাতেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রতিনিধি হিসাবে সাধারণ স্বাকৃতি লাভ করেছিলেন। শ'র ব্যাপারটা অনেক দিক থেকেই আগ্রহজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ; বুর্জোয়া বিভ্রম যে কত অনমনীয়, ব্যাপারটা তারই একটা প্রমাণ। মার্ক্সবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া পরিচিত হতে পারে, এবং সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিদারুণভাবে সমালোচনাধর্মী হতে পারে, এবং সেটাকে পরিবর্তিত করতে উদগ্রীবও হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব কিছুই একমাত্র বৃথা ডানা ঝাপটানোতে পর্যবসিত হয়, কারণ সে বিশ্বাস করে যে মানুষ নিজের মধ্যে স্বাধীন।

শ একজন ভূতপূর্ব-নৈরাজ্যবাদী, নিরামিষাশী, ফ্যাবিয়ান এবং পরবর্তী জীবনে একজন সামাজিক ফ্যাসিবাদী [Social Fascist]: অপরিহার্যভাবে তিনি একজন কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদী [*Utopian* socialist]। ব্যাক টু মেথুজেলাহ (Back to Methuselah) পুস্তকে তাঁর ইউটোপিয়াতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা হল প্রবীণদের এক স্বর্গ যেখানে **চিন্তার** মধ্যে তাঁরা দিন কাটান এবং শিল্পসম্মত সৃষ্টি ও বিজ্ঞানের **সক্রিয়** কাজে ব্যস্ত প্রজাপতিধর্মী তরুণদের অবজ্ঞা করেন।

অর্থাৎ, শ তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বুর্জোয়া সংস্করণ সমাজতন্ত্রের দুর্বলতা এবং সারবস্তু দুইই উদ্ঘাটিত করলেন। এটি বিশুদ্ধ ধ্যানের (contemplation) অগ্রাধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশুদ্ধ ধ্যানের ক্ষেত্রে মানুষ একাকী সে হল আপাতঃদৃষ্টিতে সহযোগরহিত; এক একান্ত জগতে (private world) সে আবরিত; এবং বুর্জোয়া চিন্তা তখন তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে বিশ্বাস করে। বিজ্ঞানীর বিভ্রমও কি এটাই নয়? না, কারণ বিজ্ঞান **বিশুদ্ধ** চিন্তা (pure thought) নয়, তা হল কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত চিন্তা, বাস্তবের কষ্টিপাথরে তার সমস্ত চিন্তনকে (cogitations) যাচাই করে নেয়। চিন্তা যেমন হওয়া উচিত এ হল সেই চিন্তা —জানা (knowing) এবং সত্তার (being) মধ্য দিয়ে সর্বদাই যা দ্বান্দ্বিক গতিতে চলাচল করে। এই ধরনের চিন্তাকে শ ঘৃণা করেন। আধুনিক বিজ্ঞানকে তিনি ঘৃণা করেন! এর মানবিক দুর্বলতার কারণে সেটা তিনি করতে পারতেন, কিন্তু তা

নয় ; এর সারবস্তুর কারণে, এর সামাজিক গুণগুলির কারণে, এর সক্রিয় সৃষ্টিশীল ভূমিকার মধ্যে যা কিছু কল্যাণকর তারই কারণে একে তিনি ঘৃণা করেন।

দৃশ্যটা খুবই পরিচিত : 'বিশুদ্ধ' চিন্তার সাহায্যে বিরূপ বাস্তবের উপর বুদ্ধিজীবী প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। মানুষ তার কল্পনার মধ্যে ডুবে গিয়ে এমন বিধের [categories] বা যাদুমন্ত্রের সন্ধান পেতে পারে যা তাকে ধ্যানের দিক থেকে বাস্তবকে বশ করতে সক্ষম করবে,—এই বিশ্বাস মানুষের পক্ষে খুবই সাধারণ এক দুর্বলতা। এই ভুল হল 'তাত্ত্বিক' মানুষের ভুল, ভবিষ্যদ্বক্তার, অতীন্দ্রিয়বাদীর, তত্ত্বজ্ঞানীর ভুল, ব্যাধিবিজ্ঞানগত [pathological] রূপের দিক থেকে মানসিক রোগগ্রস্তের ভুল। আমাদের সকলের মধ্যেই যে আদিম যাদুবিশ্বাসী আছে এ হল তারই রেশ। শ'য়ের মধ্যে সেটা এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে বুর্জোয়া রূপ নিয়েছে। সত্য স্বাধীনতার জন্ম দেয়, এটা তিনি দেখেছেন ; কিন্তু এই বোধ যে একটা সামাজিক উৎপন্ন, এবং একজন অতীব বুদ্ধিমান মানুষ একাকীই তার সন্ধান পেতে পারেন এমন একটা জিনিস যে সেটা নয়, একথাটা তিনি বুঝতে চান না। শ তা সত্ত্বেও বিশ্বাস করেন যে মানুষ তার প্লেটনিক আত্মার মধ্য থেকে জগতের উপর প্রাধান্যবিস্তারী ভাবের [Ideas] রূপে বিশুদ্ধ জ্ঞান নিষ্কাষণ করতে পারে এবং বিতর্ক ও অবরোহী তর্কবিদ্যার [ratiocination] মধ্য থেকে, সামাজিক ক্রিয়া ব্যতিরেকেই, এক নতুন ও উচ্চতর চেতনা গড়ে তুলতে পারে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে প্রকৃত বিজ্ঞানীর মত প্রকৃত শিল্পীও এই ভুল কখনও করেন না। বাস্তবের সংস্পর্শে তাঁরা যে বার বার এসে পড়ছেন এটা তাঁরা দুজনেই দেখতে পান ; তাঁদের বাইরে যে বাস্তব সেই বাস্তবই তাঁদের আকাজ্ক্ষার ও সন্ধানের সামগ্রী।

বাস্তব এক বিরাট, কঠোর, এবং—মানুষ যতই তাকে জানতে থাকে ততই তা ক্রমবর্ধমানভাবে জটিল এক সামগ্রী। তাকে জানতে হলে কয়েক পুরুষ ধরে সামাজিকভাবে সঞ্চিত শ্রমের প্রয়োজন। বিজ্ঞান ইতোমধ্যে এতই জটিল হয়ে উঠেছে যে তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মানুষ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার আশা করতে পারে। একটি মন যাবতীয় জ্ঞানকে আয়ত্ত করবে, সেই পুরাতন স্বপ্ন আজ লোপ পেয়েছে। বিশাল নক্সীপর্দার [tapestry] উপর অল্প কয়েকটি ফোঁড় তুলে সহযোগিতা করাতেই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে, আর এই অল্প কয়েকটি ফোঁড়ও আগেকার দিনের একজন নিউটন বা একজন ডারউইনের বড বড় নক্সার [design] মত জটিল হতে পারে।

এদিকে একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা বাস্তবের উপর প্রাধান্য বিস্তারে বিজ্ঞান যে বিধিনিষেধ আরোপ করে তাতে শ তাঁর বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নিয়ে

অধৈর্য হয়ে উঠেন। বিজ্ঞানের সাজসরঞ্জামকে [apparatus] আয়ত্ত করার আশা শ'র নেই, সেই কারণে গোটা ব্যাপারটাকেই তিনি অর্থহীন বলে বিদায় করে দেন। সূর্য যে পৃথিবী থেকে নয় কোটি মাইল দূরে অবস্থিত, সেটাকে শ বলছেন বাজে কথা। প্রাকৃতিক নির্বাচনকে [natural selection] বলছেন অসম্ভব ব্যাপার। আর সেই কারণে এত পরিশ্রম করে পাওয়া এই সব প্রত্যয়গুলির [concepts] পরিবর্তে জগৎ সম্পর্কে হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদীদের [mystic] তত্ত্ব খাড়া করার মত শ পুরাপুরি নিজের আকাঙ্ক্ষা থেকে গড়া নানা ধারণা পেশ করছেন। গোটা বিজ্ঞানকে বাজে কথা বলে ঝেঁটিয়ে বাদ দিয়ে বাস্তবের ইতিহাস তিনি নতুন করে লিখলেন এক ওঝার তৈরি 'প্রাণ শক্তির' ['life-force'] তত্ত্ব ও আগামী দিনে অকার্যকর হয়ে পড়া এক ঈশ্বরের পরিভাষায়। শ'র বিশ্বতত্ত্ব [cosmology] বর্বর; সেটা ভাববাদী। সুপরিচিত নিউরোটিক পদ্ধতিতে, ইচ্ছাপূরণ জাতায় কাল্পনিক বিভ্রান্তিরাশি তার উপর চাপিয়ে দিয়ে এই অনমনীয়, দুঃখদায়ক, পাথুরে পরিবেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করলেন শ। শ নির্বোধ বলে যে এটা ঘটেছে তা নয়, বরং তিনি স্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি বলেই এটা ঘটেছে। বুদ্ধিবৃত্তির এই তীক্ষ্ণতাই তাঁকে এই অহমিকা দিয়েছে যে সামাজিক সাহায্য ব্যতিরেকেই, বিশুদ্ধ চিন্তনের [cerebration] সাহায্যেই সমস্ত জ্ঞানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। ভাসাভাসা ভাবে ছাড়া, জ্ঞানের সামাজিক প্রকৃতি তিনি স্বীকার করতে চান না। সেই কারণে জীবন সম্পর্কে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন এক চিকিৎসাশাস্ত্রবিদের খাড়া করা তত্ত্বের মত একটা ফলাফল আমরা তাঁর বিশ্বতত্ত্বে দেখতে পাই। একজন গড়পড়তা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে বর্বরজনোচিত তত্ত্ব খাড়া করার প্রবণতায় যেহেতু আজও আক্রান্ত, সেইজন্য শ'র গোটা দর্শনের মূলগত স্থূলতাকে তিনি যে দেখতে পান না, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এক বুর্জোয়াই আর এক বুর্জোয়ার সঙ্গে কথা বলে।

চিন্তাবিযুক্ত কর্মে বিশ্বাস করা বর্বরজনোচিত। সেটা হল ফ্যাসিস্ট বিধর্মিতা। কিন্তু কর্মবিযুক্ত চিন্তায় বিশ্বাস করাও সমান বর্বরতা, সেটা হল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর বিধর্মিতা। চিন্তা যদি একবার কর্ম [action] থেকে বন্ধন বিযুক্ত [declutched] হয়, তাহলে চিন্তা অচল হয়ে পড়ে—বা যে যন্ত্রের খাঁজকাটা চাকা কোনও কিছুকেই আঁকড়ে ধরতে পায় না, তার মত চলতে থাকে; কারণ চিন্তা হল কর্মের সহায়ক। চিন্তা কর্মকে পরিচালিত করে; কিন্তু পরিচালনা কি করে করতে হয় সেটা সে কর্ম থেকেই শেখে। সত্তাকে ইতিহাসের দিক থেকে এবং সর্বদা অবশ্যই জানার

পূর্বে দেখা দিতে হবে, কারণ সত্তার একটা সম্প্রসারণ [extension] হিসাবেই জানার আবির্ভাব ঘটে।

নিঃসঙ্গ চিন্তার অগ্রাধিকারের উপর শ'র সহজপ্রবৃত্তিগত বুর্জোয়া বিশ্বাসের সাক্ষ্য যে কেবল মাত্র তাঁর উদ্ভট বিশ্বতত্ত্ব ও বিরক্তিকর ইউটোপিয়ার মধ্যেই পাওয়া যায়, তাই নয়, তাঁর বাটলারপন্থী জীববিদ্যাতেও তা দেখা যায়। বাটলারের মতে প্রাণীরা লম্বা গলা বা ঐ জাতীয় কিছু পেতে চায় কি না আগে স্থির করে, তারপর সেই লক্ষ্যে মনকে একাগ্র ক'রে তারা সেই রকম অঙ্গাদি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। উদ্ভট হলেও বুর্জোয়া মনের উপর এই বাটলারপন্থী নিও-ল্যামার্কবাদের প্রচণ্ড আবেগগত প্রভাব আছে। বুর্জোয়া মনের কাছে এর আবেদন এত প্রবল যে এই প্রকল্পের অনুকূলে কণা মাত্র প্রমাণ না পেলেও এবং বিপরীত মতবাদের অনুকূলেই যত রকমের প্রমাণ পাওয়ার কথা স্বীকার করেও প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানীরা এটিকে সাময়িক [provisional] স্বীকৃতি দেওয়ার কথা যে সমর্থন করেন তার কারণ এই যে তাঁদের কাছে এটা খুবই 'চমৎকার' মনে হয়। বন্ধনমুক্তি ও ব্যক্তিমনের স্বতঃক্রিয়া [autonomy] সম্পর্কে বুর্জোয়া প্রত্যয় দ্বারা আচ্ছন্ন মনের কাছে এই প্রত্যয়, নির্বন্ধতাবাদ (determinism) যে স্বর্গরাজ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে তার জায়গায় এক ধরনের পরিবর্তের প্রতিশ্রুতি বলে মনে হয়।

শ'র ফ্যাবিয়ানবাদ যদি তাঁর সমস্ত সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত না হত, তাঁর সৃষ্টির শিল্পগত ও রাজনীতিগত মূল্যকে অপহরণ না করত, তাহলে এই ব্যাপারটার গুরুত্ব থাকত না। চিন্তার একক অগ্রাধিকারে বিশ্বাস করার ফলে তাঁর সমস্ত নাটকই মানবত্ববিহীন ; কারণ সেগুলি মানুষকে চলাচল-ক্ষমতা সম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তি হিসাবে দেখিয়েছে। সৌভাগ্য ক্রমে মানুষ তা নয় ; তা যদি হ'ত তাহলে মানব জাতি অনেক দিন আগেই তর্কশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যার কোনও স্বপ্নময় অলীককল্পনার মধ্যে লোপ পেয়ে যেত। মানুষ হ'ল অচেতন সত্তার এক একটি পাহাড়, সহজপ্রবৃত্তি ও সরল জীবনের পুরাতন পথ বেয়ে সে চলেছে, যার চূড়ায় চেতনার এক ধরনের অনুপ্রভা [phosprorescence] কখনও কখনও দেখা যায়। আর এই সচেতন অনুপ্রভার মূল্য ও ক্ষমতা জন্মায় আবেগ থেকে, সহজপ্রবৃত্তি থেকে ; কেবল তার রূপ জন্ম নেয় চিন্তার বুদ্ধিবৃত্তিগত আকৃতি থেকে। যুগে যুগে মানুষ এই চেতনাকে তীব্রতর করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, শিল্পী এই কাজ করেন আবেগগুলিকে সূক্ষ্মতর ও তীব্রতর করে তুলে, বিজ্ঞানী করেন চিন্তার রূপকে পূর্ণতর ও আরও বেশি বাস্তব করে তুলে, আর দুটি ক্ষেত্রেই এটা করা হয় সেই ক্ষীণকায় শিখায় সত্তাকে আরও বেশি প্রজ্জ্বলিত করে। শ অবশ্য 'বিশুদ্ধ' শিখার দ্বারা, সত্তা থেকে পৃথক অনুপ্রভার দ্বারা আবেশাচ্ছন্ন

[obsessed]। এইভাবে বিমূর্তান্বিত হয়ে ধারণাগুলি হয়ে ওঠে শূণ্যগর্ভ ও তুচ্ছ এবং দূর থেকে ভেসে আসা ঘন্টাধ্বনির মত কানে বাজে। শ'র নাটকগুলি হয়ে ওঠে 'রক্তশূণ্য বিধেয়গুলির অপার্থিব নৃত্য'।

চেতনার এই মিশ্র চিন্তা ও অনুভূতি সামাজিক ক্ষমতার উৎস নয়, তার একটা উপাদান মাত্র। সমাজ তার কলকারখানা, তার ঘরবাড়ি, তার বস্তুগত ঘনত্ব নিয়ে সর্বদাই প্রকৃত সত্তার পায়ের নীচে বর্তমান এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তা অজ্ঞাত অচেতন ও অযৌক্তিকের এক ধরনের বিরাট ভাণ্ডার; যে কারণে প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধেই আমরা বলতে পারি যে তার সচেতন জীবন তার সমগ্র অস্তিত্বের বস্তুপুঞ্জের উপর এক সদাচঞ্চল দ্যুতি। তাছাড়া, সমাজের সচেতন অংশকে ঘিরে এক ধরনের কঠিন খোলসের অনমনীয়তা থাকে যা পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করে, এমন কি এই সব সামান্যীকরণের তলায় তলায় উপাদান, করণকৌশল ও প্রকৃত বিশদীকৃত সত্তার পরিবর্তন যখন ঘটে চলেছে তখনও এই প্রতিরোধ চলতে থাকে। ফলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা চাপ [tension] দেখা দেয় যা সমাজে এক প্রকৃত গতিশীল শক্তি, যা থেকে সৃষ্ট হয় শিল্পী, কবি, ভবিষ্যদ্বক্তা, উন্মাদ, মানসিক রোগগ্রস্ত এবং যত রকমের ছোট খাটো অনিশ্চয়তা, অযৌক্তিকতা, আকস্মিক তাড়না [impulses], আকস্মিক অযৌক্তিক আবেগ, যাবতীয় আনন্দ ও ভীতি, যা কিছু জীবনকে করে তুলেছে জীবন এবং যা শিল্পীকে আনন্দে উদ্বেলিত আর মানসিক-রোগগ্রস্তকে করে তোলে আতঙ্কিত সেই সব কিছু। তা হল অস্বস্তিপূর্ণ, রক্ষণ-শীলতাবিরোধী, বিপ্লবী মানসিকতার সমষ্টি। এ হল সেই সব কিছু যা বর্তমানকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, যা প্রেমিককে ক্লান্ত করে তোলে প্রেমে, সন্তানদের নিয়ে যায় বাবা-মায়ের স্নেহঘেরা সংসার থেকে দূরে, আর বয়স্ক মানুষদের করায় আপাতঃ অপ্রয়োজনীয় প্রয়াসে নিজের অপচয়।

যাবতীয় সুখদুঃখের এই উৎস হল মানুষের সত্তা ও মানুষের চেতনার মধ্যকার অসামঞ্জস্য, যা সমাজকে চালিয়ে নিয়ে যায়, আর জীবনকে করে তোলে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সমস্ত চাপ, যা কিছু প্রাণহীন বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষেত্রের নীচে সে সমস্তই শ'য়ের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। জীবন-প্রেম [The Life Love], যা হল এই প্রকৃত সক্রিয় সত্তার শ'য়ের তৈরি এক স্থূল আধ্যাত্মিক পরিবর্ত, তা নিজেই বুদ্ধি-বৃত্তির দিক থেকে পাওয়া এক ধারণা। এইভাবে তাঁর চরিত্রগুলি হয়ে পড়ে অ-মানবিক; তাদের যত কিছু দ্বন্দ্ব তা ঘটে যৌক্তিক স্তরে, আর তার কোনওটারই নিষ্পত্তি কখনও ঘটে না—কারণ তর্কশাস্ত্র তার শাশ্বত তত্ত্ব-বিরোধগুলির সমাধান কি করে ঘটাতে পারে, যার সংশ্লেষণ এক মাত্র কর্মের মধ্য দিয়েই ঘটান সম্ভব?

এই চাপ সিজার ও জোয়ান অব আর্কের মত 'বীরদের' ('heroes') সৃষ্টি করে, অভিজ্ঞতার অসূত্রায়িত নির্দেশে সাড়া দিয়ে যে বীররা প্রচণ্ড সুপ্ত শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলেন যেগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানতে পারেন না, অথচ স্বয়ং ইতিহাস তাঁদের মেনে চলে বলে মনে হয়। এই ধরনের বীর শ'য়ের কাছে অচিন্ত্যনীয়। এ কথা ধরে নিতেই তিনি বাধ্য যে তাঁরা যা কিছু ঘটিয়েছেন তা তাঁরা সচেতনভাবেই সঙ্কল্প করেছিলেন। এই বীররা এ কারণেই তাঁর কাছে বুর্জোয়া ইতিহাসগ্রন্থের ছোট ছোট নিটোল মূর্তি হিসাবে, রীতিমত অমানবিক বলে প্রতীয়মান হয় এবং তাদের জীবনগুলিকে তিনি প্রশান্তভাবে গণ্য করেন যেন সেগুলি পরীক্ষার খাতায় 'সামাজিক পরিবর্তনের ধারার' উপর প্রশ্নের উত্তর। এই নাটকগুলি নাটক নয়। একে শিল্প বলে না, এ হল নিছক বিতর্ক এবং তারই মত নিষ্পত্তিহীন, যাবতীয় বিতর্কেরই মত ট্র্যাজিক চূড়ান্তধর্মিতা, কালিক অগ্রগতি বা শিল্পগত ঐক্যের অভাব তাতে বর্তমান।

আর এই কারণের ফলে শ'ও এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন অভিজাত এবং নিজ উদ্দেশ্যকে ঘোষণা করতে এবং তাৎক্ষণিক দাবিকে চরম তীব্রতার সঙ্গে ঘোষণা করতে অক্ষম কোন ব্যক্তি, উদ্ভট বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসাবে ছাড়া, তাঁর নাটকে আবির্ভূত হয় না। অভিনেতারা কিছুই নয়, চিন্তনকারীরাই সব কিছু। এমন কি বাস্তব জীবনে যে মানুষ শক্তিশালী, প্রতাপশালী ও রীতিমত মেধাহীন—'মেজর বারবারা' নাটকের 'অস্ত্রবাহীর' মত—তাকেও মঞ্চের উপর আকর্ষণীয় করতে হলে তার আগে তাকে এক মেধাবী তাত্ত্বিক মানুষে রূপান্তরিত না করলে (শ'য়ের মতে) চলে না। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিগত সূত্রায়ণের ক্ষমতাবিহীন যে সব চরিত্রগুলি এই রকম হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবের উপর তাদের প্রভাবের দিক থেকে আমাদের যে কোনও বুদ্ধিজীবী বন্ধুর থেকে আরও বেশি উদার, আরও বেশি মহান, আরও বেশি শক্তিশালী ও কার্যকর বলে মনে হয়, তাদের আমরা সকলেই চিনি এবং তাদের গুণগান করি। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই একথা আমাদের ভালোই জানা আছে যে জগৎকে চালিত করার পক্ষে কেবল মাত্র চিন্তাই যথেষ্ট নয়। আর 'বিভ্রমাত্মক' 'অযৌক্তিকতাপূর্ণ' শিল্পের প্রতি,—যে শিল্প আমাদের নিছক অভিজ্ঞতাকে নাড়া দেয়, তাকে এক পলাতক ও বিশুদ্ধ আবেগগত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে,—সেই শিল্পের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলির মধ্যে এই কথাটিকে আমরা স্বীকৃতি দিই। এই সব চরিত্ররা যাঁরা যুদ্ধ, শিল্প, রাষ্ট্রনেতৃত্ব ও নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছেন তাঁদের কাউকেই শ'য়ের নাটকগুলিতে দেখা যায় না। বুর্জোয়া ডায়ালেকটিকের উত্তম তার্কিক নয়, অথচ আকর্ষণীয়—এমন কোনও চরিত্র

আঁকতে শ অক্ষম। এই দুর্বলতা স্বভাবতঃই তাঁর সর্বহারা চরিত্রগুলির মধ্যেও দেখা যায়। মেজর বারবারার আর্মি হোস্টেলের সর্বহারাদের মত তারা নিছক ক্যারিকেচার। ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান নাটকের শোফারের মত 'শিক্ষিত' হলে তবেই তারা মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে ওঠে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শ'য়ের আদর্শ জগৎ সাম্যবাদের জগৎ নয়; ওয়েলস'এর জগতের মত দরিদ্র অল্পবুদ্ধি শ্রমিকদের পরিচালক বুদ্ধিজীবী সামুরাই দ্বারা শাসিত এক জগৎ; এক ফ্যাসিবাদী জগৎ। কারণ, স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্পর্কে এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা তাদের ধারণার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের দ্বারা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার বিপরীতে, ফ্যাসিবাদে গিয়ে পৌছাতে বাধ্য। শ'য়ের ইউটোপিয়া হল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া এক পরিকল্পনামাফিক জগৎ যার সংগঠনটি থাকে বুদ্ধিজীবীদের আমলাতন্ত্রের হাতে। এই ধরনের কোনও জগৎ সাম্যবাদের জগতের দ্বারা প্রতিষেধিত হয়; সাম্যবাদের জগতে সকলেই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে এবং সক্রিয় বুদ্ধিজীবীরা, যারা এখন আর সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, সচেতন শ্রমিকদের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে, ঠিক যেমন শ্রমিকরাও এখন চিন্তার কাছ থেকে নির্দেশলাভের দাবি করে। চিন্তা ও কর্মের মধ্যকার মারাত্মক শ্রেণীগত ব্যবধান এখন দূর হয়ে যায়। এই জগতের অফিসাররা কর্তব্যকাজ করার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, এবং তাদের একজনের বদলে আর এক জনকে নিযুক্ত করা যায়। এ হল সেই জগৎ যা পুরাতন ফ্যাবিয়ান স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের বিপরীত। এ হল এক শ্রেণীভিত্তিক ইউটোপিয়া শাসক শ্রেণী যার মধ্যে এক স্থায়ী, বুদ্ধিজীবী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমলাতন্ত্রের রূপ নেয়, যে আমলাতন্ত্র সর্বহারার 'মঙ্গলের' জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। এটা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক সুখস্বপ্নের জগৎ। মধ্যবিত্ত শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীর মত জগতের মালিকও নয়, সর্বহারা শ্রেণীর মত একদিন জগতের মালিক হওয়ার নিশ্চয়তাও তার নেই। এ এক অলভ্য স্বপ্ন যা এখনও পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীকে সর্বহারার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তাকে প্রতিক্রিয়া ও ফ্যাসিবাদের দুর্গ করে রেখেছে। স্বাধীনতা যেন এক ধরনের ঔষধ যা সদিচ্ছাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি 'অজ্ঞ' শ্রমিকের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দিতে পারে, স্বাধীনতা সম্পর্কে এই রকম এক ধারণায় শ'য়ের এখনও পর্যন্ত অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। সেই স্বাধীনতা বুর্জোয়ার পক্ষে ঔষধ হতে পারে, শ্রমিকের নয়। বুদ্ধিজীবী বা শ্রমিক কারও অধিকার নেই যে সে এই অমূল্য স্বাধীনতা দান করতে পারে; দুজনেই যে তাদের কালের বিধেয়গুলির চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ, আর সাম্যবাদই হল প্রকৃত স্বাধীনতার সক্রিয় সৃষ্টি যা এখনও পর্যন্ত কেউ কাউকে

দিতে পারে না—এটা শ দেখতে পান না। এ হল আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে এক অভিযান, কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। রোমানরা, সামন্তপ্রভুরা ও বুর্জোয়ারা যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তা বিভ্রমাত্মক বলে প্রমাণ হয়েছে কেবল এই কারণেই যে তারা বিশ্বাস করত একটি শাসক শ্রেণী তার সন্ধান পেতে পারে এবং সমাজের উপর তা আরোপ করতে পারে। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যে তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষ এখনও সর্বত্র শৃঙ্খলবদ্ধ, কারণ তারা তাদের ক্রীতদাসদের, সামন্ত প্রজাদের বা শোষিত সর্বহারাদের সঙ্গে একত্রে স্বাধীনতার সন্ধান করেনি ; আর তারা যে সে কাজ করেনি তার কারণ এই যে, সেইভাবে যদি তারা চলত তাহলে তারা আর শাসক শ্রেণী থাকত না, উৎপাদিকাশক্তিগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে যখন শাসক শ্রেণীগুলির অস্তিত্বের আর প্রয়োজন নেই ততদিন পর্যন্ত সেটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং শ'য়ের মত সদিচ্ছাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী যখন এই দুঃসাধ্য স্বাধীনতার সন্ধান করেন তার আগে তাঁকে সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থাটিকে এমন এক ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য প্রথমেই সাহায্য করতে হবে যেখানে সমাজের কর্তৃত্ব থাকে সমস্ত লোকের হাতে, একটি শ্রেণীর হাতে নয়। স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে কোনও ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ; কিন্তু যেহেতু তিনি সমাজে বাস করেন এবং সমাজ বেঁচে থাকে উৎপাদন-সম্পর্কগুলির সাহায্যে এবং তারই মধ্যে, সেই কারণে এর অর্থ হল মানুষকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে সমাজকে তার উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার (govern) পূর্ব-অনুমান হল এই যে, ওই ব্যক্তি নিজে যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় সেইরকম কোনও শ্রেণী দ্বারা সমাজ শাসিত নয়। স্বাধীনতার সন্ধান শ্রেণীহীন রাষ্ট্রেই মাত্র সুরু হয়, যখন সমাজ সম্পূর্ণভাবে আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে স্বাধীনতার কঠিন পথগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে পারে। কিন্তু আমাদের ভাগ্য যখন একটি শ্রেণীর দ্বারা পরিকল্পিত বা বাজারের দরকষাকষির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা একদল মার্জিত সামুরাই দ্বারা বিন্যস্ত হয়, তখন এই স্বাধীনতা কিভাবে অর্জিত হওয়া সম্ভব ? কিন্তু বিমূর্ত সত্য ও ন্যায়বিচারের ব্যাপারে দুজন দার্শনিককে যেহেতু কখনও একমত হতে দেখা যায় না, তখন বুদ্ধিজীবী সামুরাইরা কি করে একমত হতে পারে ? কিন্তু চিন্তার সীমাহীন 'এই হলে ঐ হবে' পরম্পরার (sic et mon) একটি মাত্র সালিশের (referee) সন্ধান আজ অবধি পাওয়া গিয়েছে—তা হল কর্ম (action)। কিন্তু যে জগতে চিন্তা শাসন করবে আর কর্মকে মুখ বুঁজে চুপ করে থাকতে হবে, সেখানে এই প্রশ্নের সমাধান কি কখনও সম্ভব ? সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কর্ম পরিব্যাপ্ত : সমাজের

প্রাণ হল প্রতিটি মানুষের কর্ম। বহুর কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ সুযোগসুবিধাভোগী স্বল্পসংখ্যকের চিন্তার দ্বারা সমাজের রূপটি যখনই নির্ধারিত হয় তখনই সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

চিন্তা সত্তা থেকে প্রবাহিত হয় এবং মানুষ তার সামাজিক সম্পর্কগুলিকে পরিবর্তিতকরার দ্বারা তার চেতনাকে পরিবর্তিত করে, যে পরিবর্তন হল এই সম্পর্ক-গুলির নীচে অবস্থিত প্রকৃত সত্তার চাপের ফল। এই প্রাথমিক সত্যকে শ যেহেতু পরোক্ষভাবে অস্বীকার করেন, সেই কারণে প্রচারমূলক কার্যকলাপের তুলনায় বিপ্লবী কর্মের কার্যকারিতাকে আবশ্যকীয়ভাবে অস্বীকার করতেই হয় শকে, ওয়েল্‌সের মত শ'ও বিশ্বাস করেন যে একমাত্র মত প্রচারই জগৎকে চালাবে। কিন্তু জগৎ চলে এবং যদিও মত প্রচারের মধ্য দিয়ে এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে জগৎচলে তবুও এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে যাবতীয় মতপ্রচারই (preaching) তাকে চালাচ্ছে। কেবল এইটুকু বলা যায় যে, যে মতপ্রচার জগতের গতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে, যে মতপ্রচার চলে কর্মের গতিপথ বেয়ে এবং ঘটনার বুননগুলিকে কেটে ফেলে, সেই মতপ্রচারই জগৎকে চালায়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী তা সত্ত্বেও সর্বদাই বিশ্বাস করে যে যা কিছুকে সে বিমূর্ত সত্য ও ন্যায়বিচার বলে মনে করে—নিরামিষাহারবাদ বা সমপরিমাণ উপার্জন বা টিকা দেওয়ার বিরোধিতা—তাই সফল যুক্তিপ্রয়োগের দ্বারা জগতের উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব। শ'য়ের নাটকে সেটাই দেখা যায়।

কিন্তু শকে এখানে এক উভয়সঙ্কটের মুখে পড়তে হয়। তাঁর বিমূর্ত সত্যগুলিকে যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক পদ্ধতির সাহায্যে তাঁকে চাপিয়ে দিতে হয় জগতের উপর। কিন্তু চিন্তনকারী নয় বা অর্ধ-চিন্তনকারী মানুষের যে জগতের উপর এটা তিনি চাপিয়ে দেন সেই মানুষেরা আবশ্যিক ভাবেই এক নিকৃষ্ট জাতির প্রাণী—নিছক শ্রমিক তারা, অ-বুদ্ধিজীবীদের এক অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন সমষ্টি, আকারহীন নমনীয় জনসমষ্টি, সৃষ্টির বুদ্ধিজীবী প্রভুরা তাঁদের ঈশ্বরসুলভ আদেশের দ্বারা বিপর্যয় থেকে যাদের উদ্ধার করেন। এই সব প্রাণীদের মগজে বোধশক্তি প্রবেশ করান কি করে সম্ভব? কোন্ জিনিসের আবেদন তাদের শিশুসুলভ চপল মনে গিয়ে পৌছাবে? শিশুদের সঙ্গে যে ভাবে ব্যবহার করতে হয় তাদের সঙ্গে অবশ্যই সেই রকম ব্যবহার করতে হবে; আপাতঃ অসম্ভাব্যতা (paradox) দিয়ে, হাস্যরস দিয়ে, প্রাণবন্ত ও উদ্ভট ঘটনা দিয়ে যুক্তির ওষুধের বড়িটাকে অবশ্যই সুস্বাদু করে তুলতে হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিগত চেতনার মুখ্যতায় বিশ্বাস শ'কে শিল্পী হয়ে উঠতে বিরত করেছিল। এইভাবে সেই একই বিশ্বাস শ'কে একজন নিষ্ঠাবান চিন্তাশীল মানুষ হয়ে উঠতে বা সমকালীন চেতনার ক্ষেত্রে একটি প্রকৃত শক্তি হয়ে উঠতেও বিরত করল। তিনি

হয়ে উঠলেন জগতের বিদূষক; তাঁর বাণীগুলি সর্বদাই হাস্যরসের মিষ্টি মোড়কে ঢাকা থাকার কারণে সেগুলিকে সর্বদাই হাস্যোদ্রেককারী বলেই গণ্য করা হয়েছে। যে ইংরেজ বুর্জোয়া মার্ক্সকে অবহেলা করেছিল, লেনিনকে ছোট করেছিল এবং তার (Tom Mann) কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল সেই ইংরেজ বুর্জোয়া শ'কে এক ধরনের রাজসভার বিদূষক হিসাবে সহনশীল রসবোধের দৃষ্টিতে গণ্য করেছিল। যে মানুষদের তিনি কম মূল্য দিয়েছিলেন তারা তাকে কম মূল্যই দিল। ওষুধের বড়ির উপর তিনি যে চিনির প্রলেপ লাগিয়েছিলেন সেই প্রলেপই বড়িটাকে কাজ করতে দিল না।

বিপরীতভাবে, মার্ক্স তাঁর ডাস ক্যাপিটালকে ইংরেজ বুর্জোয়ার ক্লান্ত মস্তিষ্কের কাছে আবেদনযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করেননি। তাঁর বই ভালো বিক্রির জন্য বা ওয়েষ্ট এণ্ডের সাফল্যলাভের জন্য মার্ক্স তাঁর মতামতকে রেখে ঢেকে দেখান নি। সমকালীন সাংবাদিক সম্মেলনে সরস সাক্ষাৎকারেও তিনি যোগ দেননি। অল্প কয়েকজন সমসাময়িক ইংরেজের কাছেই মাত্র তাঁর নাম পরিচিত ছিল, আর শ'য়ের নাম লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পরিচিত। কিন্তু যেহেতু মার্ক্স নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর বাণী দিয়েছিলেন, মানব জাতির সঙ্গে নিজের সমকক্ষের মত ব্যবহার করেছিলেন, সেইজন্য মানুষ তাঁর বাণীকে গুরুত্বের সঙ্গে এবং ভালোভাবেই নিয়েছিল। যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন না যে চিন্তাই জগৎকে শাসন করে, বরং এই বিশ্বাসই করতেন যে চিন্তাকেই কর্মের বুননকে অনুসরণ করতে হবে, সেইজন্য তাঁর চিন্তা অন্য যে কোনও একক ব্যক্তির থেকে অনেক বেশি জগৎ-সৃষ্টিকারী হয়েছে। পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ এলাকা জুড়ে সেটি যে কেবল মাত্র এক নতুন সভ্যতারই জন্ম দিয়েছে তাই নয়, অন্যান্য সমস্ত দেশে সমস্ত বিপ্লবী শক্তিগুলি মার্ক্সের চিন্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত (oriented); সমকালীন যাবতীয় রাজনীতির গুরুত্বের পরিমাণও ততটাই যে পরিমাণে তা মার্ক্সপন্থী বা তার বিরোধী।

মার্ক্সের বুদ্ধিবৃত্তি শ'য়ের বুদ্ধিবৃত্তির থেকে বড় মাপের ছিল, একথা বললে কোনও উত্তর হয় না। শ যদি মার্ক্স হতেন তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি মার্ক্সই হতেন। বুদ্ধিবৃত্তি জিনিসটাকে পরিমাপ করার জন্য কোনও মান কেউ আবিষ্কার করেন নি, যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তিগুলির আপনা আপনি কোনও অস্তিত্ব নেই, সেগুলির প্রকাশ্য মননের মধ্যেই মাত্র তাদের অস্তিত্ব। শ এবং মার্ক্স দুজনেই ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ। তাঁদের রচনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং দুজনেই তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে লোভজর্জর বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি ভেঙে পড়ার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু একজনের মন ছিল ভবিষ্যতের দিকে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে যেতে

সক্ষম, অপর জনের মন যে বুর্জোয়া বিধেয়গুলিকে নিন্দা করে তারই বন্ধনে সর্বদা বন্দী। যেহেতু শ মানবজাতিকে তাঁর থেকে ছোট বলে গণ্য ক'রে, উঁচু থেকে দয়া করে এবং তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাঁর বাণী দিয়েছিলেন, সেই কারণে তাঁর বাণী বহুলপঠিত কিন্তু স্বল্পগণ্য হয়েছে, এবং যে মনোভাব সেই বাণীদানকে নির্ধারিত করেছিল, সেই মনোভাবের যাবতীয় মিথ্যা ও অবাস্তবতা সেই বাণীর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।

শ অল্প বয়সেই মার্ক্স পড়েছিলেন এবং সেইজন্য মত-পরিবর্তিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে জগতের উদ্ধার ঘটবে এই ধরনের স্বপ্ন-দেখা একজন জনপ্রিয় সংস্কারক হওয়ার পরিবর্তে এক বিপজ্জনক বিপ্লবী হওয়ার বিকল্প তাঁর সামনে খোলা ছিল। যদিও বুর্জোয়া জীবনের লজ্জা ও মিথ্যাচারগুলি মার্ক্স তাঁর কাছে তুলে ধরেছিলেন তবুও তিনি স্থির করলেন যে ভবিষ্যতের শ্রেণীর দ্বারা এই ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীকে উৎখাত করার প্রয়োজনকে তিনি স্বীকাব করবেন না। সেই দিন থেকে শ নিজে দাঁড়ালেন নিজেরই বিরুদ্ধে।

শ'য়ের ব্যক্তিগত জীবন থেকেই এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা যায়। হীনাবস্থায় পতিত একদা অবস্থাপন্ন ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বতন পারিবারিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সম্পর্কে শিশুকাল থেকে বিশ্বাস গড়ে ওঠা, উচ্চাভিলাষী তরুণ শ লণ্ডনে এলেন সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে। এখানে আসার পর কিছুদিন তিনি লিখে উপার্জন ক'রে যে কোনও গরীব শ্রমিকের মত জীবনযাপন করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছিল এক প্রস্থ ড্রেস-স্যুট, আর ছিল পিয়ানো বাজানোর অসাধারণ ক্ষমতা। ফলে অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও মার্জিত কেনসিংটন মহলে মেলামেশা করতে তিনি সক্ষম হলেন। সর্বহারা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে তিনি আঁকড়ে ধরলেন বুর্জোয়া শ্রেণীকে। একইভাবে, মার্ক্সের রচনা পড়ার ফলে মতাদর্শগত দিক থেকে সর্বহারা-শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে সেটাকে তিনি প্রতিরোধ করলেন এবং ফ্যাবিয়ানবাদকে তার বুর্জোয়া ঐতিহ্য ও সামাজিক মর্যাদাসহ আঁকড়ে ধরলেন।

এই সমস্যাটি এবং তার যে সমাধান তিনি দিলেন তা তাঁর মতাদর্শকে এবং তাঁর শিল্পকেও নির্ধারিত করল। তাঁর মার্ক্সবাদের জ্ঞান যাবতীয় বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসাত্মকভাবে আক্রমণ করতে তাঁকে সক্ষম করে তুলল। কিন্তু যে প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি কখনও সক্ষম হননি তা হল: সেগুলির উন্নতিসাধনের জন্য কথা বলা ছাড়া আমাদের আশু কর্তব্য আর কি? এই সমস্যা তাঁর রচনায় বারবার দেখা দিয়েছে, যেমন উইডোয়ার্স হাউসেস, মেজর বারবারা, মিসেস ওয়ারেন্‌স্ প্রফেসন

নাটকে। আর প্রত্যেক বারেই সেটিকে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থাটা যতক্ষণ না পরিবর্তিত হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের সব কিছু মেনে নিতেই হবে। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থাটার পরিবর্তনের জন্য কথা বলা ছাড়া অন্য কোনও আশু পদক্ষেপ কিছুতেই নেওয়া যাবে না। মেজর বারবারা প্রথম যখন দেখলেন যে, যে খৃষ্টতে তিনি বিশ্বাস করেন সেই খৃষ্টই পুঁজির কাছে বিকিয়ে গিয়েছেন তখন তিনি আতঙ্কিক হয়ে পড়লেন। কিন্তু যে অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানার মালিক সেই খৃষ্টকে কিনে নিয়েছেন সেই কারখানার ম্যানেজারকেই তিনি শেষ অবধি বিবাহ করলেন। শাসক শ্রেণী যে হাড়ে মজ্জায় পচে গিয়েছে এবং শ্রমিকদের শোষণ করেই তারা যে বেড়ে উঠেছে এটা শ দেখতে পেয়েছিলেন। সেই শ'ও কিন্তু শেষ পর্যন্ত মতাদর্শগত দিক থেকে অর্থ, মর্যাদা, খ্যাতি, শান্তিপূর্ণ সংস্কারতত্ত্ব, এমন কি শেষ অবধি মুসোলিনিকেও গ্রহণ করলেন। প্রচলিত ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করার জন্য যে লোক কোনও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে না, সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেই সে সাহায্য করে।

কিন্তু যেহেতু তিনি মার্ক্স পড়েছেন ঠিক সেই কারণেই শ এই সমাধানের মূলগত দ্বন্দ্বটি বুঝতে পারেন। এই কারণে তাঁর নাটকগুলিতে সুচিন্তিতভাবে জোর করে মত পরিবর্তন, যথেষ্ট প্রত্যয় জাগায় না এমন সব নাটকীয় উদ্ঘাটন (unconvincing denouements) এবং অলীককল্পনা ও হাস্যরসের মাধ্যমে সাধারণভাবে বাস্তব থেকে পলায়ন দেখা যায়। পশুদের ক্লেশ থেকে যে কলুষিত সামগ্রীর সমস্যাটি উদ্ভূত সেই সমস্যাটির সরল সমাধান শ তাঁর নিজের জীবনে করেছিলেন। মাংস ও বসা (sera) ব্যবহার করা উচিত নয়; একটির জন্ম পশুহত্যা থেকে, অপরটির পশু ব্যবচ্ছেদ থেকে। কিন্তু একজন মানুষ তা থেকে নিবৃত্ত থাকলেও এই অশুভ ব্যবসায়টি বেশ ভালোই চলতে থাকে। কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে এবং যাবতীয় বুর্জোয়া মর্যাদার মধ্যে ধরা ছোঁয়ার অতীত অন্যতম সামগ্রী, অর্থাৎ খ্যাতির ক্ষেত্রে, বিপজ্জনক বিপ্লবী হিসাবে নিপীড়নের পরিবর্তে ফ্যাবিয়ান বুদ্ধিজীবী হিসাবে খ্যাতিলাভের ক্ষেত্রে এই ত্যাগস্বীকার তিনি করতে পারেন না। সমাজজীবনের পক্ষে মাংস ও বসা অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়, এবং সেই কারণেই সেগুলি থেকে নিবৃত্ত থাকা সম্ভব। বুর্জোয়া সমাজে সমাজকে যা একত্র ধরে রাখে তা হল অর্থ: এটি ছাড়া কারও আহারও চলে না; সেইজন্য তা থেকে 'নিবৃত্ত' থাকাও অসম্ভব। কিন্তু যে বুর্জোয়া নিবৃত্তির দৃষ্টিতে সমস্যাটিকে শ দেখেছেন এই ব্যাপারটিই সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা প্রমাণ করে দিচ্ছে, ঠিক যেমন যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিও গোষ্ঠীর খরচে নিজের খাই খরচ চালান, অথচ নিজে যুদ্ধে যেতে তাঁর প্রবল

আপত্তি। সামাজিক অমঙ্গলের প্রতি শ'য়ের এই দ্বিমুখী মনোভাব প্রধান অমঙ্গলটির সামনে, সমাজের মূল চাবিকাঠিটির সামনে, তাঁর কাপুরুষতাকে মেলে ধরছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অমঙ্গলগুলি থেকে তিনি নিবৃত্ত থাকছেন অথচ প্রধান অমঙ্গলটিকে তিনি মেনে নিচ্ছেন। তাঁর নিরামিষ আহারবাদ এইভাবে বৃহত্তর প্রশ্নে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার এক ধরনের ক্ষতিপূরণ হিসাবে এবং তাঁর সমগ্র সংস্কারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর একটা প্রতীক হিসাবে কাজ করে। নিবৃত্ত থাকবেন, সমালোচনা করবেন ; অথচ নিজে তিনি কাজ করবেন না। তাঁর এই শেষোক্ত অস্বীকৃতিটি তাঁর সমালোচনাকেও সংক্রামিত করেছে এবং তাঁর নিবৃত্ত থাকাকে প্রতিক্রিয়ার এক সক্রিয় অস্ত্র করে তুলেছে। আর সেইজন্যই, তাঁর সমস্ত নাটক ও মুখবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে অর্থ হয়ে উঠেছে দেবতা, যা ব্যতিরেকে আমরা কিছুই না, আমরা ক্ষমতাহীন ও অসহায়। 'অর্থ উপার্জন কর তাহলেই তুমি ধার্মিক হতে পারবে ; অর্থ ভিন্ন এমনকি সৎ হতেও তুমি পারবে না। এত ঘন ঘন এবং এত সরবে একথা তিনি বার বার বলেছেন যে মনে হয় তিনি যেন অন্যদের সঙ্গে নিজেকেও এই বিষয়ে বিশ্বাস করাতে ব্যগ্র। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন : 'একে পরিত্যাগ করলেও সেটা তোমার পরার্থবাদের (altruism) কোন কাজে লাগবে ? সেটা যদি আস্তাকুঁড়েও ছুড়ে ফেলে দাও, কোনও না কোনও বদ লোক তা কুড়িয়ে নেবে। ব্যবস্থাটা যতক্ষণ না পরিবর্তিত হচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা কর।'

কিন্তু কিভাবে ব্যবস্থাটিকে পরিবর্তিত করা যাবে ? কোনও বিশ্বাসজনক উত্তর শ'য়ের নেই। শ'য়ের বিরুদ্ধে সচেতন অসাধুতার অভিযোগ তোলার প্রয়োজন নেই। বুর্জোয়া চিন্তার বিধেয়গুলির মধ্যে শ অসহায়ভাবে বন্দী। সত্তা যেহেতু জানাকে সাপেক্ষীভূত করে, সেই কারণে বুর্জোয়া শ্রেণী তার যাবতীয় 'চালাকি' সত্ত্বেও ভেঙে পড়তে বাধ্য, এবং শ্রমিকরা তাদের সমস্ত 'নিবুদ্ধিতা' সত্ত্বেও পুরাতন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর এক নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে এক সক্রিয় সৃজনশীল ভূমিকা পালন করতে যে সক্ষম এটা শ দেখতে পাননি। শ্রমিক না বুর্জোয়া ? এদের মধ্যে কোনটিকে বেছে নিতে হবে, এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে অজ্ঞ 'যুক্তিরহিত' ও দারিদ্র্যের দ্বারা 'বর্বর হয়ে ওঠা' অপর শ্রেণীটির থেকে যাবতীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য যার পিছনে রয়েছে সেই বুর্জোয়াকেই শ'য়ের বেশি পছন্দসই বলে মনে হয়। সেই কারণেই দেখা দিল তাঁর জীবনব্যাপী সমস্যা—কি করে এই বুর্জোয়া শ্রেণীকে তার পাপকর্ম পরিত্যাগ করার কথাটা বুঝিয়ে রাজি করান যায়। এদের ধর্মান্তর গ্রহণ তাঁকে করাতেই হবে, তা না হলে হতাশায় হাত জোড় করতে হবে ; আর তা সত্ত্বেও মনে মনে তিনি এদের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করতেন না, কারণ তিনি মার্ক্স পড়েছিলেন।

নিজ শ্রেণী ও নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা সাপেক্ষীভূত (conditioned) হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত তাঁর যাবতীয় অসুবিধার জন্ম দিল। ফ্যাবিয়ানবাদের দ্বারা পুনঃসৃষ্ট এক বুর্জোয়া শ্রেণীতে নিজেকে বিশ্বাস করাতে প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনই পারেননি; আর ঘটনাস্রোতও তার আশাহীনতা ও ক্ষয়কে আরও স্পষ্টকরে তুলল। সেই কারণে তাঁর নাটকগুলি আরও বেশি বেশি করে অসার ও সিদ্ধান্তহীন হয়ে পড়তে থাকল। সভ্যতাকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল 'পাহাড়ের চূড়ায় [On the Rocks] অথবা তার উদ্দেশ্য ভণ্ডুল হয়ে গেল [Apple Cart]। ইউটোপিয়ার দিকে এক প্রাণশক্তি [Life force] অমোঘ বিধানে এগিয়ে চলেছে (Back to Methusellah) এই বিশ্বাসের মধ্যে আশ্বাস পাওয়া যায়। অথবা সেণ্ট জোয়ান নাটকে যেমন দেখা যায়, এমন এক যুগের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন যেখানে যে শ্রেণীর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে তিনি জড়িয়েছেন সেই বুর্জোয়া শ্রেণী এক সক্রিয় সৃজনশীল ভূমিকা পালন করেছিল: এক মরণোন্মুখ মধ্যযুগধর্মীতার মাঝখানে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নায়িকা ও ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে তিনি সেণ্ট জোয়ানকে এঁকেছেন। 'হার্টব্রেক হাউস' নাটকে তিনি কেবল এক চেখভীয় নিঃস্পৃহতা ও মোহভঙ্গের ছবি এঁকেছেন। স্পষ্টতঃই শ'য়ের যাবতীয় ব্যর্থতা, তাঁর সহজাত গুণগুলির যেসব শিল্পগত ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সম্ভাবনা ছিল সেগুলির পূরণ ঘটার ক্ষেত্রে যা কিছু তাঁকে বাধা দিয়েছে সে সবই দেখা দিয়েছে ইতিহাসের এমন এক অধ্যায়ে যখন বুর্জোয়া শ্রেণীকে বেছে নেওয়াটা হল ভুল। ঠিক সেই সময়েই বুর্জোয়া শ্রেণীকে বেছে নেওয়ার যে মারাত্মক ভুল শ করেছিলেন তা থেকেই অত্যন্ত সরাসরি-ভাবে এগুলি দেখা দিয়েছে। এই নির্বাচন থেকেই দেখা দিয়েছে তাঁর নাটকের অবাস্তবতা, সেগুলির নাটকীয় সমাধানের ঘাটতি, ডায়ালেকটিকের জায়গায় বিতর্ককে স্থাপন করা, প্রাণশক্তি ও চিন্তাভিত্তিক ইউটোপিয়ায় বিশ্বাস, প্রেমে পড়া মানুষকে দেখাতে গিয়ে সব ভণ্ডুল করে ফেলা, বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের অভাব এবং যা কিছু শ বলেন তাতেই রাস্তার ধারে খেলাদেখানো বাজীকরের মত একটা অদ্ভুত সুর, অন্যকে বিদ্রূপ করতে গিয়ে যে মানুষ নিজেকেও বিদ্রূপ করে, কারণ নিজেকে সে তাচ্ছিল্য করে এবং তার থেকেও বড় কথা এই যে অন্যদের তাচ্ছিল্য করে নিজেরই মত করে।

বুর্জোয়া শ্রেণীর দুর্বলতাকে উদ্ঘাটিত করে শ একটি দরকারি কাজ করেছেন। তাদের সংস্কৃতির পচাগলা অবস্থাটা মেলে ধরেছেন, আবার সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎকেও অর্পণ করেছেন তাদেরই হাতে। কিন্তু না তিনি, না তাঁর পাঠক কেউই তার সাফল্যে আস্থা রাখতে পারছেন না। আর সেই কারণে বুর্জোয়া বুদ্ধিবৃত্তি আজ যে

অবস্থায় রয়েছে, তা লজ্জায় অধোবদন প্রাপ্ত ও নিজের উপর আস্থাহীন হয়ে উঠছে, প্রতীকীভাবে তিনি তারই প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাঁর সক্রিয় ভূমিকা হল এই যে, যে জগতের দিন ফুরিয়েছে সেই জগতের ক্ষয়প্রাপ্তিকে যে পরাজিত মনোভাব ও হতাশার শক্তিগুলি সাহায্য করছে।তনিও তারই অন্যতম। বিপ্লবের যে সক্রিয় শক্তিগুলি এই পচাগলা কাঠামোটাকে চূর্ণ ক'রে, তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে পারে তা ব্যতিরেকে এই ভাঙন [disintegration] একটা ব্যধিগ্রস্তের অবস্থার বেশি কিছু নয়। ঐ অবস্থায় শ কখনই পৌঁছাতে পারেননি। তার জন্য যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন তাও তিনি লাভ করতে পারেননি। ওয়েলস, লরেন্স, প্রুস্ত, হাক্সলি, রাসেল, ফরস্টার, ভাসেরমান, হেমিংওয়ে ও গলস্‌ওয়ার্দি যেমন তাঁদের যুগের বিশিষ্ট সৃষ্টি, বুর্জোয়া সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁরা নিজেদের মোহভঙ্গের কথা ঘোষণা করেছেন, তাঁদের নিজেদের মোহভঙ্গ ঘটেছে অথচ তার থেকে বেশি ভালো কিছু আশা করতে তাঁরা অক্ষম, অথবা এই বুর্জোয়া সংস্কৃতি, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য যার সন্ধান মানুষকে বদ্ধ জলাভূমিতে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে, সেই বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে আয়ত্ত করতে তাঁরা পারেননি। শ'য়েরও স্থান এদেরই পাশে এঁরা সর্বদা যেটা রক্ষা করতে চেয়েছেন তা হল এঁদের স্বাধীনতা। ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে ওঠার বদলে এতে তাঁরা বরং করুণ চরিত্রই হয়ে উঠেছেন, কারণ তাঁরা অসহায়। প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্যই যে তাঁরা অসহায় তা নয়; তাঁদের নিজেদের বিভ্রমের কারণেই তাঁরা অসহায়।

দুই

টি. ই. লরেন্স

বীরত্ব সম্পর্কে একটি আলোচনা

(প্রথম) মহাযুদ্ধের চার বছর ধরে দুনিয়ার সমস্ত প্রধান প্রধান শক্তিগুলি তাদের যাবতীয় বস্তুগত, বিজ্ঞানসংক্রান্ত ও আবেগগত সম্পদকে হিংসাত্মক কাজে পরিচালিত করলেও এই অভূতপূর্ব সংগ্রাম কোনও বুর্জোয়া কর্মবীর তৈরি করেনি। এই মহাযুদ্ধে কোনও বীর ছিল না। অপরদিকে রুশ বিপ্লব ছিল সুরু থেকেই লেনিনের দ্বারা পরিচালিত। কেবল সোভিয়েত রাশিয়াতেই নয়, গোটা বুর্জোয়া দুনিয়াতেও লেনিনের তাৎপর্য সেইদিন থেকে ক্রমে বেড়েই চলেছে। যেখানেই কোনও সামাজিক আলোড়ন দেখা দিয়েছে, সেখানেই দেখা যায় যে লেনিনের কর্ম ও বাণী তার একটা অংশ হয়েছে, আর দিনে দিনে এই ঘটনাই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে যে কব্জার ওপর যেমন দরজার পাল্লা ঘোরে, বিংশ শতকের ইতিহাস সেই রকম লেনিনকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে। কালের গতিতে হিণ্ডেনবার্গ, লুডেনডর্ফ, জোফ্‌র, জেলিকো, ফ্রেঞ্চ, হেগ, ফক, লয়েড জর্জ, উইলসন ও গ্রে প্রভৃতি ব্যক্তিরা যতই পিছনে সরে যাচ্ছেন ততই তাঁরা আরও বেশি বেশি হাস্যাস্পদ ও নগণ্য হয়ে পড়ছেন। লক্ষ লক্ষ মৃত্যু, পর্বতপ্রমাণ বন্দুক ট্যাঙ্ক বা জাহাজও বিংশ শতকে বুর্জোয়া বীর গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সব থেকে ভালো জিনিস যা ওরা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে তা হল এক হলেও-হতে পারত বীর, টি· ই. লরেন্সের করুণ মূর্তি।

তা সত্ত্বেও কোনও সংস্কৃতি যদি বীরের জন্ম দিয়ে থাকে সেটা বুর্জোয়া সংস্কৃতিই ত' হওয়া উচিত? কারণ, বীর হলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি, আর বুর্জোয়াতন্ত্র হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মতবিশ্বাস (creed)। এক অতিকায় বীরগোষ্ঠীই বুর্জোয়া দুনিয়ার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। ইতিহাসের ভিড়ের মধ্য থেকে এলিজাবেথীয় দুঃসাহসিকদের ও আমেরিকায় রাজ্যস্থাপয়িতাদের মূর্তি (conquistadors) বড় হয়ে জেগে ওঠে। বুর্জোয়া অগ্রগতি আমাদের দিয়েছে ক্রমওয়েল, মার্লবরো, লুথার, রাণী এলিজাবেথ, ওয়েলিংটন, পিট, নেপোলিয়ন, গুস্তাভাস আদলফাস, জর্জ ওয়াশিংটন। বাস্তবিকই বুর্জোয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে বুর্জোয়া ইতিহাস হল প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বীরদের সংগ্রাম মাত্র।

বীরত্ব কি দিয়ে গড়া? ব্যক্তিত্ব? না; বৈচিত্র্যহীন ও সরলতম ব্যক্তিত্ব-

সম্পন্ন মানুষও বীর হয়ে উঠেছে। তবে কি সাহস? ঝুঁকি নিতে এবং সম্ভবতঃ প্রাণ দেওয়ার থেকে বেশি কিছু ত মানুষ পারে না। আর মহাযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ তা করেছে। তবে কি সাফল্য?—যা হল কোনও একটা উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্ত ঘটনার সদ্ব্যবহার, যাকে রূপ দেওয়াটা হল চমৎকার উজ্জ্বল একটা কিছু, ভাগ্যদেবীকে প্রলুব্ধ করে তাকে একজন মানুষের অধীন হতে বাধ্য করার মত একটা কিছু—যাবতীয় বীরের টাইপ জুলিয়াস সিজারের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়? এ কথাটা সত্যের অনেক কাছাকাছি। কিন্তু যে বীররা সাফল্যলাভ করেননি তাঁদের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা খাটে না। এইভাবে বীর লিওনিদাস উন্নততর রণনীতির কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। লুডেনডর্ফ বা রকফেলারের মত যাদের সম্পদ, সাফল্য ও চাকচিক্য ছিল, কিন্তু যাদের আদৌ তা ছিল না তাদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাখ্যা খাটে না।

প্রকৃত সত্যটা মনে হয় এই যে, বীরত্ব এমন একটা জিনিস নয় যার সংজ্ঞা সেই বীরের চরিত্রের গুণ থেকেই মাত্র দেওয়া যায়। বীর সম্পর্কে তলস্তয়ের ধারণার কথা আমরা পেশ করছি না। তিনি বীরকে দেখেছিলেন ভাগ্যের স্রোতে বাহিত ছোট মাপের এক মানুষ হিসাবে। ব্যক্তির নিজের মধ্যে অবশ্যই কিছু থাকা চাই। কিন্তু ঘটনাবলীর মধ্যেও কিছু থাকা চাই। বীর যেন একজন মানুষ যিনি পরিস্থিতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং আপন ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে রূপ দিয়ে থাকেন। এই রকম এক মানুষ হিসাবে বীরকে দেখাটা, সমুদ্রের ঢেউ এসে যেন কোনও মানুষকে সাফল্যের চূড়ায় তুলে নিয়ে গেল এই হিসাবে তাকে দেখার মতই অসত্য। অথবা বলা যায়, বরং দুটিই হল একই সত্যের, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার, আংশিক দিক।

মানুষের ইচ্ছা ততটাই স্বাধীন যতটা তা সচেতনভাবে আত্ম নির্ধারিত। কোনও মুহূর্তে কোনও ব্যক্তির ইচ্ছা তার পরিবেশের এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী মুহূর্তে সেই ব্যক্তির মানসিক অবস্থার কার্যকারণগত প্রভাবগুলির দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে সব শারীরবৃত্তগত উপাদান সচেতন ও অচেতন-উদ্দীপন-ছকের [innervation pattern] মধ্যে যুক্ত হয় তার সবগুলিই ঐ ব্যক্তির মানসিক অবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকে। মানুষ তার বংশগতি [heredity] দ্বারা নির্ধারিত কয়েকটি সহজাত প্রতিক্রিয়া [innate responses] সঙ্গে নিয়ে অতীত দ্বারা নির্ধারিত এক পরিবেশের মধ্যে জন্ম নেয়; জীবনযাপন কালে সহজাত প্রতিক্রিয়া ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া থেকে তার চেতনা রূপ পায়। এই চেতনা সেই কারণে পরিবেশ ও সহজপ্রবৃত্তির একটা পারস্পরিক চাপের ফল যাতে করে মনের ক্রমাগত বিকাশ ঘটতে থাকে। সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গেই সমপরিমাণ ও বিপরীত এক

প্রতিক্রিয়া জড়িত। সেই কারণে যে সব আদানপ্রদান ব্যক্তিকে পরিবর্তিত করে তার প্রত্যেকটিই যখন ঘটতে থাকে তখন সেই ব্যক্তিও পরিবেশকে পরিবর্তিত করে। তার পরিবেশের মধ্যে অবশ্য অন্যান্য মানুষরাও অন্তর্ভুক্ত।

বীর হলেন সেই মানুষ যাঁর জীবন এমন যে তাঁর সহজপ্রবৃত্তিগত উপাদান যা তাই হওয়ার কারণে এবং তাঁর পরিবেশ যা তাই হওয়ার কারণে, তাঁর নিজের উপর তাঁর পরিবেশের যে কার্যকারিতা তার থেকে তাঁর পরিবেশের উপর তাঁর যা কার্যকারিতা সেটা অনেক বেশি। অতএব একথা আমরা বলতে পারি যে বীর এমন এক মানুষ যিনি নিজের পরিবেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেন এবং তাকে রূপ দেন [moulds]।

কিন্তু, যেমন মুরগির অঙ্গসন্ধিগুলি কোথায় অবাস্থিত তা জানা থাকলে এবং সেই অনুসারে ছুরি চালালে তবেই কোনও লোক মুরগিটাকে ঠিক মত কাটতে পারে, সেইরকম বীরও ঘটনাব উপর এই কারণেই মাত্র প্রাধ্যান্য বিস্তার করেন যে, যে নিয়মের জন্য সেই ঘটনাগুলির সৃষ্টি হয় সেটিকে তিনি যতদূর সম্ভব মেনে চলেন। অতএব দক্ষতার সঙ্গে মুরগিকে যে মানুষ কাটতে পারেন তার সঙ্গে বীর সম্পর্কে তলস্তয়পন্থী ধারণার ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য। তলস্তয়ের ধারণা অনুযায়ী বীর হলেন এমন এক মানুষ যিনি প্রকৃতপক্ষে পবিস্থিতিব দাস। মুবগিকে সুষ্ঠুভাবে কাটবার একটিই মাত্র পথ আছে। আব সেইজন্য যে মানুষ মুবগিটিকে সুষ্ঠুভাবে কাটাব দ্বাবা তার উপর সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য বিস্তাব করেন, মুবগিটিও তাব উপর সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য বিস্তার করে এই দিক থেকে যে তাঁকেও মুরগির অঙ্গসংস্থানকে ক্রীতদাসের মত মেনে চলতে হয়। কিন্তু যাই হোক না কেন শেষ পযন্ত মুরগিটি কাটা হওয়ার মধ্যে ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটে। এমন কি এতেও পরিস্থিতিটাকে খুবই সরল বলে দেখায়। কারণ মানুষ কেন মুরগি কাটতে চায়, কেন বীর চান দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিতে, মানুষের জীবনের ডায়ালেকটিকের মধ্যেও তার একটা হেতু আছে।

বীরত্বের অন্য এক বৈশিষ্ট্যের কথায় এখানে আমরা এসে পড়লাম। সেটা এই যে, এমন কি বীর যখন জগৎকে পরিবর্তিত করছেন তখনও কিন্তু তিনি যে কি করছেন সেই সম্বন্ধে ঐ বার অবহিত নয বলেই মনে হয়। সীজার কখনও সচেতনভাবে সাম্রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করেন নি, বা আলেকজান্ডাব হেলেনীয় সংস্কৃতির জন্ম দেওয়ার ইচ্ছা করেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কিছু একটা সঙ্কল্প করেছিলেন, এবং যে পরিবর্তন তাঁরা ঘটিযেছিলেন তাঁদের যাবতায় কর্মের গতিমুখ সেই পরিণতির দিকেই ছিল বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।

বীর যেন এক ধরনের অন্ধ স্বজ্ঞা [intuition] থেকে কাজ করেন বলে মনে

হয়। আর সেইজন্তই এটা বিশেষ বিস্ময়ের ব্যাপার যে বস্তু ও মানুষ উভয়কেই বীর সমানভাবে আয়ত্ত করে থাকেন। বেশির ভাগ বড় বড় মানুষেরই তা সামর্থ্যের বাইরে। এই ব্যাপারে বীর একদিকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যান ভবিষ্যদ্বক্তা বা ধর্ম গুরুর মধ্যে, যিনি মানুষের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না; আবার অন্যদিকে ক্রমেই মিলিয়ে যান বিজ্ঞানীর মধ্যে, বিজ্ঞানী হলেন সেই মানুষ যিনি মানুষ যদি ইচ্ছা করে তাহলে কিভাবে ঘটনাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু কোন্ জিনিসটি যে ইচ্ছা করতে হবে তা তিনি মানুষকে শেখাতে পারেন না। ভূগোল, যুদ্ধ, রাজনীতি বা নগর এসব জিনিস বীর বুঝতে পারেন এবং নতুন নতুন করণকৌশল তাঁর কাছে উপকরণধর্মী (instrumental), কিন্তু মানুষও তাঁর কাছে উপকরণধর্মী। আর এই সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গে আবার এটা যে কেন এইরকমই তা কিন্তু তিনি বোঝেন না। ভবিষ্যতে কি দেখা দেবে তার কার্যকারণগত ব্যাখ্যা তিনি তাঁর বর্তমান কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দিতে পারেন না; কিন্তু দেখে মনে হয় যে কি করতে হবে সেটা তিনি মনে মনে জানেন। মানুষ ও ঘটনার সঙ্গে তাঁর যে সব সম্পর্ক, তার উপর সীজারের দৈবী পৃষ্ঠপোষক ও পূর্বপুরুষ ভিনাসের মত এক দেবী যেন লক্ষ্য রাখছেন বলে মনে হয়।

এইসব চমৎকার গুণের (gifts) উৎস কোথায়? এর অর্থই বা কি? প্রায়ই দেখা যায় যে, যে কাজটা করার ইচ্ছা বীরের নেই সেই কাজটাই তিনি প্রকৃতপক্ষে করছেন। সীজারের মত মনে মনে তিনি নিছক একজন দুঃসাহসিক ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বীরত্বের এই প্রবণতা এটাই সুনিশ্চিত করে যে নিজের কৃতিত্বপূর্ণ জীবন গড়ে তোলার দ্বারা তিনি একটা সভ্যতার সৃষ্টি করছেন এবং প্রায় দিব্য এক দ্যুতিতে নিজের নামকে ভাস্বর করে তুলছেন, অথচ নিষ্ঠাবান পরার্থবাদীদের লোকে ভুলে যায়, কিম্বা মনে রাখলেও ধর্মীয় নিপীড়কদের (Inquisitors) যেমন ঘৃণার সঙ্গে লোকে মনে রাখে সেইভাবে তাদের মনে রাখে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই বীরত্ব গুণটি বীরদের উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ, অথচ সেটা একটা মূল্য (value) এবং কোনও একটা কিছুর সঙ্গে তা সুসংশ্লিষ্ট।

এঁদের কাজের সামাজিক তাৎপর্যের সঙ্গে এটি সুসংশ্লিষ্ট (adheres to)। সামাজিক সম্পর্কের চলন (movement) থেকে তাঁদের আকাজ্ক্ষাগুলির উদ্ভব; আর যে শক্তিকে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, যে যাদুশক্তির বলে আকাশের গ্রহ নক্ষত্ররাও তাদের যাত্রাপথে এঁদের হয়েই লড়াই করছে বলে মনে হয় তা হল এই চলন।

যাবতীয় সঙ্কট, যাবতীয় যুদ্ধ, রাষ্ট্রের যাবতীয় দুর্বিপাক বা জয়লাভ সমাজ-

ব্যবস্থার যাবতীয় পরিবর্তন, যেখানেই যাঁর নিজেকে সুপ্রকাশিত করেন সেখানেই সেগুলি সামাজিক চেতনার বাইরের শক্ত আবরণটি ফেটে যাওয়াকে এবং পরিবর্তিত সামাজিক সত্তার অভ্যন্তরীণ চাপের নীচে তার যত সংগঠিত সূত্রায়ন ছিল সেগুলির ফেটে যাওয়াকে সূচিত করে। সামাজিক সত্তাকে কখনই যদি পরিবর্তিত হতে না হত, তাহলে সামাজিক চেতনা, যা মূলে অবস্থিত সামাজিক বাস্তবকে গতিহীন প্রতীকের পরিভাষায় (শব্দ, চিন্তা, প্রত্যয়, প্রতিরূপ, গির্জা, আইন) ঘনত্ব দান করে (bodies forth), তা সর্বদাই হত পর্যাপ্ত এবং সমাজ জাইরোস্কোপের মত সপ্রতিষ্ঠ ও স্থির (stable and stationary) থেকে আবর্তিত হত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব কখনই একইভাবে থাকে না। কারণ, তা একইভাবে থাকে বলার অর্থ হল কালের সমাপ্তি ঘটেছে। কাল এক বিশেষ অন্তর্ভুক্তকারী (inclusive) চরিত্রের ঘটনাবলীর মধ্যকার বিষমধর্মিতা (unlikeness) ছাড়া কিছুই নয়, যেমন ক খ এর দ্বারা অন্তর্ভুক্ত, খ গ-এর দ্বারা অন্তর্ভুক্ত, ইত্যাদি। বাস্তবের মধ্যে 'হয়ে ওঠা' অন্তর্নিষ্ঠ (intrinsic)। সেই কারণে তা সর্বদাই খোলস ছাড়ছে ; ক্রমান্বয়ে নয়, বরং সাপের মত, ঋতুতে ঋতুতে। যতক্ষণ না একটা সংকটের মধ্যে গোটা খোলসটাই পরিত্যক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত চাপটি বাড়তেই থাকে। সমাজের উপরিকাঠামোটি নতুন করে গড়ে ওঠে।

কর্ম ও চিন্তার একটা আলোড়ন এই রকম সময়ে দেখা দেয়। কিন্তু চিন্তার পূর্বে যেহেতু কর্ম থাকতেই হবে, সঠিক চিন্তা রূপলাভ করার পূর্বে সেই কারণে সঠিক কর্মটি অবশ্যই করতে হবে। সামাজিক চেতনা সামাজিক সত্তার দর্পণ-প্রতিরূপ নয়। তা যদি হ'ত তাহলে তার কোনও উপযোগিতা (use) থাকত না, সেটা হত এক নিছক অলীককল্পনা। এটা বস্তুগত, এর ভর আছে, এর জাড্য আছে, বাস্তব সামগ্রী দিয়ে এটা গঠিত—বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন ভাষার অভ্যাস, বিভিন্ন মতাবলম্বী গির্জা, বিচার-ব্যবস্থা ও পুলিস বিভাগ ইত্যাদি দিয়ে গঠিত। সামাজিক চেতনা যদি দর্পণ-প্রতিরূপই হ'ত তাহলে যে বস্তুকে দর্পণটি প্রতিফলিত করত সেই বস্তুটি পরিবর্তিত হলে শক্তির কোনও রকম ব্যয় না হয়েও সামাজিক চেতনাটিও একটা প্রতিরূপের মত পরিবর্তিত হতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা আরও বেশি কিছু। সেটা হল একটা ক্রিয়ামূলক (functional) উপরিকাঠামো যা ভিত্তির সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া করে এবং প্রত্যেকটিই অপরটির পরিবর্তন ঘটায়। দুটির মধ্যে একটা গতায়াত ঘটে। সুতরাং প্রাণহীন বস্তু থেকে উদ্ভূত হয়ে জীবন তারই দিকে ফিরে তাকায় এবং তাকে পরিবর্তিত করে। ভাষার সরলতম ব্যবহারের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সুপ্রকাশ। শব্দ হল সামাজিক. তা বিদ্যমান সচেতন সূত্রায়নগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু কিছু বলার

ইচ্ছা যখন দেখা যায়, আমরা তখন নতুন কিছু বলতে চাই, যা আমাদের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে, আমাদের সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়। আর সেইজন্য শব্দকে (Word) আমরা রূপকের সাহায্যে অথবা কোনও বাক্যের মধ্য দিয়ে এমন ভাবে ব্যবহার করি যাতে আমাদের নিজস্ব নতুন অভিজ্ঞতার কাছাকাছি একটা ঈষৎ নতুন তাৎপর্য তার থাকে। বিরাট মাত্রায় এই প্রক্রিয়াটি বিপ্লব সৃষ্টি করে, বাস্তবের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সামাজিক সূত্রায়নগুলিতে—সরকার, প্রতিষ্ঠান ও আইনগুলিতে—অসন্তুষ্ট হয়ে মানুষ যখন তার নতুন অথচ তখনও পর্যন্ত অসূত্রায়িত অভিজ্ঞতার কাছাকাছি ক'রে সেগুলিকে নতুন করে গড়তে চায়। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি শব্দের থেকে ভিন্ন এবং যেহেতু তাদের জাড্য থাকে, যেহেতু নতুন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষরা একটি শ্রেণীকে সূচিত করে এবং সেই নতুন অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে পুরাতন সূত্রায়নগুলিকে যারা আঁকড়িয়ে থাকে তারা অন্য এক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে, সেই জন্য প্রক্রিয়াটা হয় সহিংস ও প্রবল শক্তিসম্পন্ন।

সমাজের মত মানুষ নিজেও প্রচলিত সক্রিয় সত্তা ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সচেতন সূত্রায়নগুলি দিয়ে গঠিত। সে দেহকোষবিশিষ্ট (somatic) ও মানসসম্পন্ন, সহজপ্রবৃত্তিধর্মী ও সচেতন, এবং এই বিপরীতগুলি পরস্পরকে ভেদ করে। যে সংস্কৃতির মধ্যে তার জন্ম সেই আকৃতি লাভ করে সে অর্ধেকটা অনমনীয় হিসাবে গঠিত হয়, এবং তার সহজপ্রবৃত্তিধর্মী শিকড়গুলির মধ্য দিয়ে বাস্তবের রস আহরণ করে অর্ধেকটা নমনীয় ও নতুন ও বিদ্রোহী হয়ে গঠিত হয়। এইভাবে সত্তা ও চিন্তনের মধ্যকার; নতুন সত্তা ও পুরাতন চিন্তার মধ্যকার এই চাপকে, যে চাপ সংশ্লেষণের সাহায্যে নতুন চিন্তার উদ্ভব ঘটাবে সেই চাপকে একেবারে নিজের হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করে। ঘটনাপ্রবাহ যেন তার চেতনা থেকে তার গভীরতম সহজ প্রবৃত্তিধর্মী অংশটিকে এবং সর্বাধিক মূল্যবান অংশটিকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বলে সে অনুভব করে। অসম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ তাকে টানছে! কিন্তু মানসের সহজ-প্রবৃত্তিধর্মী উপাদানগুলি যেহেতু প্রাচীনতম সেই জন্য এটিকে প্রায়ই সে অতীতের আকর্ষণ বলে অনুভব করে। এই কারণেই আমরা প্রায়ই এই আপাতঃ অসম্ভবের মুখোমুখি হই যে বীর অতীতের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন এবং অতীতকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য মানুষকে তাগিদ দিচ্ছেন এবং সেই কাজ করার দ্বারা ভবিষ্যৎকে তিনি গড়ে তুলছেন! ক্লাসিক সাহিত্যে প্রত্যাবর্তন বুর্জোয়া নবজাগরণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল! নেপোলিয়ন ও ফরাসী বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছিল রোম। অষ্টাদশ শতকের বিপ্লবীদের আদর্শ ছিল স্বাভাবিক নিষ্কলুষ মানুষে প্রত্যাবর্তন। অথচ এই রকম সব যুগে মানুষ মনে প্রাণে যার চাপ অনুভব করে সেটি হল এই

নতুনেরই। অন্তর্নিহিত ও অ-রূপপ্রাপ্ত (informous) নতুন মানুষের চেতনার দ্বারে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তা দৃশ্যমান নয়। তখনও তা কেবল একটা শক্তি মাত্র, একটা চাপ মাত্র যা যে জিনিসগুলি ঐ চাপের জন্ম দেয় সেগুলি থেকে এক নতুন ও সংশ্লেষিত বাস্তব গড়ে তোলার পক্ষে পর্যাপ্ত। কিন্তু এই পর্যায়ে একটা বল, একটা দেহহীন ক্ষমতায় থেকে এটা বেশি সুস্পষ্ট নয়। এই সংকেত, কর্মের প্রবল আহ্বান জানানো এই সংকেত যখন বীরের কানে যায় তখন ভবিষ্যতের অজানা গুণধর্ম দিয়ে তিনি তাকে সজ্জিত করতে পারেন না বলেই খুব সম্ভবতঃ অস্পষ্ট অতীত থেকে নেওয়া একটা সূত্রায়ন তাতে তিনি আরোপ করবেন না বলেই এই সংকেত যখন আবির্ভূত হয় তখন তা সমাজের এবং তাঁর মনের প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসগুলি থেকে আবির্ভূত হয় না। এই দুটিই গভীরের একটা চাপ থেকে দেখা দেয় এবং এই কর্মের আহ্বান মানুষের আত্মার গভীর থেকে আসছে বলে তাঁর মনে হয়। সেই কারণে বীর এটাকে হয় একটা ব্যক্তিগত দিক থেকে সর্বগ্রাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা হিসাবে (প্রকৃতই, এক অর্থে সেটা তাই) অথবা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটা আহ্বান হিসাবে (আর এক অর্থে এটা তাই ; কারণ, ঈশ্বর সর্বদাই অচেতন সামাজিক সম্পর্কের একটা প্রতীক হিসাবে আবির্ভূত হন) ব্যাখ্যা করেন। অতীন্দ্রিয়বাদী এবং শিল্পী দুজনেই একই বলকে অনুভব করেন। কিন্তু বীর যেভাবে এই বলকে অনুভব করেন এঁরা সেভাবে করেন না। বীরের কাছে সেটি হল ওই অজানা জিনিসটিকে সক্রিয়ভাবে এই জগতে নিয়ে আসার আহ্বান ; এবং তার জন্যে যে সব বস্তুগত রূপধারী সামগ্রী (material embodiments) তাকে বাধা দেয় সেগুলিকে চূর্ণ করতে হয়, অথবা সেই অজানাকে গ্রহণ করার জন্য নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করতে হয়। বীর হয়ত মনে করতে পারেন যে অতীতকে রক্ষা করার জন্য বা জগতে সেটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তাঁর জন্ম হয়েছে এবং সেই কাজ যখন সম্পন্ন হয় তখনই মাত্র বোঝা যায় যে ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণ করেছে। ধর্মসংস্কারক আদিম খৃষ্টধর্মের দিকে 'প্রত্যাবর্তন করে' বুর্জোয়া প্রোটেস্ট্যান্টবাদের জন্ম দেন ; সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ধ্বংস করে দুঃসাহসী বীর নিজেকে উন্নীত করে 'রোমান ইম্পেরিয়েট' সৃষ্টি করেন।

বীর মুখ্যতঃ কর্মের ব্যাপারে আগ্রহী। সেইজন্য তিনি যুক্তি প্রয়োগ করেন স্থূলভাবে ; কারণ, যুক্তি নয়, কর্মই হল তাঁর কর্তব্য। তাঁর আদর্শগুলি স্থূল ; তাঁর লক্ষ্যগুলি হয়ত ব্যক্তিগত, স্বার্থযুক্ত ও হীন। কিন্তু সেই ব্যাপারগুলিতে আমরা আগ্রহী নই ! তাঁর কাজগুলি লক্ষ্য করুন। যে বল তাঁকে পরিচালিত করছে এইগুলি তাকেই প্রকাশ করে এবং এইগুলির সাহায্যেই তিনি জয় করেন।

এইভাবে যাবতীয় অযৌক্তিকতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর যুগের অধিকতর বুদ্ধিজীবী ও আলোকপ্রাপ্ত মানুষদের পরাস্ত করেন। তাঁরা হয়ত জ্ঞানী ও দূরদ্রষ্টা মানুষ কিন্তু তাঁরা বলেন কেবল বর্তমানেরই ভাষা এবং অতীত সম্বন্ধে তাঁদের সচেতন সূত্রায়নের মধ্যেই তাঁরা বাঁধা পড়ে গিয়েছেন। বীর কোনও পরিচিত ভাষায় কথা বলেন না। তাঁর ভাষা কেবল বাল্যস্মৃতি ও অর্ধপক্ক ধারণার এক উদ্ভট সংমিশ্রণ। কিন্তু তাঁর পণ্ডিতকুলভুক্ত (academic) প্রতিপক্ষরা যে দর্শনের কথা ঘোষণা করেন তার থেকে অনেক বেশি জ্ঞানগর্ভ এক দর্শন তিনি কর্মে প্রয়োগ করেন (acts)। সীজারের কাছে সিসেরোর পরাজয় ঘটে, কারণ সীজার বলেন আগামী দিনের ভাষা; আর আলেকজান্দার, যাঁর জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তি ও ভব্যতা সরকারী স্কুলের অপরিণত ছাত্রের থেকে বেশি নয়, তিনি কিন্তু হেলেনীয় সাম্রাজ্যের দিকে এগিয়ে যান, আর এদিকে ১৫৮টি অপ্রচলিত নগররাষ্ট্রের সংবিধান সম্পর্কে অনুসন্ধানের কাজে আরিস্ততল তাঁর ছাত্রদের সময় নষ্ট করে চলেছেন। বীরের ভাষা যদিও মিশ্র ও স্ববিরোধী, তিনি কি বিষয়ে বলছেন সে সম্বন্ধে কিন্তু তাঁর শ্রোতাদের কোনও সন্দেহ থাকে না। বাস্তবের গভীর থেকে কর্মের সেই আহ্বান তাঁরাও শুনেছেন এবং সেই ক্রমবর্ধমান চাপ নিজেদের হৃদয়ে তাঁরাও অনুভব করেছেন। সেই কারণেই সচেতনতাকে ত্যাগ করতে তাঁরাও প্রস্তুত। কারণ সেই সচেতনতা হল অপ্রচলিত অতীত অভিজ্ঞতার সচেতনতা। যুক্তি—যে সব আশ্রয়বাক্য কবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে তারই উপর সঠিকভাবে ভিত্তি করে গড়ে তোলা যাবতীয় যুক্তি—এই কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করতে অক্ষম।

চেতনা ও যুক্তির দিক থেকে হৃদয় ও সহজপ্রবৃত্তির কণ্ঠস্বরের দিকে তাঁরা যে মুখ ফেরাচ্ছেন একথা তাঁরা বিশ্বাস করেন। স্বর্ণময় অতীতের অনুকূলে হতভাগ্য বর্তমানকে তাঁরা পরিত্যাগ করছেন একথা তাঁরা বিশ্বাস করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসে যা সর্বদাই দেখা যায়, বর্তমান চেতনাকে তারা পরিত্যাগ করেছেন কেবলমাত্র এক ব্যাপকতর চেতনায় তাকে সংশ্লেষিত করার জন্যই; স্বর্ণময় অতীতের দিকে তাঁরা মুখ ফেরাচ্ছেন না, তাঁরা মুখ ফেরাচ্ছেন স্বর্ণময় ভবিষ্যতের দিকে। বীর ও তাঁর অনুসরণকারীরা, নেতা ও বিপ্লবীরা প্রায় একই স্বজ্ঞামূলক ভাষায় কথা বলেন; কারণ সেই একই উৎস থেকে ওই ভাষা তাঁরা শিখেছেন। বীর হয়ত প্রচুর কথা বলতে পারেন, আবার নির্বাকও হতে পারেন; হাস্যকর ও স্ববিরোধী হতে পারেন; তাসত্ত্বেও তিনি কি বলছেন তা তাঁর শ্রোতারা বোঝেন এবং তাঁরা জানেন যে সেটা কথা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, একমাত্র কর্মের মধ্য দিয়েই তা প্রকাশ করা যায়। মানুষের উপর বীরের যে প্রভুত্ববিস্তারী শক্তি তার জন্ম এখান

থেকেই। তাই ক্ষমতাকে অচেতন বলে মনে হয়। যেহেতু কর্মের মধ্য দিয়ে নতুন বাস্তবের চেতনার দিকে পৌঁছানোর পথে এই ক্ষমতার সৃষ্টি হয় সেই কারণেই সেটা যখন সচেতন সূত্রায়নের এলাকায় সব থেকে কম পরিমাণে বর্তমান তখনই সেটাকে সব থেকে বেশি সত্য বলে মনে হয়। বীর যখন কোনও কিছুকে ভাগ্য বা অনুপ্রেরণা বা দৈব নির্দেশ বলে অভিহিত করেন এবং অন্ধের মত সেটাকেই অনুসরণ করেন তখনই তাঁকে সব থেকে বেশি সফল বলে মনে হয়। ফরাসী রাজদূত বেলিয়েভরকে টিপিক্যাল বীর ক্রমওয়েল তাঁর গূঢ়ার্থসূচক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে এইটাই ব্যাখ্যা করেছিলেন : 'যে লোক জানে না কোথায় সে চলেছে, তার মত উন্নতির শিখরে আর কেউ উঠতে পারে না।' আলেকজাণ্ডার থেকে নেপোলিয়ন পর্যন্ত প্রতিটি বীরই এই কথাটিকে তাঁর নিজের আদর্শবাক্য (motto) হিসাবে নিতে পারতেন।

তা সত্ত্বেও সমকালীন চেতনার গণ্ডীর বাইরে এই ক্ষমতার উৎসটিরই নানা বিপদের দিক আছে। কারণ, যেহেতু এই শক্তি তার লক্ষ্য যে কি তা সচেতনভাবে জানে না সেইজন্য অর্থহীন বিস্ফোরণে সেটির অপব্যয় ঘটতে পারে। সব মানুষই যেহেতু ঐরকম সময় সমাজে যে চাপ নির্গমপথের জন্য তাগিদ দিচ্ছে সেটা একই অস্পষ্ট ও অসূত্রায়িতভাবে অনুভব করেন, সেইকারণে পরিবর্তনের জন্য যে কোনও ভণ্ড নেতাই যখন এক রহস্যময় ভাষায় কথা বলেন তখন তাঁরা তার শিকার হয়ে পড়তে পারেন। যে বল পর্বত টলাতে পারে তাকে ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ভণ্ড নেতাটিও তাঁদেরই মত অন্ধ। কারণ বীর আর ভণ্ড নেতার মধ্যে এটাই হল পার্থক্য। মানুষের উপর ভণ্ড নেতার ক্ষমতা থাকে, কিন্তু বস্তুর উপর তার ক্ষমতা থাকে না। আগে যে মুরগির অস্থিসন্ধির কথা বলা হয়েছে সেইরকমভাবে পরিস্থিতির অস্থিসন্ধিগুলি তার জানা থাকে না। মানুষকে সে পিছন দিকে, পরিত্যক্ত পথ ও বিস্মৃত বিধর্মিতার (heresies) দিকেই চালিত করে।

কারণ এইরকম এক কালে, বল জন্ম নিতে থাকে, সেই কারণে, গতি থাকবেই। গোটা ব্যাপারটা ভেঙে পড়ছে ; মানুষকে হয় পিছনের দিকে, না হয় সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই হবে। সমাধানের অতীত প্রাপ্তবয়স্কদের সমস্যার মুখে দাঁড়িয়ে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সমাধানের জন্য যেমন শৈশবের দিকে ফিরে যায়, সেইরকম আমরা যে কালের ছবি এঁকেছি সেই ধরনের এক চাপক্লিষ্ট কালে সভ্যতা কোনও পূর্ববর্তী সমাধানের দিকে, কোনও একদা ফলপ্রসূ স্বৈরতন্ত্র (autocracy) বা সামন্ততন্ত্রের স্বর্ণযুগের দিকে চলতে পারে। কিন্তু অতীত আর ফিরে

আসে না। বর্তমান যেহেতু এসে মাঝখানে দাঁড়িয়েছে সেইজন্য কোনও কিছুই আর কখনই আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনটি হতে পারে না। পুরাতন আকার গ্রহণের পক্ষে সমাজের বুননটা বড় বেশি পরিবর্তিত ও সূক্ষ্ম হয়ে গিয়েছে। নিউরোসিসের মত সামাজিক পশ্চাৎগতিও কোনও সমাধান নয়।

বীরের মত, উপর উপর তাঁর মত, ভণ্ড নেতারও আবির্ভাব হয় একই কালে। একই বল দুজনকেই সৃষ্টি করে, কিন্তু বিপরীত এক ভূমিকা তাঁরা পালন করেন। ভণ্ডনেতা হয় একটা গুল্লা, একটা কেরেনস্কি, একটা হিটলার বা একটা মুসোলিনি। হিটলার এবং মুসোলিনিও তাদের ক্ষমতা আহরণ করে সেই একই উৎস থেকে যেখান থেকে লেনিন তাঁর ক্ষমতা আহরণ করেছিলেন—সেই পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৃদ্ধির মধ্যকার চাপ থেকে। এবং বিপ্লবের চিরাচরিত পরিহাসের কারণে এই নেতারা আবিভূর্ত হন প্রথমে গঠনমূলক ও রক্ষণমূলক কাজের দূত হিসাবে, আর বীরকে মনে হয় ধ্বংসাত্মক। ভণ্ড নেতাদের ভূমিকা যে বিপরীত, বৃথা পশ্চাৎমুখী কাজে মানুষের কর্মশক্তির অপব্যয় ঘটিয়ে তারা যে সমস্ত সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে তুলেছে এবং গতির সাহায্যে পুরাতন রূপগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে বীর যে নতুনকেই ডেকে আনছেন এটা দেখতে পাওয়া যায় কেবলমাত্র পরবর্তী কালেই।

বীরদের যে কেবলমাত্র মানুষের উপর তাঁদের ক্ষমতার দ্বারাই চেনা যায় তা নয়, ভণ্ড নেতাদেরও সেই ক্ষমতা থাকে। কিন্তু ঘটনার উপর, বহির্বাস্তবের উপর, বস্তুর উপর তাঁদের ক্ষমতার দ্বারাও তাঁদের চেনা যায়। নতুন সামাজিক বাস্তব সম্বন্ধে তাঁদের প্রজ্ঞা উভয়ের মধ্যকার চাপ সম্বন্ধে জ্ঞানের থেকেও বেশি দূর বিস্তৃত এবং এই চাপকে একটা সৃষ্টিশীল বিষয়বস্তু (creative issue) দেওয়ার জন্য কোন্ পথ নিতে হবে সেটারও শিক্ষা দেয়। সম্পূর্ণ ও স্পষ্টভাবে না হলেও কর্মের জন্য সেই শিক্ষা যথেষ্ট। এইভাবে তাঁরা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেন, আর ইতিহাসের প্রয়োজন মত কর্ম করেন। ফলে ইতিহাসও যেন পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে তাঁদের হাতের পুতুল হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। আর ভণ্ডনেতারা যা কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল কাল তা কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তিনি যে সঠিক এটা দেখার আগেই বীরের মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু আমরা সঠিকভাবেই বলি যে তাঁর শিক্ষা বেঁচে থাকবে। যে জিনিসের জন্য তিনি লড়াই করেছিলেন তা তাঁর মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবে। আর ভবিষ্যৎ ছাড়া বর্তমানের পর আর কি বেঁচে থাকে? তিনি সেই ভবিষ্যৎ জগতেরই লোক, আর আমরা যারা সেই জগতে বাস করতে পাই তারা তাঁকে জানাই সহনাগরিকের অভিনন্দন, আর ঘরের কোণের বাসিন্দা যেমন

দিগ্বিজয়ী বীরের জন্য গৌরব অনুভব করে, আমরাও সেই রকম গৌরব অনুভব করি তাঁর জন্য।

প্রবণতা (aptitude) নিয়েই সম্ভবতঃ বীররা জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের গড়ে তোলে পরিস্থিতি। বীরের যাবতীয় অলৌকিক গুণে ভূষিত লরেন্সকে কর্ম আহ্বান করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে সেই আহ্বানে সাড়া দিতে অক্ষম এই বুর্জোয়ার উদাহরণের মধ্যে বীরের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ ধরনের শিক্ষামূলক কিছু একটা আছে। অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তীব্র উচ্চাভিলাষপূর্ণ এবং দুর্লভ বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষমতার অধিকারী এই লরেন্সের মধ্যে অল্প বয়স থেকেই এক অদ্ভুত অস্বস্তি দেখা যায়। বীরের এই অস্বস্তি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সুরু থেকেই তিনি যেন তাঁর অন্তরে নতুন সামাজিক সম্পর্কের চাপটা অনুভব করছেন, কিন্তু প্রথমে এটা আশ্রয়হীন একটা ক্ষুধা মাত্র থাকে। অন্যান্য বীরের ক্ষেত্রেও যেমন হয় লরেন্সের ক্ষেত্রেও সেইরকম সেই ক্ষুধাকে পরিব্যপ্ত করার (engress) জন্য গৌরবোজ্জ্বল অতীতের দরকার হয়েছিল, এবং সেটা প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁর করণকৌশলগত আগ্রহের রূপ হিসাবেই কেবল নয়, প্রাচীন জগতের মধ্যে একটা যে বিরাট ও প্রোজ্জ্বল কিছু ছিল, আধুনিক পরিবেশের ক্ষুদ্রতার মধ্যে যা নিমজ্জিত, তার প্রতি আকর্ষণ হিসাবেও সেটা ছিল। ফলে আদিম প্রাচ্যের সুবিশাল মরুভূর মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

অতীতের জন্য যে ব্যাকুলতা তাঁকে পীড়িত করছিল তা যথেষ্ট স্পষ্ট। তা ছিল পুঁজিবাদের ক্ষুদ্রতা ও ব্যবসায় ভিত্তিকতা থেকে মুক্ত প্রচুরতর সামাজিক সম্পর্কের জন্য তাগিদ। একমাত্র এই নিয়ামক প্রয়োজন [ruling need] থেকেই তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এক ধরনের জ্ঞানপিপাসু যাযাবরের মত প্রাচ্যের যাবতীয় বিভিন্ন শ্রেণী ও অবস্থার মানুষের সঙ্গে যৌবনে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। অতীতের জন্য তাঁর ব্যাকুলতাকে যে বেদুইনদের স্বাধীন ও খোলামেলা আচরণই সব থেকে বেশি মাত্রায় তৃপ্ত করেছিল তা তিনি বুঝেছিলেন। যে জগতে মূল্য কেবলমাত্র নগদ অর্থের সঙ্গে জড়িত সেই জগতের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল বিদ্রোহীর। সেই কারণে বেদুইনদের স্বাধীনতা এবং তাদের চরিত্র ও নেতৃত্বকে তারা যে মূল্য দিত তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। বুর্জোয়া বর্তমানের প্রতি তাঁর ঘৃণা এবং ভবিষ্যতের আহ্বান তাঁর কাছে প্রতীকায়িত হয়েছিল এক স্বর্ণযুগের সাহায্যে; তা হল আদিসির সেই বিরাট ও সরল স্পষ্টতার জগৎ। এই মহান জীবনের সম্পূর্ণ মৃত্যু যে ঘটেনি এটা তিনি দেখেছিলেন। আরব মরুভূতে পুঁজিবাদী শোষণের থেকে মুক্ত ধরণীর এই কোণটুকুতে, সমাজের এই ধ্রুপদী

সরলতা তখন টিঁকে রয়েছে। একথা ঠিক যে, যে ক্ষুধা লরেন্সকে নিরন্তর ভ্রমণের পথে নিয়ে এসেছিল এই মরুভূর সংস্কৃতি যে তাঁকে পুরাপুরি তৃপ্ত করতে পারবে না এটা তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাগুলি যে রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে শেষ অবধি যদি সেগুলি তাই হয় তাহলে তাঁর ক্ষুধা যে প্রকৃতই সেই অতীতের জন্য এই প্রশ্ন নিজেকে তিনি করেননি।

তিনি এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নভাবে: ওরা হল আরব, আর তিনি ইউরোপীয়। ওরা হল সরল, আর তিনি হলেন অতি-শিক্ষিত ও পরিশীলিত।

তারপর এল মহাযুদ্ধ, আর তার সঙ্গে এল এই মানুষদের স্বাধীনতা দেওয়ার সুযোগ। এই মানুষেরা তাঁর কাছে এত মূল্যবান ছিল এই কারণেই যে তিনি নিজে যা কামনা করেছেন অথচ পাননি এই সব মানুষদের মধ্যে তিনি সেটাই দেখতে পেয়েছিলেন। আর এখানেই পরিবর্তনশীল বাস্তবের উপর বীরের যে নিয়ন্ত্রণ থাকে লরেন্স তা অর্জন করতে ব্যর্থ হন। বন্ধনমুক্তি (liberty)—এই শব্দটি তাঁর কাছে এসেছিল অক্সফোর্ডে থাকতে যে সব বুর্জোয়া সচেতন সূত্রায়নগুলি তিনি আত্মস্থ করেছিলেন কেবলমাত্র সেগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে। আর তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সেই স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা যা তিনি পেয়েছিলেন বেদুইনদের তাঁবুতে তাঁবুতে এবং এই শব্দটি সেই সব বরগুণেরই এক পরিবর্ধন মাত্র বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এই বন্ধনমুক্তিগুলিও সেই একই জিনিস ছিল কি না, যদি সেগুলি ভিন্ন হয় তাহলে বুর্জোয়া স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থই বা কি—এ প্রশ্ন তিনি করেননি। তিনি তাঁদের যা দেবেন সেই উপহার হল বন্ধনমুক্তি। এইটুকুই যথেষ্ট। এই স্পষ্ট ও ধ্রুপদী লক্ষ্যের জন্যই তিনি কাজ করতে পারেন।

সুতরাং কিছুকালের জন্য মানুষ ও ঘটনাবলীর উপর তাঁর কর্তৃত্ব দেখা দিল। মানুষের উপর তিনি কর্তৃত্ব করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি এবং আরবরা দুজনরাই অর্থের কলুষমুক্ত, সরল অকপট ও সমান মর্যাদাবিশিষ্ট সামাজিক সম্পর্ককে ভালো-বাসতেন। বেদুইনদের ছিল অতীতের সারল্য, আর তাঁকে যেটা আকর্ষণ করত সেটা হল আগামী দিনের অকপটতা। কিন্তু এটা তিনি জানতেন না, আর আরবের সেই মরুভূর মধ্যে সেটা জানাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি নিজেও নম্রভাবে নিজের আদর্শকে তাদের আদর্শের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সারল্য ভবিষ্যৎ থেকে কিছু আহরণ করেনি। বরং তা রক্তপিপাসু, বর্বর, খৃষ্টে বিশ্বাসহীন এবং যাদের নুন খেয়েছে একমাত্র তাদের প্রতি করুণাপূর্ণ এক আরব পোষাকের মধ্যে জোর করে ভরে নেওয়া হয়েছিল। অসভ্য ও অজ্ঞ, মানবজাতির অবশিষ্ট অংশের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ অল্প কিছু মানুষ মাত্র যা ভোগ করে এমন এক

বন্ধনমুক্তির মধ্যে তিনি সেটাকে আবদ্ধ করেছিলেন। তার মধ্যে মঙ্গল নেই এমন কোনও জিনিস এটা ছিল না। কারণ, এটা ছিল অবাধ ও মানবিক। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতার কারণে প্লেটো ও জেনোফেন পাঠে লালিত এক বুর্জোয়া বীরের পক্ষে এটা ছিল অনুপযুক্ত। বুর্জোয়াতন্ত্রের শূন্যতাকে এবং নতুন জগতের আহ্বান হৃদয়ে অনুভব করেছেন এমন এক বীরের পক্ষে এটা আরও বেশি অনুপযুক্ত। ন্যায়পরায়ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সাহসী হতে এবং জাঁকজমক, অনুষ্ঠান ও সম্পদকে ঘৃণা করতে তিনি চেয়েছিলেন এবং মানুষের যে সারবস্তু কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে বাস্তবায়িত করে একমাত্র সেটিকেই তিনি ভালোবাসতে চেয়েছিলেন। বুর্জোয়া জগৎ এইসব মূল্য হারিয়ে ফেলেছে এবং বেদুইনদের মধ্যে মাত্র অংশতঃ ও আদিমরূপে তা বাস্তবায়িত। এই সমস্ত মূল্যই হল সাম্যবাদী মর্যাদার সারবস্তু। কিন্তু সেগুলিকে এক মরুভূমিবাসী আরবের ছাঁচের মধ্যে তিনি ঠেসে ধরেছেন—সেই তিনি যিনি বুর্জোয়া ইউরোপের সমস্ত দর্শন ও শিল্পের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। তিনি হত্যা করেছেন, লুণ্ঠন করেছেন, বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন, এবং এক আরব নেতার সঙ্কীর্ণ আশাআকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে খাটো করে রেখেছিলেন। এই সব রক্তপাত বা ব্যর্থ প্রয়াস ও বৃথা চাপ (tension) পরবর্তীকালে তাঁকে এক নিহত সুযোগের মত ধিক্কার জানিয়েছে।

বীরের এই বরগুণ প্রদর্শন করতে, এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এবং মানুষেরও ক্ষেত্রে ঘটনার এই অগ্রগতির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে কিভাবে তিনি সক্ষম হলেন? কারণ স্বজ্ঞার দিক থেকে তিনি জানতেন পুঁজিবাদী সামাজিক সম্পর্ক কত আড়ষ্ট, নীরস ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এই বিকাশমান সামাজিক সম্পর্কগুলি যখন মধুর ও উজ্জ্বল বলে দেখাত, বুর্জোয়ার সেই যৌবনকালে ষোড়শ শতকের পেরু ও মেক্সিকো বিজয়ী স্পেনদেশীয়রা [conquistadors] অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেই একটা সমগ্র নয়া দুনিয়া [New world] জয় করতে পারত। তাদের মত মানুষের অল্প কয়েকজনেই এক মৃত সভ্যতার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারত। কিন্তু বুর্জোয়াদের গাঁটে এখন বাত ধরেছে। ফ্ল্যাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল সেই রকম আরব দেশেও বুর্জোয়া সমর-যন্ত্র অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক হস্তীর মতই অকেজো হয়ে পড়েছে। একটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজই তাকে বিব্রত করতে পারে। লরেন্সই প্রথম এই ব্যাপারটি আবিষ্কার করেন এবং নিজের স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান থেকে বুর্জোয়া সমর যন্ত্রের দুর্বল স্থানগুলিতে তার বেঢপ করণকৌশলগত সংগঠন, তার অপদার্থতা, সমরোপকরণ সরবরাহের উপর তার নির্ভর করার উপর আঘাত হানেন। তাছাড়া বুর্জোয়া সমাজের মূল্যকে তিনি যেহেতু ঘৃণা করতেন শুধু

সেই কারণেও মরু আরবদের মনকে তিনি নাড়া দিতে পেরেছিলেন। এমন কি যেটা সব থেকে কঠিন কাজ, একটা পিতৃতান্ত্রিক জনসমাজ যার কাছে অর্থই সব নয়, সমাজের একমাত্র বন্ধন নয়, যেটা বুর্জোয়া শ্রেণীর থেকে অন্যরকম একটা ব্যাপার, সেই পিতৃতান্ত্রিক জনসমাজের মানুষদের তিনি না চটিয়ে ঘুষ খাওয়াতে পেরেছিলেন।

সুতরাং আরবদেশকে লরেন্স স্বাধীন করলেন। কিন্তু কিসের জন্য তাকে তিনি স্বাধীন করলেন? যে সমাজের সামাজিক সংগঠন হল অতীতকালের কিন্তু এক অবক্ষয়ী স্বৈরতন্ত্র [autocracy] তাকে টিঁকিয়ে রেখেছে সেই সমাজকে যদি কেউ স্বাধীন করে দেয় তাহলে সেটি বর্তমানের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে? বুর্জোয়ারা বন্ধনমুক্তি বলতে যা বোঝে তা হল একটা স্বশাসিত 'স্বাধীন' বুর্জোয়া রাষ্ট্র হওয়া। কোনও দেশকে যদি কেউ সেই স্বাধীনতা দেয় তাহলে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া সেখানে আর কি দেখা দিতে পারে?

সুতরাং যে আরবদের লরেন্স স্বাধীন করেছিলেন তাদের সামনে দুটি পরিণতি দেখা গেল। আপাতঃদৃষ্টিতে সে দুটি ভিন্ন হলেও মূলতঃ তারা এক। কেউ কেউ হয়ে গেল ফরাসী সাম্রাজ্যের অংশ। অন্যদের দেওয়া হল নিজেদের স্বজাতীয় রাজাকে সিংহাসনে বসিয়ে বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে (under tutelage) থাকার অনুমতি। সরকার, পুলিশ, তেলের ব্যাপারে সুযোগসুবিধা এবং অন্যান্য সব রকমের বুর্জোয়া আনুষঙ্গিকসহ এক সম্পূর্ণ বুর্জোয়া রাষ্ট্র ইরাক জন্ম নিল।

কিছু কিছু আরববাসীর প্রতি তিনি এবং বৃটিশ সরকার যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন একথা লরেন্স অনুভব করতেন। কিন্তু তাদের সকলের প্রতিই যে কী নিটোল বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করেছিলেন সেটা তিনি কখনই পুরোপুরি উপলব্ধি করেননি। যে পাপকে তিনি এড়াতে চেয়েছিলেন সেই পাপই তিনি আরবদেশে আমদানি করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মরু—আরবরা অর্থ, ব্যবসায়, লরী, লাউডস্পীকার নিয়মিত কর্মসংস্থানের মুখ দেখবে। কিন্তু সচেতনভাবে এটা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি; কারণ বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক থেকেই যে তিনি দূরে পলায়ন করছেন সেই ব্যাপারে তিনি কখনই সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না এবং অতীতের উপর বর্তমানের সর্বশক্তিমান ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই রকম এক মানুষ যিনি এক মারাত্মক ব্যাধি থেকে অন্ধের মত এক স্বাস্থ্যকর দেশে পলায়ন করে সেই দেশটাকেই ঐ ব্যাধিতে সংক্রামিত করেন। এই সব কিছু যদি তিনি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারতেন তাহলে নিজেকেই তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারতেন যে ব্যাপারটা অবশ্যম্ভাবী এবং অতীতকে বর্তমানের

কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে, যদি না রাশিয়ায় বাস্তবিকই যেমন ঘটেছে সেইরকম কোনও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী মিত্রকে সে জাগাতে পারে এবং ভবিষ্যৎ যেহেতু বর্তমানের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মত পূর্ণতালাভ করেছে, অতএব সেই ভবিষ্যতকে এখন ভূমিষ্ঠ করাতে পারে। এই ধরনের কাজের জন্য কেবল যে বীরেরই মাত্র প্রয়োজন তাই নয়, ভবিষ্যত জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং ইতিমধ্যেই তা পরিপূর্ণভাবে অন্তর্নিহিত [implicit]—এটাও ঘটা প্রয়োজন। আরবের কান্তার মরুভূতে ব্যাপারটা সে রকম ছিল না।

এইভাবে কি যে ঘটেছে লরেন্স সেটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু এটা তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন যে সিরিয়া ও ইরাক তাঁর জীবনের অতীত কালের জন্য ব্যাকুলতার কোনও উত্তর নয় এবং তাঁর আত্মার বেপরোয়া ও বেহিসাবী ব্যয়ের উপযুক্ত কোনও বিরাট বিষয় নয়।

পরবর্তীকালের সেই তিক্ত দিনগুলিতেও লরেন্স সেই মহা-আহ্বান শুনতে পেতেন এবং মরণোন্মুখ বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমস্ত অবক্ষয়ের স্বাদ গ্রহণ করতেন। যাবতীয় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে 'প্রচারের' চোখ ধাঁধানো দীপ্তিতে উদ্ভাসিত সমাজের সমস্ত ভব্যতার মধ্যে এই অবক্ষয় তিনি দেখতে পেতেন। বুর্জোয়া সংস্কৃতির যাবতীয় প্রকাশের মধ্যে সেই একই ভয়ঙ্কর পঙ্কিলতা তিনি দেখতে পেতেন। একমাত্র সেনা-বাহিনীর অধস্তন স্তরে তিনি দেখতে পেতেন আপন আদর্শের এক রুদ্ধবিকাশ সংস্করণ, পূর্ণতালাভের দিক থেকে যা বন্ধ্যা, কিন্তু অন্ততঃ অসম্মান থেকে যা মুক্ত। অন্ততঃ সেনাবাহিনীতে, যদিও তারা রাজার বেতন গ্রহণ করে তা সত্বেও, মুনাফার সন্ধান গোটা ব্যবস্থাটাকে ধরে রাখে না। এক সরল সামাজিক অবশ্যকর্তব্যের উপর তা প্রতিষ্ঠিত এবং তা এমন এক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে যা কখনও লাভালাভের কথা ভাবে না। বুর্জোয়াতন্ত্রের অশ্লীল বিলাসের মাঝখানে এ যেন এক আরব্য মরুভূমি। সেনাবাহিনীর রিক্ত তাঁবুগুলির অন্তরালে থাকে এক সরল সাথিত্ববোধ (comradeship) যা প্রতিযোগিতা বা ঘৃণা থেকে মুক্ত এক সামাজিক অস্তিত্ব। এটা একই সঙ্গে অতীতের টিঁকে থাকা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। কারণ একদিকে তা পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে সংবরণ করছে। বুর্জোয়াতন্ত্র তাদের চুরমার করে দেওয়ার আগে সেগুলি যেমন ছিল সেই অবস্থায় তাদের সংরক্ষণ করছে। অপরদিকে তা নগদ অর্থের নয়, এক মৌলিক প্রতীকের মত যৌথ প্রচেষ্টার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ আগামী দিনের সমাজের ভবিষ্যদ্বাণী করছে। বুর্জোয়া সম্পর্কগুলির প্রতি ভীষণভাবে বিরক্ত এই মানুষটি সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন যা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, যা কাজ ও খেলা উভয় ক্ষেত্রেই

এক সাথিত্ব, সুন্দরতর জিনিসের এক বন্ধ্যা কিন্তু তা সত্ত্বেও সান্ত্বনাদায়ক স্মারক। শান্তির সময় অনুৎপাদনশীল শ্রম জঙ্গীবাহিনীকে বিরক্ত করে এবং সাথিত্ববোধ সত্ত্বেও এক পীড়াদায়ক নির্বীর্যতাবোধ জঙ্গীবাহিনীর সদস্যদের তাড়িত করে। কিন্তু যখন যুদ্ধ দেখা দেয় এবং সমাজের প্রশ্নগুলি বুর্জোয়ারা এদের হাতে তুলে দেয় যে বুর্জোয়ারা নিরাপত্তার প্রয়োজনে নিজের সালিশীর অধিকারকে রক্ষা করতে বা প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে রক্তপাত ও হিংসা প্রয়োগের অধিকারের অনুকূলে নগদ অর্থ ও আইনের সালিশীর অধিকার এদের হাতে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত—সেনাবাহিনী তখন নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। যুদ্ধের যাবতীয় বীভৎসতা ও বিপদ সত্ত্বেও এক ধরনের উন্মত্ত আত্মস্ফীতি ও সুখী অবস্থার বোধ তার মধ্যে জেগে ওঠে। যুদ্ধ যে বুর্জোয়া অস্তিত্বের ধূসরতা সেনাবাহিনীকে এক যৌথ উন্মত্ততায় উন্নীত করে, সে বিষয়ে যুদ্ধে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন এমন হাজার হাজার মানুষ সাক্ষ্য দিতে পারেন।

যে বুর্জোয়া সম্পর্কের বিরুদ্ধে লরেন্সের আত্মা বিদ্রোহ করেছিল তার থেকে শান্তিকালীন এই নির্বীর্যতাও লরেন্সের কাছে বেশি ভালো বলে মনে হয়েছিল। এই কারণেই তিনি জঙ্গীবাহিনীতে যোগ দেন। অফিসার হিসাবে নয়। বুর্জোয়া-তন্ত্রকেই তিনি অপছন্দ করতেন। এমন কি সেনাবাহিনীর মধ্যেও যে শ্রেণী তাঁর কাছে সেই ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যগুলি টিকিয়ে রেখেছিল সেই শ্রেণীতে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। সাধারণ সৈন্যের দলে তিনি নাম লিখিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের ব্যাকুলতা যে ভবিষ্যতের জন্য, সর্বহারার দুনিয়ার জন্য, তাঁর সেই স্বজ্ঞাধর্মী জ্ঞানেরই পরিচয় এই কাজটির। এ সত্ত্বেও তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সচেতন রূপগুলি নিজেকে বুঝতে তাঁকে বাধা দিচ্ছিল।

কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণীকেই নয়, যন্ত্রকেও তিনি আঁকড়ে ধরলেন। পরবর্তী কালের তিক্ত দিনগুলিতে যন্ত্রের প্রতি তাঁর এক তীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। এরোপ্লেন, মোটরবাইক এবং মোটরবোট যেদিক থেকেই হোক মানুষের জন্য যেন এক অদ্ভুত শক্তির ধারক হিসাবেই তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে। বাতাসকে জয় করার প্রচেষ্টায় যোগ দেওয়াটা অন্ততঃ এমন একটা কাজ নয় যা পুরোপুরি বৃথা। একথা তিনি বলেছেন এবং লিখেছেন। কিন্তু কেন যে সেটা বৃথা কাজ নয় তা তিনি বলতে পারেননি। যন্ত্র যেদিকে ভবিষ্যৎও সেইদিকে। তা সত্ত্বেও যন্ত্রকে মুনাফা উৎপাদনকারী হিসাবে দেখতে তিনি আগ্রহী ছিলেন না।

তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। যে তাৎপর্যের সন্ধান তিনি করেছিলেন তা যন্ত্রের মধ্যেই আছে। কিন্তু নিছক যন্ত্র হিসাবে যন্ত্রের মধ্যে নয়, মানুষের দ্বারা সচেতন

ভাবে নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মধ্যেই তা আছে। সেই যন্ত্রকে ব্যবহার করেই মানুষ ইউরোপীয় সংস্কৃতির বহুযুগসঞ্চিত সমৃদ্ধ চেতনাকে না হারিয়ে আদিম সম্পর্কগুলির স্বাধীনতা ও সাম্যকে ফিরে পেতে পারে। উপকরণটি (instrument) লরেন্সের হাতে ছিল, বুর্জোয়াদের হাতেও তা আছে। কিন্তু তাদেরই মত কি করে সেটা ব্যবহার করতে হয় তা লরেন্স জানতেন না। বুর্জোয়াদের মত তিনিও এই যন্ত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্ময়বোধের নেশায় মাতাল হয়ে পড়েছিলেন, তার পিঠে চেপে ধ্বংসের দিকে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং যন্ত্রটা ক্রমেই আরও বেশি বেশি দ্রুতবেগে চলতে পারে বলে, তিনি ভাবতেন তিনিই বুঝি সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। একদিন দেখা গেল তাঁর বিরাট মোটরবাইকের পাশে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন ; সেটাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখেননি। কয়েকদিন পরেই লরেন্সের মৃত্যু হয়।

জয়লাভের কাছাকাছি এসেও লরেন্স তা অর্জন করতে পারেননি। নানা বরগুণ থাকার কারণে এবং পুঁজিবাদের কুফলগুলির প্রতি তার ঘৃণা থাকার কারণে কমিউনিস্ট বীর হয়ে ওঠার উপযুক্ত তিনি ছিলেন। অথচ তার পরিবর্তে তিনি যে এক ব্যর্থকাম বুর্জোয়া বীর হয়ে উঠলেন তার কারণ কি ? লরেন্সের ট্র্যাজেডির আংশিক কারণ হল তার শিক্ষাদীক্ষা তিনি বড় বেশি রকমের বুদ্ধিজীবী ছিলেন। সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি বীরের যথেষ্ট থাকা চাই। কিন্তু বুদ্ধিজীবী হওয়ার অর্থ হল ব্যক্তির মানসগত সম্ভাবনাগুলি (psychic potentialities) পুরোপুরি বিকশিত হয়ে সমকালীন রূপ পাওয়া। লরেন্স ছিলেন উচ্চ চেতনাসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু সেই চেতনা এমন এক সংস্কৃতিজাত চেতনা যে সংস্কৃতির পরাভব এখন সুনিশ্চিত। বুর্জোয়া সংস্কৃতির সুদীর্ঘ মধ্যাহ্নের যাবতীয় জীর্ণ প্রতীকগুলি তার অত্যাশ্চর্য স্মৃতি-শক্তিকে আড়ষ্ট করে তুলেছিল। এবং তার প্রতিভাকে তার আত্মার সহজপ্রবৃত্তিগত গতির অত্যন্ত অনমনীয় এক বিস্তারিত শিলীভূত কাঠামো করে তুলেছিল। এই কারণেই প্রায়ই দেখা যায় যে চিন্তা কর্মকে সাহায্য করার জন্যই মাত্র উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও কর্মকেই তা বাধা দেয়। তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর ট্র্যাজেডি হল সেই কর্মী মানুষের ট্র্যাজেডি যিনি একই সঙ্গে চিন্তাশীলও বটে। এইভাবে দেখাটা হল তার ট্র্যাজেডিকে অতি সরল করে দেখা। অচলাবস্থাটা আরও অনেক গভীর ও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ।

অন্যান্য বীররাও শিক্ষিত হয়েছেন এবং অতীতের জন্য সংগ্রামে এই অচলাবস্থাকে কাটিয়ে উঠেছেন। ভবিষ্যৎকে তাঁরা জয় করেছেন। লরেন্স কেন পারলেন না ? লরেন্সের ট্র্যাজেডিতে আর একটি উপাদান প্রবেশ করেছিল। লেনিনের কথা

আলোচনা করলে সেটা সব থেকে ভালোভাবেই বোঝা যায়। অতীতের বীরদের থেকে লেনিন এমন এক ভিন্ন ধরনের বীর যে বীরের সংজ্ঞাটাই নতুন করে নির্ধারণ করার ইচ্ছা জাগে প্রথমে। অতীত ইতিহাসের বীর এমন সব সামাজিক শক্তির দ্বারা তাড়িত হতেন যেগুলিকে তিনি বুঝতেই পারতেন না, অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সেই শক্তিগুলিকে তিনি প্রতীকায়িত করতেন। প্রায়ই দেখা গেছে যে তিনি ভাবছেন অতীতকেই তিনি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন, অথবা জোয়ান অব আর্কের মত তিনি কেবল 'দৈব নির্দেশ' বা 'ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরকে' অনুসরণ করে চলেছেন। এই ধরনের বীররা যেন অন্ধকারের মধ্যে ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করেন। কি করছেন বা কেন সেটা করছেন সেই বিষয়ে তাঁরা অবহিত থাকেন না।

তাঁর কর্তব্য যে কি সে বিষয়ে লেনিনের কিন্তু কোনওসন্দেহ ছিল না। যে ভবিষ্যৎকে তাঁকে রূপ দিতে হবে তা হল কমিউনিস্ট সমাজ। সেটা কি ভাবে যে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে বিধৃত রয়েছে (contained) এবং কিভাবে যে এই সম্পর্কগুলির মধ্য থেকে তাকে উৎসারিত (released) করতে হবে তা তিনি জানতেন। কেবল যে স্বজ্ঞার দিক থেকেই এটা তিনি জানতেন তাই নয়, বরং তাঁর ভাষণ ও রচনাবলীতে সব কিছু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত। ভবিষ্যতের বৈশিষ্ট্যসূচক গুণগুলিকে তিনি জানতেন না, কারণ কেউই সেগুলি জানতে পারে না। কিন্তু তার সাধারণ আকৃতিটা এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কার্যকারণগত নিয়মগুলি সামাজিক সম্পর্কগুলিকে রূপ দান করে সেগুলিকে তিনি জানতেন, ঠিক যেমন ভবিষ্যতের গুণগুলি না জানা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী কতকগুলি কার্যকারণগত নিয়মকে জানেন যার সাহায্যে তিনি জোয়ার-ভাঁটা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন এবং প্রয়োজোন হলে সেগুলির সুযোগ নিতে পারেন। ভবিষ্যদ্বাণীর সারমর্ম হল এই : বাস্তবের প্রক্রিয়ার মধ্যে সদৃশের (Like) একটা নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) বজায় থেকেই যায় এবং তা হল অ-সদৃশের (Unlike) নিরবচ্ছিন্ন বিকাশের, যাকে বলে 'হয়ে ওঠা' (becoming), তারই অধঃস্তর (Substrate)। সদৃশ আর অ-সদৃশ পরপর অসম্পৃক্ত সামগ্রী নয়। একটাই আর একটা হয়ে ওঠে এবং একটির পরিবর্তনই হল অপরটির পরিবর্তন। যেহেতু গুণ অসদৃশ, সেই কারণেই তা সহসা, দ্বান্দ্বিকভাবে, একটা নতুন রূপান্তর (mutation) হিসাবে উদ্ভূত হয়। পরিমাণ পরিবর্তিত হয় কেবল ক্রমে ক্রমে : জ্ঞাত সম্পর্কগুলির চৌহদ্দির মধ্যেই তা থাকে। বিজ্ঞানের আলোচনার সামগ্রী সর্বদাই হল সদৃশ—ইলেকট্রন, কাল, স্থান, বিকীরণ এবং সেগুলিকে গ্রন্থনকারী নিত্যতা সূত্রগুলি (conservation Laws)। বিজ্ঞান যেহেতু জ্ঞাত সম্পর্কগুলির

ক্ষেত্রেই মাত্র তার মনোযোগকে সীমিত রাখে সেইজন্য ভবিষ্যতের মধ্যকার জ্ঞেয় উপাদানগুলি সম্পর্কে বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। সমাজবিদ্যা ক্ষেত্রের বিজ্ঞানীও এই মাত্রা পর্যন্ত ভবিষ্যৎকে জানতে পারেন। লেনিন সেটাই করছিলেন। কিন্তু অতীতের বীররা আবশ্যিকভাবেই (necessarily) এমন কি ভবিষ্যতের পরিমাণগত ভিত্তি সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিলেন। কর্মজগতের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও লেনিন সেই কারণে রহস্যবাদ থেকে, বীরের 'সৌভাগ্যবান' চরিত্র থেকে মুক্ত ছিলেন এবং বিজ্ঞানীর জ্ঞানধর্মী চরিত্রেরই (cognitive character) অনেকটা গ্রহণ করেছিলেন।

অথচ যাবতীয় পূর্ববর্তী সামাজিক সম্পর্কগুলির থেকে ভিন্ন প্রকৃতির যে সমাজের সারবস্তু হল এই যে তার মধ্যে সামাজিক সম্পর্কগুলির বিষয়ে মানুষ জ্ঞানধর্মিতার দিক থেকে সচেতন (cognitively conscious), এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে যেমন দেখা যায়, সেই রকম কেবল মাত্র সমাজের পরিবেশকেই যে তারা বোঝে তাই নয়, বরং সমাজটাকেই তারা বোঝে ; সেই সমাজকে ভূমিষ্ঠ করাতে হবে যাঁকে সেই ব্যক্তির মধ্যে এই বিকাশ কি অত্যাবশ্যক নয়? এক মাত্র আত্মসচেতন বীরই পারেন মানুষকে আত্মসচেতন সমাজের পথে এগিয়ে যাওয়ার কাজে নেতৃত্ব দিতে। সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য যদি এই হয় যে ধর্ম, রহস্যবাদ, জাতি (race) এবং যে সব প্রতীকধর্মী সূত্রায়ন দিয়ে সামাজিক সম্পর্কগুলির যথার্থ (true) প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষ তার অন্ধকার স্বজ্ঞাগুলিকে ঢেকে রেখেছে সেগুলিকে তা অপসারিত করবে, তাহলে সাম্যবাদের পতাকাবাহীদেরও উপকথা ও বিভ্রম থেকে সম মাত্রায় মুক্ত হতেই হবে। দেবতা, দানব বা বন্ধনমুক্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও স্বভাবধর্মী মানবের (Natural Man) অস্পষ্ট প্রতিমূর্তি ধাঁচের মনুষ্যধর্মারোপিত রূপের (personifications) সক্রিয় লীলাভূমি হিসাবে সমাজকে দেখলে এইসব মানুষদের চলবে না। সমাজ কার্যকারণগত দিক থেকে যেরকম সেইভাবেই তাকে দেখতে হবে। লেনিন এটা করতে পেরেছিলেন, কারণ সমাজের কার্যকারণগত নিয়মগুলিকে মার্ক্স ইতোমধ্যেই উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। বিখ্যাত প্রতি-নায়ক বা ভণ্ড-নেতাদের সুদীর্ঘ পংক্তির শেষ প্রান্তে যেমন দাঁড়িয়ে আছে হিটলার বা মুসোলিনি, লেনিন সেই রকম সূত্রপাত করলেন এক নতুন জাতির বীর বা নেতার। নিজের বুদ্ধিবৃত্তিগত সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সঠিক কর্মটি করা এখন আর সহজপ্রবৃত্তিধর্মী অনুভূতি দ্বারা চালিত বীরের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ধরনের বীররা লরেন্সের মত নিজেদের চেতনার দ্বারা নিজেরাই কেবল রুদ্ধশ্বাস হবেন। সাম্যবাদ এই দাবি করে যে মানুষ যেটা ইচ্ছা করে কেবল সেটাই নয়, যা সেই ইচ্ছাকে নির্ধারিত করে সেটার সম্পর্কেও মানুষকে সচেতন

হতে হবে। সাম্যবাদের ঐ দাবির কারণে সাম্যবাদী নেতারও সমমাত্রার চেতনা থাকার প্রয়োজন।

লরেন্সের ট্র্যাজেডি এই যে, তিনি কেবল তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিধর্মিতার দ্বারাই ব্যাহত হননি, মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল যে নতুন জগতের ক্রন্দন তাঁর স্বপ্নে তিনি শুনেছিলেন সেই নতুন জগতের প্রকৃতিই তাঁকে ব্যাহত করেছিল। অতীত যুগের চেতনার বিকৃতি সাধনকারী পক্ষপাত সত্ত্বেও অন্যান্য বীররা সঠিক পথ খুঁজে বার করতে পেরেছেন এবং সমকালের অভিজ্ঞতার প্রচণ্ড বেগে সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে পেরেছেন কিন্তু এই ধরনের 'সহজপ্রবৃত্তিধর্মী' বীর আর জন্মাবে না। বীর হয়ে ওঠার আগে লরেন্সের পক্ষে তাঁর চেতনাকে অস্বীকার করাটাই পর্যাপ্ত ছিল না, প্রথমে তাঁর সেটাকে চূর্ণ করার এবং ব্যাপকতর ও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর তাকে প্রতিষ্ঠিত করার দরকার ছিল। কিন্তু অক্সফোর্ডের ছায়াকুঞ্জে বা তখনও পর্যন্ত বাজার ও যন্ত্রের সংস্পর্শহীন আরবের ধূধূ প্রান্তরে কোথায় তিনি সেই চেতনার সন্ধান পাবেন?

লেনিনের আগে যে সব শক্তিশালী মানুষ জন্মেছিলেন তাঁদের কর্তব্য তাদের থেকে আগামী দিনের বীরদের কর্তব্যকাজ আরও অনেক বেশি আয়াসসাধ্য এবং তা সত্ত্বেও আরও বেশি তৃপ্তিদায়ক। কোন জিনিসকে ভূমিষ্ঠ করাতে তাঁরা চেষ্টা করছেন সেটা প্রথমে তাঁদের জানতে হবে। কিন্তু সেটা জানার পর এটাও তাঁরা জানতে পারবেন যে তাঁরা সেটা ভূমিষ্ঠ করাতে পারেন; কিন্তু ভাগ্য, দৈব অনুপ্রেরণা বা কোনও পারিবারিক আক্রোদিতের উপর তাঁরা নির্ভরশীল নয়। তাঁরা সেই কার্যকারণতারই একটা অংশ যে কার্যকারণতা হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মনির্ধারণ। তার অর্থ হল এই যে, উপকথার জীবন যাপন করেন এমন বীর এবং তাঁর অনুবর্তীদের যে সব রূপকথার কাহিনী তিনি শুনিয়ে থাকেন সেই সব কাহিনীর পরিসমাপ্তি। মানবজাতির শৈশবাবস্থার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে যাবতীয় মনমুগ্ধকারী সরলতা ও সুন্দর সুন্দর কাল্পনিক বিশ্বাস। মানবজাতির বীরদেরও তাই সাবালক হতেই হবে।

চীনেও দারিদ্র্য ও আলস্যের দান লক্ষ লক্ষ সরল ও কৃষিজীবী মানুষ আজ বন্ধনমুক্তির নামে কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সেই কাহিনী এক জন বীরের নয়, শত শত বীরের কাহিনী; অসম্ভব যত কাজ তাঁরা করছেন। বুর্জোয়াদের স্বর্ণের সাহায্য নিয়ে নয়, বরং বুর্জোয়াদের স্বর্ণ দ্বারা পুষ্ট, বুর্জোয়া শক্তিগুলির দ্বারা অস্ত্রসজ্জিত এবং বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত আক্রমণকে বার বার প্রতিহত করেই সেই কাজ তাঁরা করছেন। এই জাতীয় অভ্যুত্থান চীনের লাল ফৌজ দ্বারা পরিচালিত হয়ে

এবং তেজ ও প্রভাবের দিক থেকে অবিরাম আরও বেশি বেশি বলীয়ান হয়ে উঠছে। এই জাতীয় অভ্যুত্থানও বন্ধনমুক্তির নামেই অনুপ্রাণিত, কিন্তু সেটা বুর্জোয়া বন্ধনমুক্তি নয়। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ, ইংরেজ ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় ও মার্কিন ব্যবসায়-বাণিজ্যের রূপ ধরে বুর্জোয়া বন্ধনমুক্তি তাকে ধ্বংস করার জন্য কুয়োমিনতাঙ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। লাল ফৌজ হল এক কমিউনিস্ট সেনাবাহিনী। যেখানেই তারা যাচ্ছে সেখানেই তারা গ্রাম-সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করছে। তার নেতারা এবং সাধারণ সৈন্যরা মার্ক্স, লেনিন, স্তালিনের লেখা পড়েছেন। ইরাক বুর্জোয়া বীর মুক্তিদাতা লরেন্সের সৃষ্টি সেই ইরাকের উপর যখন তৈল শিল্পে নিযুক্ত পুঁজি তার মুষ্টি দৃঢ়তর করছে, তখন দীর্ঘকাল যাবত বঞ্চিত ও ধর্ষিত চীনা জাতীয়তাবাদ সাম্যবাদের মধ্যে তার শেষ উদ্দীপনাময় লক্ষ্যের সন্ধান পেয়েছে, জয়লাভ তার সুনিশ্চিত।

তিন

ডি. এইচ. লরেন্স

॥ বুর্জোয়া শিল্পী সম্পর্কে পর্যালোচনা ॥

শিল্পীর কাজ (function) কি ? যে কোন শিল্পী যিনিই লরেন্সের মত শিল্পীর থেকে আরও বেশি 'কিছু' হতে চান তিনিই আবশ্যিকভাবে এই প্রশ্নটি তোলেন। শিল্পের জন্য শিল্প হল একটা বিভ্রম এবং শিল্পকে অবশ্যই প্রচার হতে হবে—এই কথাটা মার্ক্সবাদের শিক্ষা বলে মনে করা হয়। এটা অবশ্য একটা জটিল ব্যাপারের চিরাচরিত বুর্জোয়া সরলীকরণ।

শিল্প একটা সামাজিক ক্রিয়া (function)। এটা কোনও মার্ক্সবাদী দাবি নয়, বরং শিল্পের রূপগুলির সংজ্ঞা যেভাবে দেওয়া হয় তা থেকেই এই কথাটা ওঠে। যে সব জিনিসের সচেতন সামাজিক ভূমিকা আছে, শিল্পের রূপ বলে কেবল মাত্র সেগুলিকেই স্বীকার করা হয়। স্বপ্নদ্রষ্টার অলীককল্পনাগুলি শিল্প নয়। সেগুলিকে যখন সংগীত, রূপ বা ভাষা দেওয়া হয়, সামাজিকভাবে স্বীকৃত প্রতীকে যখন সেগুলিকে সজ্জিত করা হয়, তখনই মাত্র সেগুলি শিল্প হয়ে ওঠে। আর এই প্রক্রিয়া চলা কালে অবশ্যই একটা রূপান্তর (modification) ঘটে। সামাজিক পোষাকের সাহায্যে অলীককল্পনাগুলি রূপান্তরিত হয়, ভাষাটি সামগ্রিকভাবে নতুন অনুষঙ্গ ও নতুন প্রসঙ্গ লাভ করে। সংগীত কোনও আপতিক ধ্বনি দিয়ে তৈরি হয় না, এক সামাজিকভাবে স্বীকৃত স্বরগ্রাম (scale) থেকে ধ্বনিগুলিকে নির্বাচিত করা হয় এবং সামাজিকভাবে উন্নতিপ্রাপ্ত যন্ত্রে সেগুলি বাজানো হয়।

অতএব, শিল্প এক সামাজিক ভূমিকা পালন করুক এই দাবি করা, অথবা 'শিল্পের জন্য শিল্পের' ধারণাকে আক্রমণ করা মার্ক্সবাদের কাজ নয়। কারণ শিল্প হল কেবল শিল্পই এবং যে পরিমাণে তা সামাজিক ভূমিকা পালন করে সেই পরিমাণেই তা শিল্প হিসাবে স্বীকৃতিযোগ্য। শিল্প, মার্ক্সবাদ এবং সমাজের দিক থেকে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল : **শিল্প কোন সামাজিক ভূমিকা পালন করছে ?** এটা আবার পাল্টা নির্ভর করে যে সমাজে তা নিঃসৃত (is secreted) হচ্ছে সেই সমাজের টাইপ বা জাতিরূপের উপর।

বুর্জোয়া সমাজে সামাজিক সম্পর্কগুলি মানুষে মানুষে সম্পর্কের রূপ হিসাবে অস্বীকৃত হয় এবং তা মানুষ ও কোনও সামগ্রীর মধ্যকার সম্পর্কের, একটা সম্পত্তিভিত্তিক সম্পর্কের রূপ নেয়, এবং যেহেতু সেটা এক প্রাধান্য বিস্তারকারী (dominating)

সম্পর্ক সেই কারণে তা মানুষকে স্বাধীন করে বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেটা একটা বিভ্রম। যে সম্পর্কগুলি এখন অচেতন হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণে নৈরাজ্যমূলক হয়ে উঠেছে, অথচ সেগুলি এখনও মানুষে মানুষে সম্পর্ক এবং বিশেষ করে শোষক ও শোষিতের মধ্যকার সম্পর্ক হয়েই রয়েছে, সম্পত্তিভিত্তিক সম্পর্ক হল তারই একটা ছদ্মবেশ।

বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে শিল্পীকেও ঐ একই কাজ করতে বলা হয়। তাকে বলা হয় শিল্পকর্মকে একটা সুসম্পূর্ণ পণ্য হিসাবে গণ্য করতে এবং শিল্পের প্রক্রিয়াকে শিল্পীর নিজের এবং শিল্পকর্মটির মধ্যকার একটি সম্পর্ক হিসাবে গণ্য করতে। আর তারপরে এই সম্পর্কটি বাজারের মধ্যে লোপ পেয়ে যায়। শিল্পকর্মটি ও ক্রেতার মধ্যে আরও একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু সে বিষয়ে শিল্পীর তাৎক্ষণিক দিক থেকে আগ্রহী হওয়ার কথা বিশেষ থাকে না। বুর্জোয়া সমাজের গোটা চাপটা হল শিল্পীকে তার শিল্পকর্মটিকে স্বতন্ত্র-সত্তাবৎ (hypostatised) গণ্য করতে, এবং শিল্পকর্মটির সঙ্গে তার সম্পর্কটিকে মুখ্যতঃ বাজারের জন্য এক উৎপাদনকারীর সম্পর্ক হিসাবে গণ্য করতে তাকে বাধ্য করা।

এর দুটি ফল দেখা দেবে।

(১) মূর্ত স্বতন্ত্র সত্তাবৎ কল্পিত সামগ্রীটিকে সম্পত্তির উপর অধিকার হিসাবে কপিরাইট, ছবি বা মূর্তি হিসাবে বিক্রি করে শিল্পীকে তার জীবিকা উপার্জন করতে হয়। এই ঘটনাটি শিল্পী হিসাবে তার কাজটিকে বাজারের সম্ভাবনার দ্বারা মূল্যায়ন করার দিকে তাকে চালিত করতে পারে, যে বাজারের সম্ভাবনা এই সম্পত্তির উপর অধিকারের একটা বড় রকমের সামগ্রিক মূল্য [total return] সৃষ্টি করে। এর ফলে শিল্পের নিছক ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে ওঠা বা অপকর্ষতা দেখা দেয় [vulgarisation]।

(২) কিন্তু শিল্প কোনও দিক থেকেই একটা সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নয়। তা হল মানুষের সঙ্গে মানুষের ,শিল্পী ও শ্রোতার মধ্যকার একটা সম্পর্ক এবং শিল্পকর্মটি যে কেবল একটা যন্ত্রেরই মত—এই কথাটি প্রক্রিয়াটির অংশ হিসাবে তাদের দুজনকেই বুঝতে হবে। শিল্প ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে ওঠার ফলে নিষ্ঠাবান শিল্পী বিদ্রোহ করতে পারেন, কিন্তু ট্র্যাজেডিটা হল এই যে এই বুর্জোয়া সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেই এর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন। বাজারকে তিনি সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন, এবং যে শিল্পকর্ম এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সামগ্রী হিসাবে আরও বেশি স্বতন্ত্রসত্তা লাভ করেছে সেই শিল্পকর্মটির সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্কটির দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেন। যেহেতু শিল্পকর্মটি এখন

পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বাজারকে ভুলে যাওয়া হয়েছে, শিল্প-প্রক্রিয়াটিও সেই কারণে এক চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে। শিল্পগত রূপটির মধ্যে, যেমন বাক্য—গঠনরীতি, ঐতিহ্য, নিয়মাবলী, করণকৌশল, রূপ, স্বীকৃত স্বরগ্রাম (tonal scale) ইত্যাদির মধ্যে যে সামাজিক মূল্যগুলি নিহিত থাকে সেগুলির মূল্য এখন খুব কম বলেই মনে হয়। কারণ শিল্পকর্মটির অস্তিত্ব এখন আরও বেশি বেশি করে কেবল এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির জন্যই মাত্র। শিল্পকর্মটি আবশ্যিকভাবে সর্বদাই পুরাতন সচেতন সামাজিক সূত্রায়ন, অর্থাৎ শিল্পগত 'রূপ'—এবং সচেতনীকৃত নতুন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার, অর্থাৎ শিল্পগত 'বিষয়বস্তু' বা শিল্পীর 'বাণীর' মধ্যকার চাপের ফলে সৃষ্ট। এটাই হল সংশ্লেষণ, যা হল সৃষ্টির সবিশেষ কঠিন কর্তব্যকাজ। কিন্তু শিল্পকর্মটিকে স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট সামগ্রী করে তোলাটাই লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠার ফলে পুরাতন সচেতন সামাজিক সূত্রায়নগুলির গুরুত্ব আরও কমে যেতে থাকে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আরও বেশি বেশি করে প্রাধান্যলাভ করতে থাকে। ফলে শিল্প আরও বেশি বেশি করে রূপহীন, ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত দাদাইজ্‌ম, সুররিঅ্যালিজম্‌ ও 'স্টাইনিং' (steining) হয়ে পড়ে।

এইভাবে দুটি শক্তির চাপে পড়ে বুর্জোয়া শিল্পে বিযুক্তি ঘটে [disintegrated]। দুটি শক্তিরই উদ্ভব বুর্জোয়া সংস্কৃতির একই বৈশিষ্ট্য থেকে। এক দিকে দেখা দেয় বাজারের জন্য উৎপাদন—অর্থাৎ অপকর্ষতা, ব্যবসায়ভিত্তিকতা। অপর দিকে দেখা দেয় শিল্প-প্রক্রিয়ার লক্ষ্যস্থল হিসাবে শিল্পকর্মটির স্বতন্ত্রসত্তাবৎ হয়ে যাওয়া এবং শিল্পকর্ম ও ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কটিই সর্বপ্রধান হয়ে ওঠা। এর অপরিহার্য পরিণতি হল যে সব সামাজিক মূল্যগুলি আলোচ্য শিল্পটিকে একটা সামাজিক সম্পর্ক করে তোলে সেই সামাজিক মূল্যগুলিরই বিলয় [dissolution]। এবং সেইজন্য শেষ পর্যন্ত তার ফলে শিল্পকর্মটি আর শিল্পকর্ম থাকে না, সেটা একটা নিছক ব্যক্তিগত অলীককল্পনা হয়ে ওঠে।

বিগত দুই শতকের যাবতীয় বুর্জোয়া শিল্পের মধ্যে এই দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার নিয়ত বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কোন শিল্পরূপের মধ্যে নিহিত সামাজিক মূল্যগুলির যতক্ষণ না বিযুক্তি ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত—যেমন ধরুন ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—যে শিল্পী শিল্পগত রূপটিকে স্বতন্ত্রসত্তাবৎ দেখছেন এবং বাজারকে ঘৃণা করছেন তিনি ভালো শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু তারপর থেকে এটা উত্তরোত্তর আরও কঠিন হয়ে পড়ছে। বলাবাহুল্য, বাজারকে পুরাপুরি স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হল শিল্প-প্রক্রিয়ার যে কোন অংশকেই একটা সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করতে অস্বীকার করা। মহৎ শিল্প সৃষ্টি করার পক্ষে সেটা আরও বেশি অনুপযোগী।

এই বুর্জোয়া ফাঁদকে এড়াতে এবং শিল্পের মধ্যে নিহিত সামাজিক সম্পর্কগুলির বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে যা কিছু শিল্পীকে সাহায্য করে তাই এই পচনকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এই কারণেই বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে সাহিত্যের যে রূপটি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে তা হল উপন্যাস। কারণ, শিল্প-প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত সামাজিক সম্পর্কগুলি এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। এর হেতু কি তা অন্যত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডরোথি রিচার্ডসন, জেমস জয়েস ও প্রুস্ত সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুর্জোয়া উপন্যাসের শেষ কুসুম। কারণ তাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই সামাজিক সম্পর্কের বিষয়গত পর্যালোচনা হিসাবে উপন্যাস লোপ পেতে সুরু করে এবং তা সমাজ সম্বন্ধে বিষয়ী যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তারই পর্যালোচনা হয়ে ওঠে। আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেই অভিজ্ঞতালব্ধ জিনিসটি লোপ পেয়ে যায় এবং তখন "আমি ভাব" পুরাপুরি রাজত্ব করে, যেমন গার্ট্রুড স্টাইনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

শিল্পী একজন বিশুদ্ধ 'শিল্পী'—এই ধারণার অস্তিত্ব লোপ পাওয়াটা এই স্তরে অপরিহার্য। কারণ ব্যবসায়ভিত্তিক শিল্প অসহনীয়ভাবে স্থূল হয়ে পড়েছে এবং তা নিজেকেই প্রতিষেধিত করে। একইভাবে শিল্পের জন্য শিল্পও (অর্থাৎ বাজারকে অস্বীকার করা এবং সুসম্পূর্ণ শিল্পকর্ম যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা লক্ষ্য সেই হিসাবে তার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা) নিজের প্রতিষেধ ঘটিয়েছে। কারণ, শিল্পগত রূপের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে এবং যা ছিল শিল্প তা হয়ে উঠেছে একান্ত অলীক কল্পনা। এই কারণেই লরেন্স, জিদ, রম্যাঁ রলাঁ, প্রমুখের মত নিষ্ঠাবান শিল্পীরা সুন্দর শিল্পকর্মে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, এবং শিল্পচর্চা ছেড়ে দিয়ে সামাজিক তত্ত্বের চর্চা করছেন বলে মনে হয়। তাঁরা তত্ত্বধর্মী ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ধর্মগুরু ও প্রচারপন্থী ঔপন্যাসিক হয়ে উঠছেন বলে ম'ন হয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক অলীককল্পনা ও ব্যবসায়-ভিত্তিক পঙ্কিলতায় পরিণত বুর্জোয়া শিল্প যাতে আবার একটা সামাজিক প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তার পুনর্জন্ম ঘটে এই নিষ্ঠাবান শিল্পীরা সেই প্রচেষ্টা চালান। এই ধরনের শিল্প মহৎ শিল্প কিনা, বা মহৎ শিল্প হতে পারে কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর, যেহেতু শিল্প আবার শিল্প হয়ে ওঠার জন্য তা অপরিহার্য পূর্ব-প্রয়োজন ; ঠিক যেমন বুর্জোয়া রাজত্ব থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি বেশ মসৃণ, আনন্দজনক বা সুন্দর বা স্বাধীন কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর, যেহেতু বুর্জোয়া নৈরাশ্য ও দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটিয়ে সমাজকে যদি সুখী ও স্বাধীন হতে হয় তাহলে সেটি একটি অপরিহার্য ধাপ।

কিন্তু সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শিল্প জিনিসটা কি? নিছক শিল্পকর্ম হিসাবে বা জীবিকা উপার্জনের একটা পথ হিসাবে নয়, শিল্প হিসাবে শিল্প জিনিসটা কি?

সমাজে কোন্ ভূমিকা সে পালন করে? অন্যত্র এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি, সেই কারণে এখানে সংক্ষেপে শুধু তার পুনরুল্লেখ করলেই চলবে।

ব্যক্তিগত অলীককল্পনা বা দিবাস্বপ্ন যতই সুন্দর হোক না কেন তা শিল্প নয়। সুন্দর সূর্যাস্তও শিল্প নয়। দুটিই শিল্পের কাঁচামাল মাত্র। শিল্পের ধর্মই হল এই যে তা বাস্তবের অনুকরণধর্মী চিত্র তৈরি করে, যাকে আমরা বিভ্রমাত্মক বলে স্বীকার করে নিই। উপন্যাসের ঘটনাবলী প্রকৃতই ঘটে বলে, বা চিত্রে অঙ্কিত কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে আমরা ভ্রমণ করতে পারি বলে আমরা মনে করি না—তা সত্ত্বেও তাতে বাস্তবের কিছু অংশ থাকে।

এই অনুকরণধর্মী বর্ণনা (mimic representation) আলোচ্য শিল্পের উপযোগী করণকৌশলের সাহায্যে সামাজিক বর্ণনার মধ্য থেকে এক আবেগোদ্দীপকগত স্ফুরণ (affective emanation) ঘটায়। এই স্ফুরণ আমাদের মধ্যে বর্তমান, বর্ণিত বিষয়ের উপাদানগুলির সঙ্গে আমাদের আবেগোদ্দীপকগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বর্তমান। বর্ণিত বিষয়টির মধ্যে কেবলমাত্র আবেগোদ্দীপকগুলিই যে সুনির্দিষ্ট থাকে তাই নয়, অনুকরণীকৃত বিষয়টির মধ্যে বাস্তবের যে খণ্ডটি প্রতীকান্বিত তার প্রতি এক আবেগোদ্দীপকগত প্রতিন্যাসে (attitude) সেগুলির সংগঠনটিও যুগপৎ সুনির্দিষ্ট থাকে। চেতনার সাধারণ উৎকর্ষতাবৃদ্ধি এবং স্বকীয়-মূল্য (self-value) বৃদ্ধির সাহায্যে এই আবেগোদ্দীপকগত প্রতিন্যাসকে গড়ে তোলা হয়। যে উদ্দীপকগুলি (innervation) জেগে ওঠে তাদের অ-চেষ্টাকেন্দ্রগত (non motor) প্রকৃতির কারণে এটা ঘটে। ফলে সেগুলি সবই চেতনার এক আবেগোদ্দীপকগত বিকিরণের (irradiation) মধ্যে প্রবেশ করে বলে মনে হয়। বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তি যেমন বাস্তবের প্রতি এক চিরস্থায়ী বৌদ্ধিক প্রতিন্যাস জাগিয়ে তোলে এই আবেগোদ্দীপক প্রতিন্যাস কিন্তু সেইরকম চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবের স্মৃতিসহায়ক (mnemic) বৈশিষ্ট্যগুলির কারণে একটা অভিজ্ঞতা হিসাবে এটি থেকে যায়, এবং সেই কারণে অভিজ্ঞতাটির সঙ্গে জড়িত সচেতন তীব্রতার পরিমাণ এবং অভিজ্ঞতাটির প্রকৃতির সমানুপাতে জীবনের প্রতি সেই বিষয়ীর সাধারণ প্রতিন্যাসকে সেটি অবশ্যই রূপান্তরিত করবে। এই রূপান্তর জীবনকে সেই প্রাণীর কাছে আরও বেশি আগ্রহের সামগ্রী করে তুলবে, আর সেইখানেই হল শিল্পের উদ্বর্তনমূল্য (survival-value)। কিন্তু সমাজের দিক থেকে দেখলে, শিল্প হল সমাজের সদস্যদের আবেগোদ্দীপকগত চেতনাকে রূপ দেওয়া, তাদের সহজপ্রবৃত্তি-গুলির সাপেক্ষীভবন (conditioning)।

বাস্তব সম্পর্কে মতামত আদানপ্রদানের সব থেকে সাধারণ উপকরণ বা হাতিয়ার

(instrument) হল ভাষা। সেইকারণে তা আবেগোদ্দীপকগত বা জ্ঞানধর্মী (cognitive) যাই হোক না কেন, বাস্তবকে বর্ণনা করার একটা বিশেষ প্রবহতাযুক্ত পরিসর (range) তার থাকে। সাহিত্যের, অর্থাৎ উপন্যাস, নাটক, কবিতা ছোটগল্প ও প্রবন্ধ সাহিত্যের নমনীয়তা ও পরিসর সেই কারণেই। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক এবং কিছুটা অসংহত (discursive) বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বাস্তবের যত কিছু প্রতীকধর্মী চিত্র গড়ে ওঠে সাহিত্য তার সব কিছু থেকেই আহরণ করতে পারে। শিল্প একমাত্র তখনই তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে যদি চিত্রগুলি নিজেরাই যুগপৎ আবেগোদ্দীপক ও সংগঠন উৎপাদন করার মত হয়। বাস্তবের খণ্ডটিকে শিল্পী তখন আমাদের কাছে তুলে ধরা মাত্রই আমাদের কাছে তা আবেগোদ্দীপকগত বর্ণে জলজল করছে বলে মনে হয়।

বাস্তব আমাদের জন্য আমাদের পরিবেশকে গড়ে তুলেছে ; আর আমাদের পরিবেশ, যা প্রধানতঃ সামাজিক, অবিরাম পরিবর্তিত হচ্ছে—কখনও প্রায় বোঝা যায় না এমন গতিতে, কখনও অতি দ্রুত। বাস্তবের যে সব সামাজিকভাবে স্বীকৃত চিত্র আমরা শব্দ দিয়ে তৈরি করি সেগুলি দর্পণের মধ্যকার প্রতিবিম্বের মত পরিবর্তিত হতে পারে না। দর্পণে বস্তুর প্রতিফলন হয়। বস্তুটি যদি স্থান পরিবর্তন করে প্রতিবিম্বটিও তাহলে স্থান পরিবর্তন করে। কিন্তু ভাষার মধ্যে পরিবর্তনহীন শব্দের সাহায্যে বাস্তব প্রতীকায়িত হয়। ফলে ওই শব্দগুলি যে বস্তুর বর্ণনা করে সেই বস্তুকে এক মিথ্যা সুস্থিরতা ও স্থায়িত্ব (stability and permanence) দান করে। অর্থাৎ সেগুলি বাস্তবকে প্রতিফলিত করে বলার থেকে বরং বলা যায় সেগুলি বাস্তবকে তৎক্ষণাৎ চিত্রিত করে (photograph)। ভাষার এই নিরুত্তাপ (frigid) বৈশিষ্ট্যটি পরিতাপজনক হতে পারে, কিন্তু তার উপযোগিতামূলক (utilitarian) উদ্দেশ্যও আছে। সম্ভবতঃ এই একটি মাত্র উপায়েই মানুষ তার রৈখিক চেতনার সাহায্যে প্রবহমান বাস্তবকে আয়ত্ব করতে পারে। ভাষা যত বিকশিত হতে থাকে ততই তা আরও বেশি বেশি করে এই মিথ্যা স্থায়িত্বকে প্রকাশ করতে থাকে এবং শেষ অবধি আমরা গিয়ে পৌঁছাই প্লেটনীয় ধ্যানধারণায়, শাশ্বত ও সুসম্পূর্ণ শব্দে (Eternal and Perfect Words)। শব্দের শাশ্বত্ব ও সুসম্পূর্ণতা নিছক মুদ্রণ ও কাগজের স্থায়িত্ব। কোন সামগ্রী বা ঘটনাকে বর্ণনা করার জন্য কোনও শব্দ গঠন করা হলে বা কোনও প্রতীক লেখা হলে, সামগ্রীটি যখন পরিবর্তিত হয়েও যায় এবং ঘটনাটি যখন আর বর্তমান থাকে না তখনও শব্দটি "শাশ্বতভাবে" অপরিবর্তিত থাকে। এই স্থায়িত্ব প্রতীকত্বের অপরিহার্য প্রকৃতিরই একটা অংশ, যা তর্কশাস্ত্রের (logic) নিয়মা-

বলীর মধ্যে প্রকাশিত। মানব মনের এই এক আশ্চর্য খেয়াল যে সে মনে করে যে তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলী মেনে চলতে বাস্তব বাধ্য। অথচ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গীটা হল এই যে, প্রতীকত্বের নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই তার কিছু নিয়ম থাকে। তর্কশাস্ত্রের নিয়মাবলীর মধ্যে সেগুলি প্রকাশিত এবং বাস্তবের প্রক্রিয়ার ব্যাপারে সেগুলির কিছু করার না থাকলেও প্রতীকধর্মী প্রক্রিয়াটির প্রকৃতিকেই তা সূচিত করে।

ভাষা ও বাস্তবের মধ্যকার এই অসঙ্গতি সম্পর্কে শিল্পী যেভাবে অভিজ্ঞতালাভ করেন তা নীচে বলা হল: গোলাপ সম্পর্কে তার এক নিবিড় অভিজ্ঞতালাভ হয়েছে এবং তার সঙ্গীদের কাছে সেই অভিজ্ঞতাকে সে শব্দের সাহায্যে জানাতে চায়। সে বলতে চায় 'আমি একটা গোলাপ দেখেছি'। কিন্তু 'গোলাপের' একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক অর্থ বা অর্থগুচ্ছ আছে, এবং আমাদের ধরে নিতে হয় যে গোলাপ সম্পর্কে তার এমন একটা অভিজ্ঞতা ঘটেছে যার সঙ্গে গোলাপ সম্পর্কে সমাজের পূর্ববর্তী যেসব অভিজ্ঞতা ঐ শব্দ এবং তার ইতিহাসের মধ্যে বিধৃত আছে সেগুলির সঙ্গে কোনও সাযুজ্য (correspond) নেই। সুতরাং গোলাপ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতাটি 'গোলাপ' এই শব্দটির প্রতিষেধ (negation), সেটি 'গোলাপ নয়' —তার অভিজ্ঞতার মধ্যকার এমন যাবতীয় জিনিস যা 'গোলাপ' শব্দটির বর্তমানে প্রচলিত সামাজিক অর্থের মধ্যে প্রকাশিত নয়। সেইজন্য সে বলে—'আমি একটা গোলাপ দেখেছি যা অমুকের মত'—আর তারপর আসে একটা রূপক বা একটা বিশেষণ— 'একটা স্বর্গীয় গোলাপ' বা এক সুমধুর বাকালঙ্কার (euphemism)—'আমি এক কুসুমিত রক্তিমা দেখেছি।' প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটা সংশ্লেষণ ঘটছে, কারণ তার নতুন অভিজ্ঞতাটি সমাজের পুরাতন অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে সামাজিকভাবে সংযুক্ত হয়ে (fused) উঠেছে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে দুটিই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। 'গোলাপ' শব্দটির সমস্ত অতীত অর্থ থেকে তার নিজের অভিজ্ঞতাটি বর্ণসঞ্চয় করেছে। কারণ লোকে যখন তার কবিতাটি পড়বে তখন তাদের মনে সেগুলি উপস্থিত থাকবে এবং তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও 'গোলাপ' শব্দটি তখন বর্ণসঞ্চয় করবে, কারণ ভবিষ্যতে লোকেরা যখন 'গোলাপ' শব্দটির সম্মুখীন হবে তখন তাদের মধ্যে তার ওই কবিতাটিও থাকবে।

কিন্তু কবির অভিজ্ঞতাটি সমাজের ঐতিহ্য থেকে ভিন্ন ধরনের হয়েছিল কেন? কারণ তাঁর পরিবেশের সেই প্রস্থচ্ছেদ যাকে আমরা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতা বলি তা ভিন্ন ছিল। কিন্তু গোটা সমাজের শিল্পকে সামগ্রিকভাবে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রস্থচ্ছেদগুলির সমষ্টি হিসাবে যদি আমরা গণ্য করি তাহলে একদিকে আমরা পাই পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার গড়পড়তা রূপ এবং গড়পড়তা মানুষ বা গড়পড়তা

জনিরূপটিকেও (genotype)। এখন নতুন শিল্পের নিয়ত উদ্ভবের অর্থই হল এই যে পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে যাতে করে মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলিও পরিবর্তিত হচ্ছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সামাজিক সচেতন সূত্রায়নগুলি যে অপর্যাপ্ত এবং সেগুলির পুনর্সংশ্লেষণের যে প্রয়োজন এটাও সে নিয়ত দেখতে পায়। এইভাবে শিল্পগত রূপগুলি যদি অপরিবর্তিত ও ঐতিহ্যবাহী হয়ে থাকে, যেমন চীনা সভ্যতায় দেখা যায়, তাহলে এটা সুস্পষ্ট যে, পরিবেশ অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কগুলি গতিহীন হয়ে আছে। সেগুলির যদি অবক্ষয় ঘটে তাহলে বুঝতে হবে যে পরিবেশের অবনতি ঘটেছে, যেমন বর্তমান বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে দেখা যাচ্ছে। যদি সেগুলির উন্নতি ঘটে তাহলে বুঝতে হবে ব্যাপারটা বিপরীত। কিন্তু শিল্পীর মূল্য ত আত্ম প্রকাশের [self expression] মধ্যে নয়। তাই যদি হত তাহলে যে সংশ্লেষণের [synthesis] মধ্যে পুরাতন সামাজিক সূত্রায়নগুলির সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংযুক্তি ঘটবে এমন সংশ্লেষণের জন্য সে সংগ্রাম করতে যাবে কেন? সামাজিক আচারবিধিকে অগ্রাহ্য করে সরাসরি চীৎকার, চেঁচামেচি লাফাঝাঁপি করে নিজেকে প্রকাশ করলেইত হয়! তা হয় না। কারণ, প্রথমতঃ, বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত প্রকাশ বলে একটা ব্যাপার আছে, এটা মনে করাটাই হল এক পুরাতন বুর্জোয়া বিভ্রম। এও নয় যে সমাজের মঙ্গলের কারণে শিল্পী মহত্বের সঙ্গে নিজের আত্ম-প্রকাশকে একটা সামাজিক ছাঁচের মধ্যে জোর করে প্রবেশ করান। দুটি মনোভাবই হল সেই পুরাতন বুর্জোয়া ভ্রান্তযুক্তির নিছক প্রকাশ যে নিজের সহজ প্রবৃত্তিকে অবাধে প্রকাশ করার মত স্বাধীনতা মানুষের আছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পী নিজেকে শিল্পগত রূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে না, সে তার মধ্যে নিজেকে দেখতে পায়। তার অবাধ আত্ম-প্রকাশকে সামাজিকভাবে প্রচলিত করার জন্য তাতে সে ভেজাল মেশায় না; শিল্পের মধ্যে নিহিত সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যেই মাত্র সে অবাধ আত্ম-প্রকাশের সন্ধান পায়। তা হলে শিল্পীর কাছে শিল্পের মূল্য এই যে সেটা তাকে স্বাধীন করে। শিল্পের মূল্য তার কাছে আত্ম-প্রকাশ বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা আত্মসত্তার প্রকাশ নয়, সেটা হল একটা সত্তাকে আবিষ্কার। সেটা হল সত্তাকে সৃষ্টি করা। সমাজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ করতে গিয়ে, সামাজিক সম্পর্কের ছাঁচের মধ্যে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তাকে (innerself) জোর করে প্রবেশ করাতে গিয়ে শিল্পী কেবল মাত্র একটা নতুন ছাঁচই (mould) সৃষ্টি করে না, সামাজিক দিক থেকে একটা মূল্যবান উৎপন্নই শুধু সৃষ্টি করে না, নিজের সত্তাকেও সে নতুন ছাঁচ দেয় ও তাকে সৃষ্টি করে। যে মূক অখ্যাত মিলটনের একটা কথা লোকে বলে সেটা ভ্রান্তযুক্তি। মিলটনরা জন্মান না, তাঁদের তৈরী করা হয়।

সমাজের কাছে শিল্পের মূল্য হল এই যে তার দ্বারা একটা আবেগগত অভিযোজন [adaptation] সম্ভবপর। শিল্পের মধ্যে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলি বাস্তবের পরিবর্তিত ছাঁচের মধ্যে জোর করে প্রবেশ করানো হয় এবং এইভাবে উৎপন্ন আবেগগুলির এক বিশেষ সংগঠনের সাহায্যে একটা নতুন প্রতিন্যাস, একটা অভিযোজন দেখা দেয়।

পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্ক ও অচল হয়ে পড়া চেতনার মধ্যকার এই চাপ [tension] থেকেই যাবতীয় শিল্পের সৃষ্টি। নতুন শিল্প কেন যে সৃষ্ট হয়, পুরাতন শিল্প কেন যে শিল্পী বা রসিক কাউকেই তৃপ্ত করতে পারে না তার কারণ এই যে তা কোনও না কোনও ভাবে বর্তমানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। পুরাতন শিল্পের অর্থ সব সময়ই আমাদের কাছে থাকে, কারণ সহজ প্রকৃতিগুলি আবেগোদ্দীপকের উৎসগুলি পরিবর্তিত হয় না। কারণ সামাজিক সম্পর্কের কোনও নতুন ব্যবস্থা [system] পুরাতনকে বর্জন করে না, বরং তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। নতুন শিল্পও আমাদের চাই।

আর নতুন শিল্পের উদ্ভব হল চাপ থেকে। এই চাপ দুটি রূপ নেয়। (১) একটা হল উৎপাদনশীল—বিবর্তনমূলক রূপ। যে দ্বন্দ্ব থেকে এই গতিশীলতার জন্ম সেই দ্বন্দ্বকে শুধু মাত্র আরও বেশি সুস্পষ্ট রূপে সৃষ্টি করার সাহায্যেই উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির মধ্যকার চাপ সামগ্রিকভাবে সমাজের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে। এইভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের অবিরাম বিলোপ ঘটিয়ে তাকে সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক করে তুলে এবং এইভাবে বাজারকে স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট করে তুলে বুর্জোয়া সংস্কৃতি শিল্প-পুঁজিবাদের [industrial capitalism] বিকাশ ঘটিয়েছে। আর শিল্পের ক্ষেত্রে তা ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম দিয়েছে। তার শ্রেষ্ঠ রূপ দেখা যায় শেক্সপীয়রের মধ্যে। সেটা ছিল একটা ইতিবাচক মূল্য। কিন্তু তাকে যখন চরম মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখা গেল সুর-রিঅ্যালিজম, দাদাইজম ও স্টাইনবাদে শিল্প পুরাপুরি ভেঙ্গে পড়ছে।

(২) চাপটা এখন বিপ্লবাত্মক হয়ে উঠে। কারণ উৎপাদন-সম্পর্কগুলি উৎপাদিকা শক্তির উপর বাধা হয়ে উঠল এবং তাদের মধ্যকার চাপ এখন উৎপাদিকা শক্তিগুলি যাতে আরও ভালোভাবে প্রবাহিত হয় উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে সেই দিকে পরিবর্তিত করার বদলে বিপরীত ফল দিতে থাকল। উৎপাদন সম্পর্কগুলিকে আরও বেশি করে প্রতিষেধের দিকে নিয়ে চলল, চাপকে আরও সক্রিয় করে তুলল এবং যে বিস্ফোরণ পুরাতন উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে চূর্ণ করে ফেলবে এবং সেগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম করবে সেই বিস্ফোরণকে গড়ে তুলতে

থাকে। সেটা বিধিবহির্ভূতভাবে [arbitrarily] ঘটবে না, বরং একটা ছক [pattern] অনুযায়ী তা হবে, আর সেই ছকটি নির্ধারিত হবে চাপের পরিস্থিতি অনুযায়ী। এইভাবে শিল্পের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও শিল্পীর পরিবেশের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও বিপর্যয়ের মধ্যকার চাপ,স্বপ্নের অবাধ অনুসরণ আর নৈরাজ্যমূলক বাস্তবের কঠিন আঘাতের মধ্যকার চাপ, শিল্পীর স্বপ্ন চূর্ণ করে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয় এবং শিল্পীকে তার নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জগতের দিকে তাকাতে বাধ্য করে। কেবল শিল্পী হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবে, নাগরিক হিসাবে, সমাজতাত্ত্বিক হিসাবেও জগতের দিকে তাকাতে তাকে বাধ্য করে। শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয় এমন সব জিনিস সম্পর্কেও আগ্রহী হতে তা শিল্পীকে বাধ্য করে ; যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও দর্শন। প্রথম দিকের বুর্জোয়া নবজাগরণের সময় ঠিক এই রকমই ঘটেছিল। তা লিওনার্দো দাভিঞ্চির মত 'চৌকস মানুষ' সৃষ্টি করেছিল। শিল্পের পক্ষে এটা ভালো কি মন্দ সে কথা আলাদা। বুর্জোয়া সংস্কৃতির মত বুর্জোয়া শিল্পও মৃতকল্প, আর এই প্রক্রিয়াটি শিল্পের পুনর্জন্মের পূর্ববর্তী পর্যায়ের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক। আর এই অন্তর্বর্তী অধ্যায়টির কারণে নতুন শিল্পটির যখন উদ্ভব ঘটবে তখন তা সমগ্র সামাজিক প্রক্রিয়ার একটা অংশ হিসাবে নিজের সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন এক শিল্প হবে, তা হবে কমিউনিস্ট শিল্প। লরেন্স, জিদ, আরাগঁ, দস পাসোস, এলিয়ট প্রমুখ আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য কোনও শিল্পীই 'বিশুদ্ধ' শিল্পী হয়ে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন না। তাঁদের ভবিষ্যদ্বক্তা, চিন্তাশীল ব্যক্তি (thinkers), দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ, সামগ্রিকভাবে জীবন ও সামাজিক বাস্তব সম্পর্কে আগ্রহী মানুষও হতে হচ্ছে। তাঁদের যে একটা বলার কথা আছে সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন। এটা হল শিল্পের উপর বিপ্লবী অধ্যায়ের অপরিহার্য প্রভাব এবং এখান থেকে পালিয়ে 'বিশুদ্ধ' শিল্পের মধ্যে গিয়ে, গজদন্তমিনারে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া সম্ভবপর নয় ; কারণ বিশুদ্ধ শিল্পই এখন আর নেই। হয় সেই পর্যায় পার হয়ে গেছে, না হয় সে পর্যায় এখনও সুরুই হয়নি।

কিন্তু বিপ্লবের সময় দুটি পথের সম্ভাবনা থাকে। বিবর্তনের কালেও তাই — কেউ স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ক্লাসিক্যালপন্থী, আকাদেমিক ও নিষ্ফলা হতে পারেন, কেউ আবার এগিয়ে যেতেও পারেন। কিন্তু বিপ্লবের সময় দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয় ; হয় এগিয়ে যেতে হবে, না হয় পিছিয়ে। আমাদের কাছে এটা দেখা দেয় ; কমিউনিজম আর ফ্যাসিজমের মধ্যে বেছে নেওয়া হিসাবে হয় ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করতে হবে, না হয়ত ফিরে যেতে হবে পুরাতন আদিম মূল্যে, পুরাণ, বর্ণ-বিদ্বেষবাদ, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিপূজাতত্ত্ব এবং পার্টিসিপেশন মিস্টিকতত্ত্বে।

স্নায়ুরোগী বা নিউরোটিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন এক পূর্বতন অভিযোজনের স্তরে প্রত্যাবৃত্তি (regression) দেখা যায় এই ফ্যাসিষ্ট শিল্পও সেই রকম।

আজকের দিনে বিশুদ্ধ শিল্পীর অস্তিত্ব যে থাকতে পারে না এবং শিল্পীকে যে সেই রকম মানুষ হতেই হবে যিনি নগদমূল্যের সম্পর্ক ও বাজারকে ঘৃণা করবেন এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে গভীরভাবে আগ্রহী হবেন, এই বিষয়ে লরেন্স রীতিমত অবহিত ছিলেন। শিল্পী হিসাবে লরেন্সের গুরুত্ব এইখানেই। তা ছাড়া, শিল্পীকে এমন মানুষ হতেই হবে যিনি মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলি যে অবস্থায় রয়েছে কেবল মাত্র সেইটুকুতেই যে গভীরভাবে আগ্রহী হবেন তাই নয়, সেগুলির পরিবর্তন ঘটাতেই তিনি আগ্রহী। সেগুলি যেভাবে বর্তমান তাতে তিনি অসন্তুষ্ট এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে নতুনতর ও পূর্ণতর মূল্য তিনি দাবি করেন।

কিন্তু লরেন্সের চরম ট্র্যাজেডি হল এই যে তাঁর সমাধানটা শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদী, সাম্যবাদী নয়। সেটা হল প্রত্যাবৃত্তিধর্মী। লরেন্স চাইলেন আমরা যেন অতীতে ফিরে যাই, 'মা'তে ফিরে যাই। মানুষের অসন্তোষকে তিনি দেখলেন গর্ভরজ্জুর যোগসূত্রে ফিরে যাওয়ার জন্য সোলার প্লেক্সাসের ব্যাকুলতা হিসাবে এবং তীব্র যৌন ভালোবাসার জায়গায় মায়ের সঙ্গে ভ্রূণের অচেতন মাংসল একাত্মীকরণকে (identification) স্থাপন করার দাবি জানালেন। এসব কিছুই হল প্রত্যাবৃত্তির, নিউরোসিসের, আদিমস্তরে ফিরে যাওয়ার প্রতীক স্থানীয়।

আজকের ইউরোপ যে মৃতকল্প, এটা লরেন্স অনুভব করেছিলেন। এবং সেই জন্য মেক্সিকো, এত্রুরিয়া ও সিসিলির মত অস্তিত্বের অন্যান্য ধরনের রূপের দিকে তিনি মুখ ফিরিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের এমন এক ব্যবস্থার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বা পেয়েছেন বলে মনে করেছিলেন যার মধ্যে জীবন আরও সহজভাবে, আরও অর্থপূর্ণভাবে প্রবাহিত। বুর্জোয়া ইউরোপের জীবন দখলদারি মনোভাব ও যুক্তিধর্মিতায় পরিব্যাপ্ত এবং ফলে তা দেহের সাধারণ প্রয়োজনগুলির ব্যাপারে বিকল হয়ে পড়েছিল বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছিল। যে সভ্যতা সচেতনভাবে এবং সচেতন হওয়ার কারণেই—মানুষের শক্তির আদি উৎস সেই সহজপ্রবৃত্তিধর্মী প্রবাহের বিরুদ্ধাচরণ করে, সেই সভ্যতার বিরুদ্ধে লরেন্স বার বার নানাভাবে এই অভিযোগ করেছেন। লরেন্স যৌনতার ধর্ম প্রচার করছেন একথা মনে করা ভুল। যৌনতায় বুর্জোয়া ইউরোপের সাধ মিটে গেছে। লরেন্সের শিক্ষা যে আগ্রহ ও আবেগগত সমর্থন পেয়েছিল তাকে যৌনপূজা আর এখন আকৃষ্ট করে না। লরেন্সের উপদেশ ছিল বিশুদ্ধ সমাজবিদ্যাগত। এমনকি যৌনতাও তাঁর কাছে বড় বেশি সচেতন ব্যাপার ছিল।

"আমার উপন্যাস (লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার) একটা নোংরা যৌন উপন্যাস— একথা যে বলে সে মিথ্যাবাদী। এটা যৌন উপন্যাসই নয় : এটা লৈঙ্গিক (phallic)। যৌনতা একটা ব্যাপার যার অস্তিত্ব হল মস্তিষ্কে ; এর প্রতিক্রিয়াগুলি মস্তিষ্কগত ; আর তার প্রক্রিয়াগুলি মানসিক। অপরদিকে লৈঙ্গিক বাস্তব হল উষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত..."

আর এক জায়গায় লিখেছেন : "আমার আদিম সামাজিক প্রবৃত্তির (societal instinct) চরম আশাভঙ্গই আমাকে পীড়া দেয় ·· সামাজিক প্রবৃত্তিগুলিকে যৌন সহজপ্রবৃত্তিগুলির থেকে অনেক বেশি গভীর এবং সামাজিক অবদমনগুলি [societal repression) আরও অনেক বেশি বিপর্যয়কারী বলে আমি মনে করি। ব্যক্তিগত অহং, আমার নিজের এবং অন্য সকলের ব্যক্তিগত অহং আমার মধ্যে যে সামাজিক মানুষ রয়েছে তাকে যতখানি অবদমিত করে তার সঙ্গে যৌনধর্মী ব্যক্তির অবদমনের কোনও তুলনা হয় না। এমন কি আমি আমার নিজের স্বকীয়তার (individuality) জন্যই ক্লান্ত, আর অন্যদের স্বকীয়তাও আমার কাছে বিশ্রী ব্যাপার।"

বুর্জোয়া সংস্কৃতির কুফল সম্পর্কে তাঁর আরও একটি বিশ্লেষণ হল : (কর্নিশ জনসাধারণের মধ্যে)

'পুরাতন জাতি এখনও প্রকাশ পাচ্ছে। এরা এমন এক জাতি যারা এক মানুষের উপর আর এক মানুষের যাদুধর্মী অতিক্রমণে [magic transcendency] বিশ্বাস করত। ব্যাপারটা দারুণ চিত্তাকর্ষক। রক্তের ভিতরের অন্ধকার, উষ্ণতা এবং আকস্মিক ও হিসাবের অতীত অতিরাগধর্মিতার সেই পুরাতন ইন্দ্রিয়বেদিতার কিছুটা এখনও দেখা যায়। অথচ তারা কীটপতঙ্গের মত, নিরুত্তাপ হয়ে পড়েছে, কেবল অর্থের জন্য, আবর্জনার জন্য মাত্র বেঁচে আছে। এ ব্যাপারে তারা জঘন্য। তাদের মরে যাওয়াই উচিত।'

তাহলে, একটা পরিষ্কার শিল্পগত অর্থাৎ আবেগগত বিশ্লেষণ এখানে পাওয়া যাচ্ছে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলির অবক্ষয় সম্পর্কে। অর্থের জন্য তারা বেঁচে আছে, সামাজিক প্রবৃত্তিটা অবদমিত ; এমন কি যৌনসম্পর্কগুলিও নিরুত্তাপ ও দূষিত হয়ে পড়েছে। যে সংস্কৃতিতে মানুষে মানুষের সম্পর্কগুলি মানুষ ও সামগ্রীর মধ্যকার সম্পর্ক, মানুষ ও আবর্জনার মধ্যকার সম্পর্ক হয়ে উঠেছে সেই সংস্কৃতিতে মানুষে মানুষে বর্বরস্তরের সামাজিক সম্পর্কগুলির (মানুষের উপর মানুষের 'যাদুধর্মী অতিক্রমণ) এই টিঁকে থাকাটা মূল্যবান হয়ে ওঠে।

লরেন্স কিন্তু সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যেই এর কারণ অনুসন্ধান করলেন না,

সেগুলি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার মধ্যে তার অনুসন্ধান করলেন। তাহলে ত সহজপ্রবৃত্তিমূলক জীবন যাত্রায় ফিরে যাওয়ার মধ্যেই ব্যক্তির চাহিদাগুলির সমাধানের সন্ধান করতে হয়। কিন্তু সহজপ্রবৃত্তিমূলক জীবনযাত্রায় আমরা ফিরে যাব কি করে? চেতনাকে পরিত্যাগ করে; যে পথ বেয়ে এসেছি সেই পথ দিয়েই আমাদের ফিরে যেতে হবে। কিন্তু বৌদ্ধিকতা ত এই যে, বাস্তবের খণ্ডগুলিতে আমরা হয় ভাষাগত দিক থেকে, না হয় আকারপ্রদ (plastically) দিক থেকে, না হয় মানসগত দিক থেকে, একটা প্রতীকধর্মী প্রক্ষেপ (projection) দান করি, আর চেতনা বা চিন্তন হল এই প্রতিরূপগুলিকে বা শব্দমূলক উৎপন্নগুলিকে শুধু হেরফের করা। সুতরাং বৌদ্ধিকতা ও চেতনাকে যদি আমাদের পরিত্যাগ করতে হয় তার অর্থ হল সমস্ত প্রতীকধর্মিতা ও যুক্ত্যাভ্যাসকে [rationalisation] সমূলে পরিত্যাগ করতে হবে; আমাদের **সত্তাবিশিষ্ট হতেই হবে** [we must be] এবং চিন্তা করলে আর চলবে না, এমন কি প্রতিরূপের মধ্য দিয়েও চিন্তা করলে আর চলবে না। অথচ পক্ষান্তরে লরেন্স তাঁর মতবাদকে বার বার বৌদ্ধিক পরিভাষায় অথবা চিত্রকল্পের পরিভাষায় সচেতনভাবে সূত্রায়িত করেছেন। কিন্তু এটা স্ববিরোধিতা : কারণ বৌদ্ধিক দিক থেকে এবং সচেতনভাবে চেতনা থেকে আমাদের কি করে **ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব**? এমন কি লরেন্স যখন চেতনাকে পরিত্যাগ করতে আমাদের তাগিদ দেন তখনও তিনি আমাদের চেতনাকেই প্রসারিত ও উন্নীত করার চেষ্টা করেন।

চেতনাকে পরিত্যাগ করা একমাত্র সম্ভব কর্মের [action] মধ্যে, আর ফ্যাসিবাদের প্রথম কর্মই হল সংস্কৃতিকে চূর্ণ করা এবং পুস্তকের বহ্ন্যুৎসব করা। কোনও শিল্পী ও চিন্তাশীল মানুষের পক্ষে সেই জন্য সুসংগতিপূর্ণ ফ্যাসিস্ট হওয়া অসম্ভব। লরেন্সের মত তিনি কেবল এক স্ববিরোধী ব্যক্তিই হতে পারেন। চেতনাকে পরিত্যাগ করার জন্য লরেন্স মানুষের চেতনার কাছেই আবেদন জানিয়েছেন।

চেতনাকে চিন্তনের সঙ্গে এবং অচেতনতাকে অনুভূতির সঙ্গে একগোত্রভুক্ত করার কারণে এখানে একটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এটা ভুল। দুটিই সচেতন। অচেতন আবেগোদ্দীপক বা অচেতন আবেগ কারও কখন ছিল না বা কারও থাকতেও পারে না। বাস্তবিক পক্ষে অনুভূতিই অচেতন স্মৃতিপথচিহ্নগুলিকে [memory traces] সচেতন করে তোলে এবং সেগুলিতে উত্তাপ সঞ্চার করে তাদের চিন্তা করে তোলে। গভীর অনুভূতির সময়, সেটা শিল্পগত বা আবেগগত অনুভূতি যাই হোক না কেন, আমরা সকলেই আমাদের মধ্যে প্রায় একটা শুভ্র আলোকের মত এক তীব্র ও স্পষ্ট উন্নীত চেতনা বোধ করি। কিন্তু লরেন্স এটা কখনও সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য

করেননি এবং বরাবর অচেতনতাকে অনুভূতির আর চেতনাকে বুদ্ধিবৃত্তির সমগোত্রীয় করেছেন। উদাহরণস্বরূপ—

"রক্তমাংসের শরীর বুদ্ধিবৃত্তির থেকে বিজ্ঞতর, এই বিশ্বাসই আমার বড় ধর্ম। আমাদের মন ভুল করতে পারে। কিন্তু আমাদের রক্তমাংস যা অনুভব করে যা বিশ্বাস করে, যা বলে-তা সর্বদা সত্য। বুদ্ধিবৃত্তি কেবল একটা লাগাম-কড়া মাত্র। জ্ঞান দিয়ে আমার কি হবে? আমি যা চাই তা হল আমার রক্তের ডাকে সাড়া দিতে, সরাসরি; মন বা নীতি বা অন্য যা কিছুই হোক না কেন, তার হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে। মানুষের দেহ'ক এক ধরনের শিখার মত, বাতির শিখার মত সদা ঊর্ধ্বমুখী অথচ প্রবহমান বলে আমি মনে করি: আর বুদ্ধিবৃত্তি হল আলোকের মত, যা আশপাশের সব কিছুর উপর এসে পড়ে। ভগবান জানেন কোথা থেকে আর কিভাবে তা আসে। আর এই আলো নিজে যা তাই হওয়ার কারণে (being itself) তার চারপাশে যা কিছু থাকে তাকেই আলোকিত করে তোলে। আমরা এত হাস্যকর ভাবে মনসর্বস্ব হয়ে পড়েছি যে আমরা যে নিজেরা কিছু একটা সেটা আর কখনই মনে থাকে না। আমরা মনে ক'রি বুঝি সামগ্রীগুলিই কেবল রয়েছে, আর আমরা তাদের আলোকিত করছি। আর এদিকে শিখা বেচারা অবহেলিত হয়ে জ্বলতেই থাকে এই আলো সৃষ্টি করার জন্য। আমাদের বাইরের এই পলাতক, অর্ধ-আলোকিত সামগ্রীর মধ্যে রহস্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ানোর বদলে আমাদের উচিত নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখা এবং বলে ওঠা: "হায় ভগবান, এই ত আমি!" আর এইজন্যই ইতালিতে থাকতে আমি এত ভালোবাসি। লোকেরা সেখানে এত অসচেতন। তারা কেবল অনুভব করে আর চায়, তারা জানে না। আর আমরা বড় বেশি জানি। না, না, আমরা শুধু মনে করি যে আমরা এত কিছু জানি। একটা টেবিলের উপরের দু দশটা জিনিসকে কেবল আলোকিত করে তোলে বলেই শিখাকে আমরা শিখা বলি না। সেটা শিখা বলেই তাকে আমরা শিখা বলি। আর আমরা নিজেদেরই ভুলে গিয়েছি।"

অনুভূতি ও চিন্তন পরস্পরকে সাহায্য করে ও পরস্পরকে উন্নীত করে। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর থেকে মানুষ আরও গভীরভাবে অনুভব করে, কারণ মানুষ আরও বেশি চিন্তা করে। এগুলিকে মূলতঃ অসম্পৃক্ত বলে মনে করার মত ভুল লরেন্স কেন করলেন এবং অনুভূতিকে কেন তিনি অচেতনতার সমগোত্রীয় করলেন? এবারেও উত্তরটা পাওয়া যাবে বর্তমান সমাজের প্রকৃতির মধ্যে। চেতনার কোনও খণ্ড আদৌ গড়ে তোলার জন্য যাবতীয় অনুভূতি ও যাবতীয় চিন্তনের মধ্যে পরস্পরের কিছুটা অংশ অবশ্যই থাকা দরকার। কিন্তু কোন কোন সচেতন প্রতিভাসকে

[phenomena] মুখ্যতঃ অনুভূতি বা তার বিপরীত হিসাবে, সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেখা সম্ভব। 'বিশুদ্ধ' চিন্তার মত 'বিশুদ্ধ' অনুভূতিরও আদৌ কোনও অস্তিত্ব নেই, যেহেতু তা হলে বিশুদ্ধ অনুভূতি হত নিছক সহজপ্রবৃত্তিগত প্রবণতা, আর অন্যটি হত কেবলমাত্র স্মৃতিসহায়ক পথচিহ্ন। দুটিই হত অচেতন, আর সেইজন্য কেবল মাত্র আচরণের মধ্যেই তার সাক্ষ্য পাওয়া যেত। লরেন্স এটাও বোঝাতে পারতেন যে আধুনিক পরিস্থিতিতে অনুভূতি রুদ্ধগতি হয়ে পড়েছে এবং আমাদের চেতনার অনুভূতিগত ভিত্তিকে আমাদের প্রসারিত করতেই হবে।

অনুভূতি (এবং সাধারণভাবে আবেগোদ্দীপক) সম্পর্কে এটা আমরা জানি যে সহজাত প্রতিক্রিয়ার [innate responses] সঙ্গে অভিযোজিত হয়ে তারা চেতনায় প্রবেশ করে—বা আরও আলগাভাবে বলতে গেলে—অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং কর্মের মধ্যে 'সহজপ্রবৃত্তির' রূপান্তর [modification] থেকে তাদের জন্ম হয় বলে মনে হয়। অরূপান্তরিত কর্মের মধ্যে, একটা উদ্দীপককে যান্ত্রিকভাবে সাড়া দিয়ে সহজপ্রবৃত্তির নিষ্ক্রমণ হল অনুভূতিবর্জিত, সেটা বিশুদ্ধ স্বতঃক্রিয়া। একমাত্র যখন সেটা স্মৃতিপথচিহ্ন দ্বারা রূপান্তরিত হয়, বা কর্ম দ্বারা রুদ্ধগতি হয় কেবল তখনই তা সচেতন হয়ে ওঠে এবং অনুভূতি হিসাবে দেখা দেয়। যে প্রাণী যত বেশি বুদ্ধিমান, যার আচরণ অভিজ্ঞতার দ্বারা যত বেশি রূপান্তরযোগ্য, তত বেশি অনুভূতি সে প্রকাশ করবে। অনুভূতির এই অতিরিক্ত প্রকাশের কারণ এই যে সেই প্রাণী আরও বেশি বুদ্ধিমান, আরও বেশি সচেতন, বংশগতি দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম প্রভাবিত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা আরও বেশি প্রভাবিত হওয়ার যোগ্য। অভিজ্ঞতা দ্বারা সহজাত প্রতিক্রিয়াগুলির রূপান্তরের অন্তর্নিহিত অর্থ কেবল এইটুকুই যে, স্নায়ু কণিকার [neurones] উপর প্রধানত: গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্তর বা কর্টেক্সের স্নায়ুকণিকার উপর, পূর্ববর্তী আচরণ একটা স্মৃতিসহায়ক পথচিহ্ন রেখে যায়। স্নায়বিকশক্তি প্রাপ্ত হলে এগুলি একটা ছক (pattern) তৈরি করে যেগুলির রূপান্তর গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্তর অঞ্চলে চিন্তার 'রূপ নেয়' আর আন্তর্যন্ত্রীয় (visceral) ও থ্যালামাস অঞ্চলে অনুভূতির বা আবেগগত গতিশীলতার রূপ নেয়। উপাদানগুলির বিভিন্ন অনুপাতের দ্বারা সেগুলিকে আমরা চিন্তা বলব, না অনুভূতি বলব তা নির্ধারিত হয়। এমন কি সরলতম চিন্তাও আবেগোদ্দীপক দ্বারা বিকিরিত; আবার সরলতম আবেগের সঙ্গেও চিন্তা যুক্ত থাকে। সেটা যে শব্দ দিয়ে গড়া হতেই হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু 'আমি আহত' বা 'একটা বেদনা'—এই ধরনের একটা বৈশিষ্ট্য তাতে থাকে। অভিজ্ঞতার সাহায্যে সহজাত প্রতিক্রিয়ার যে রূপান্তর ঘটে সেই একই রূপান্তর থেকে চিন্তা ও অনুভূতির

উদ্ভব হয়। এর ফলে বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা আচরণের (behaviour) রূপান্তর ঘটানোর সামর্থ্যের (capacity) বিকাশের সঙ্গে আবেগের জটিলতা, সমৃদ্ধি ও গভীরতা এক নিয়ত বৃদ্ধি যুক্ত থাকে। এটা পরিষ্কার যে হোমো সাপিয়েনদের মধ্যে সভ্যতার বিকাশ যত ঘটেছে সেই সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও বেদনা (pain and pleasure) সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ানুভূতিও নিয়ত বাড়তে থেকেছে। এ হল সভ্য মানুষের সেই বিখ্যাত 'সংবেদনশীলতা' ('sensitiveness'), উন্নত সংস্কৃতির 'বিলাস' যা তাদের শিল্প এবং শব্দসম্ভারের মধ্যেও প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে, আদিম মানুষের মধ্যে কেবল সূক্ষ্ম আবেগের প্রতিই নয়, এমনকি স্থূলতর আবেগের প্রতিও তাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির [Sensibility] ক্ষেত্রে এক সুস্পষ্ট ঘাটতি দেখা যায়। অনেক পর্যবেক্ষক অতিসরলভাবে (naively) ? মনে করেন যে বন্য সমাজে [savage] নৃত্যের অতি-কামাত্মক চরিত্রটা বুঝি আদিবাসীদের আবেগগত উত্তেজনার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির (erethism) কারণে ঘটে। কিন্তু তা নয়, ব্যাপারটা বিপরীত। তাদের অপ্রচুর ইন্দ্রিয়ানুভূতির কারণে তাদের মধ্যে কামাত্মক উত্তেজনা অতি শক্তিশালী উদ্দীপনার দ্বারাই একমাত্র জাগিয়ে তোলা যায়। অপর পক্ষে সভ্য মানুষের অনেই বিচলিত আবেগকে সামান্য একটা উদ্দীপকই জাগিয়ে তোলে। দুঃখের ব্যাপারে আদিম মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অভাবের মধ্যেও একই প্রক্রিয়া দেখা যায়। সুতরাং, যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি সেই পথ ধরেই যদি আমাদের আদিম অবস্থায়, রক্তের ডাকের কাছে, দেহের ডাকের কাছে ফিরে যেতে হয় তাহলে তার অর্থ হল স্বল্পতর ও স্থূলতর চিন্তাতেই কেবল ফিরে যাওয়া নয়, তা হল স্বল্পতর ও স্থূলতর অনুভূতিতেও ফিরে যাওয়া, এক হ্রস্বীকৃত চেতনায় ফিরে যাওয়া। যেহেতু তার মধ্যে অনুভূতি ও চিন্তা, সমৃদ্ধি ও জটিলতার দিক থেকে স্বল্পতর সেই কারণেই সেগুলি আরও বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সংমিশ্রিত হবে; আর শেষ পর্যন্ত যখন দুটিই সম্পূর্ণভাবে মিশ্রিত হয়ে এক হয়ে যাবে, তখন তারা লোপ পেয়ে যাবে এবং অচেতন আচরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু এই লক্ষ্য কি করে একজন শিল্পীর কাছে মূল্যবান হতে পারে, যদি না তিনি নিজের সত্তার নিয়ম থেকে নিজেকেই বঞ্চিত না করেন ? শিল্প কোন অচেতন আচরণ নয়, তা হল সচেতন অনুভূতি।

আধুনিক সভ্যতায় অবশ্য অনুভূতি ও চিন্তার মধ্যকার অনুপাতকে পরিবর্তিত করে চিন্তাকে পরিবর্তিত না করে, বা চেতনাকে বিসর্জন না দিয়ে অনুভূতিকে বিস্তৃত করা সম্ভব। শিল্পের উদ্দেশ্যও ঠিক সেইটাই। কারণ, শিল্পী বাস্তবের ঠিক সেই সেই শব্দগত বা চিত্রগত প্রতিরূপগুলিকেই ব্যবহার করেন যেগুলি জ্ঞানের

(cognition) থেকে অনুভূতির দ্বারাই বেশি পূর্ণ এবং সেগুলিকে তিনি এমনভাবে সংগঠিত করেন যাতে আবেগোদ্দীপকগুলি পরস্পরকে শক্তিশালী করে তোলে ও এক দীপ্যমান সামগ্রীতে সংযুক্ত হয়ে ওঠে। ফলে, বর্তমান কালের চেতনার মধ্যে অনুভূতিমূলক উপাদানটিকে যে কোনও মূল্যে প্রশস্ত করতেই হবে, একথা যিনি বিশ্বাস করেন তাঁকে যাবতীয় চেতনাকে সংকুচিত করার কথা নয়, অনুভূতিমূলক চেতনাকে প্রশস্ত করার কথাই অবশ্য প্রচার করতে হবে এবং সেটা অর্জন করতে হবে। এই হল শিল্পের উদ্দেশ্য (mission)। শিল্প হল বাস্তব সম্পর্কে আবেগোদ্দীপককে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের (affective manipulation) করণ-কৌশল। লরেন্স যখন পুরাপুরি শিল্পী ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর প্রথম দিকের রচনায় তখন তিনি যা করতে চেয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়, সেই কাজটিই তিনি করেছিলেন। কোনও জায়গার মনোভাবকে বা প্রকৃত জনগণের আবেগকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে তিনি তখন লিপিবদ্ধ করেছিলেন। যতই তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা হয়ে উঠতে থাকলেন, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে উপদেশ প্রচার করতে থাকলেন ততই এই লক্ষ্য থেকে তিনি সরে যেতে থাকলেন।

তাহলে প্রথমে অনুভূতির স্বপক্ষে প্রারম্ভিক আক্রমণ সুরু করে পরে তিনি বিপরীত ভুলটি করলেন কি করে? শিল্পকে পরিত্যাগ করে কি করে প্রচারে মন দিলেন? প্রথম সিদ্ধান্তটিতে তিনি পৌঁছেছিলেন এই কারণে যে আধুনিক বুর্জোয়া সংস্কৃতি অনুভূতিকে উপবাসী রাখে। সামাজিক সম্পর্ক মানুষে মানুষের মধ্যে না থেকে সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে ওঠে। ফলে, তা কোমলতাবর্জিত হয়ে ওঠে। মানুষ নিজেকে ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত বলে অনুভব করে। তার যাবতীয় সহজ প্রবৃত্তি এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পরিবেশের সঙ্গে এক বিরাট অপ-অভিযোজন সে অনুভব করে। সামাজিক প্রবৃত্তির (societal instinct) অবদমন সম্বন্ধে লরেন্স যখন কিছু বলেন তখন এটা তিনি সুস্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষ করেন।

কিন্তু ব্যাপারটি এত দূর গড়িয়েছে যে সামাজিক সম্পর্কতে কোনও রকম দাগ-রাজি করে, শিল্পের মাধ্যমে পরিবেশের সঙ্গে সহজ প্রবৃত্তির কোনও রকম অভিযোজন ঘটিয়ে এই রোগের আরোগ্য সম্ভব নয়। সামাজিক সম্পর্কগুলিকেই নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। শিল্পী তাঁর সততার কারণেই চিন্তাশীল ও বিপ্লবী হয়ে উঠতে বাধ্য। সেই কারণে বিশুদ্ধ শিল্প নিয়ে, পুরাতন গণ্ডীর মধ্যে অনুভূতিমূলক চেতনার প্রসার ঘটিয়ে সন্তুষ্ট না থাকতে লরেন্স বাধ্য। সামাজিক সম্পর্কগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করে, একটা সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে চেষ্টা করতেই হবে। কিন্তু বিপ্লবী সমাধান মাত্র একটিই আছে। সামাজিক সম্পর্কগুলির পরিবর্তন ঘটাতেই

হবে,—আর সেটা করতে হবে চেতনাকে সংকুচিত করার জন্য নয়, তাকে প্রশস্ত করার জন্য। উচ্চতর অনুভূতির সন্ধান পেতেই হবে ; সংস্কৃতির উচ্চতর এক স্তরের মধ্যেই তাকে পেতে হবে।

স্বভাবতঃই অবক্ষয়ের যাবতীয় অধ্যায়েই যেরকম দেখা যায় সেই রকম বর্তমানেও বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে চেতনাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হতে থাকে এবং সত্তা তার সঙ্গে সংগ্রাম করে। আর এটাকেই মনে হয় চেতনা বুঝি অচেতনতাকে পঙ্গু করে তুলছে। বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের মধ্যকার এই ত্রুটিগুলি সবই নগদমূল্যের বন্ধন থেকে উদ্ভূত। নগদ মূল্যের বন্ধন অন্য সমস্ত সামাজিক বন্ধনের স্থান নিয়েছে। ফলে পারস্পরিক ভালোবাসা বা কোমলতা বা কৃতজ্ঞতা সমাজকে ধরে রেখেছে বলে মনে হয়না। মনে হয় অর্থই বুর্জোয়া দুনিয়াকে চালাচ্ছে। তার অর্থ হল এই যে বুর্জোয়া সমাজ স্বার্থপরতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। কারণ, অর্থ হল অধিকারভুক্ত সামগ্রীর প্রতি এক প্রাধান্যবিস্তারকারী সম্পর্ক। যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কের এই ব্যবসায় ভিত্তিক হয়ে ওঠার ফলে তা ঘনিষ্ঠতম আবেগকেও আঘাত করে এবং নারী ও পুরুষের ভিন্নধর্মী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা যৌন সম্পর্কগুলিও প্রভাবিত হয়। বুর্জোয়া সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা গুরুত্ব লাভ করে ও প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং তা ভালোবাসার ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। পুঁজিবাদী সমাজে অর্থ-নৈতিক সম্পর্কগুলি কেবল এই যে প্রত্যেক মানুষই সেখানে এক নৈর্ব্যক্তিক বাজারে নিজের নিজের জন্য সংগ্রাম করছে। সেই কারণে এমনকি সর্বাধিক 'পরার্থবাদী' আবেগগুলির সঙ্গেও ঈর্ষা, লোভ ও ঘৃণার অন্ধকার শক্তিগুলি মিশে যায় এবং সেগুলিকে দ্ব্যর্থক করে তোলে। আর এই অন্ধকার শক্তিগুলি দুনিয়াটাকে যেন ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে বলে মনে হয়।

কিন্তু এই নাটককে সমকালীন চেতনা ও পুরাতন সত্তার মধ্যকার সংগ্রাম হিসাবে দেখলে সেটা হবে সরলীকরণ। এ হল উৎপাদন-সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির মধ্যকার একটা সংঘাত। এ হল নিজ শিকল ছিন্ন করে মুক্ত হওয়ার জন্য চেতনার সমকালীন সূত্রায়ন এবং সমাজের অন্তর্নিহিত সুপ্ত চেতনাসহ সংগ্রামশীল ভবিষ্যৎ সত্তার যাবতীয় সম্ভাবনার মধ্যকার এক সংঘাত। বুর্জোয়া সভ্যতার মধ্যে এবং সেই কারণে বুর্জোয়া চেতনার মধ্যেই বুর্জোয়া ত্রুটিগুলি নিহিত। সেইজন্য মানুষ চায় বুদ্ধিবৃত্তির বিরোধিতা করতে, কারণ তার মনে হয় বুদ্ধিবৃত্তি তার শত্রু। এবং বুদ্ধিবৃত্তি বলতে যদি আমরা বুর্জোয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বুঝি তাহলে বাস্তবিকই ব্যাপারটা তাই। কিন্তু একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যেই এই ত্রুটির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। বুদ্ধিবৃত্তিকে অস্বীকার করার অর্থ হল রক্ষণশীলতার শক্তিগুলিকেই সাহায্য করা।

হাজারটা ভিন্নরূপে আমরা আজ বুদ্ধিবৃত্তির বিরুদ্ধে ইউরোপীয় বিদ্রোহকে দেখতে পাই।

যে কোনও সভ্যতায় চেতনার ভূমিকা হল সহজপ্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়াগুলিকে এমন ভাবে রূপান্তরিত করা যাতে সেগুলি সামাজিক সম্পর্কের চাকার মধ্যে অনায়াসে প্রয়োগ করে সেটিকে চালাতে পারে। অর্থ নয়, প্রকৃতপক্ষে সহজপ্রবৃত্তিই সামাজিক যন্ত্রের চাকাটা চালায়; যদিও বুর্জোয়া দুনিয়ায় সহজপ্রবৃত্তিগত সম্পর্ক কেবলমাত্র অর্থভিত্তিক থাতেই সক্রিয় হতে পারে। সেই কারণে সামাজিক সম্পর্ক যখন সমাজের শক্তিগুলির উপর একটা বাধা হয়ে ওঠে, সামাজিক সম্পর্ক ও সহজপ্রবৃত্তিগুলির মধ্যে তখন একটা সংঘাত অনুভূত হতে থাকে। মনে হয় অনুভূতিগুলি বুঝি বিকল হয়ে গিয়েছে, দুনিয়াটাই বুঝি কষ্টদায়ক এবং অনুভূতিকে তা আঘাত দেয়, তাকে দমন করে। মনে হয় বুঝি সহজপ্রবৃত্তিগুলি এবং সহজপ্রবৃত্তির যা উৎপন্ন, অর্থাৎ অনুভূতিগুলি পরিবেশের হাতে শাস্তি ভোগ করছে আর সেইজন্য সহজপ্রবৃত্তি ও অনুভূতিকে বুঝি 'তাদের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতেই' হবে, সেগুলির গৌরব বুঝি বাড়িয়ে তুলতেই হবে। এর ফলে সভ্য পরিবেশকে ভেঙে ফেলে, তাকে বর্জন করে যদি আরও বেশি আদিম কোন পরিবেশে ফিরে যেতে হয় তাতেও রাজি। লরেন্স যেমন গভীরতর অনুভূতিতে' ফিরে যেতে চেয়েছেন সেই ধরনের যাবতীয় দাবির মধ্যে এবং সুররিঅ্যালিস্টরা, হেমিংওয়েরা ও ফ্যাসিস্টরা যেরকম অচেতন 'মননের' আরাধনা করছেন, সে সবের মধ্যে আজকাল এই অনুভূতির গৌরব বাড়িয়ে তোলাটা সুস্পষ্ট। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটা হল শিশুসুলভ প্রত্যাবর্তন, যার ব্যাধিগত রূপটা দেখা যায় নিউরোসিসের মধ্যে।

এই প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে কিন্তু একটা প্রকৃত ত্রুটির আবিষ্কার জড়িত। সামাজিক চেতনা সামাজিক সত্তাকে পিছু থেকে টেনে রেখেছে; সহজপ্রবৃত্তিগুলি রুদ্ধগতি হয়েছে এবং পরিবেশের হাতে অনুভূতিগুলি সমৃদ্ধিহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু দাওয়াইটা সঠিক নয়। স্নায়ুরোগীকে শিশুসুলভ প্রত্যাবর্তনের সাহায্যে আরোগ্য করা যায় না, একথা আমরা জানি। এদিয়ে তার যেটুকু করা যায় তা হল এই যে, তার অচেতনতাকে সুনিশ্চিত করা যায় এবং তার থেকে দুঃখদায়ক চিন্তাগুলিকে সরিয়ে রাখা যায়, কিন্তু তার জন্য মূল্য দিতে হয় চেতনাকে নিম্নমানের করে এবং মূল্যগুলিকে রিক্ত করে। যে পথ বেয়ে এসেছি সেই পথ বেয়ে আদিম স্তরে ফিরে যাওয়ার দ্বারা সভ্যতার আরোগ্য বিধান করা যাবে না। নিম্নতর স্তরে তার অবক্ষয় সম্বন্ধে সে কেবল আরও বেশি অচেতনই হয়ে উঠতে পারে। স্নায়ুরোগী যখন সমস্যাগুলির শিশুকালসুলভ সমাধানে প্রত্যাবর্তন করে তখন সেটা শিশুকালের

থেকেও বেশি অস্বাস্থ্যকর। সেইরকম সভ্যতা যখন আদিমসমাজসুলভ সমাধানে প্রত্যাবর্তন করে তখন তা আদিম সমাজের জীবনের থেকেও বেশি অস্বাস্থ্যকর। এই দুইয়ের মাঝখানে যে ইতিহাস গড়ে উঠেছে সেই ইতিহাসই এই ধরনের সমাধানকে অবাস্তব করে তোলে। আদিম মানুষের কাছে এই সব সমস্যা কখনও ছিল না। প্রত্যাবর্তনধর্মীর কাছে সেই সব সমস্যার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে সে অবদমিত করেছে। এইসব লোকেরা আমাদের সেই অরণ্যের মধ্যে নিয়ে যাবে। নতুন তেজের কথা এরা প্রচার করছে না, প্রচার করছে পুরাতন অবক্ষয়।

তাহলে আরোগ্য হবে কি করলে? আমরা জানি যে নিউরোটিকের ক্ষেত্রেই হোক, আর সভ্যতার ক্ষেত্রেই হোক, দুটি ক্ষেত্রেই যে অচেতনতার গর্ত থেকে আমরা উদ্ভূত হয়েছি সেখানে পঙ্গুর প্রত্যাবর্তনের থেকে আরোগ্যটি আরও বেশি কষ্টসাধ্য ও সৃজনশীল কর্ম। পুরাতন অশ্লীল আচার-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত গুহার নানা রহস্য ও প্রাণহীন প্রতীকধর্মিতায় বদ্ধ ও পূতিগন্ধময় বায়ুতে আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন হবে না। আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে মুক্ত বায়ুতে।

পুরাতনের দ্বারে আমরা ফিরে যাব না, নতুনের দ্বারেই আমাদের যেতে হবে। কিন্তু নতুনের অস্তিত্ব এখনও ঘটেনি, তাকে আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। শিশু চায় গর্ভে ফিরে যেতে, কিন্তু তাকে সাবালক হতেই হবে এবং জীবনের কষ্টসাধ্য ও স্বাস্থ্যপ্রদ কর্তব্যের মুখোমুখি হতেই হবে। চেতনাকে পরিত্যাগ করলে আমাদের চলবে না, তাকে প্রশস্ত করতে হবে, অনুভূতিকে গভীর করে তুলতে ও বিরেচিত wiged করতে হবে এবং চিন্তাকে ভেঙে তাকে নতুন করে বিন্যস্ত করতে হবে। আর এই নতুন চেতনার অস্তিত্ব কোনও মেক্সিকোবাসী বা যোগী বা 'রক্তের টানের' জিম্মায় নেই। আমাদের নিজেদেরই তাকে গড়ে তুলতে হবে। বাস্তবের সঙ্গে এই সংগ্রামে, যেখানে সহজপ্রবৃত্তি, অনুভূতি ও চিন্তা প্রতিটিই অংশগ্রহণ করে ও পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে, সহজপ্রবৃত্তিগুলি নিজেরাই যাবে পরিবর্তিত হয়ে এবং চেতনার মধ্যে নতুন চিন্তা ও নতুন অনুভূতি হিসাবে উদ্ভূত হবে। যে নতুন পরিবেশ তারা গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে নিজেদের সুসামঞ্জস্য ঘটেছে বলে আবার তারা অনুভব করবে। সামাজিক সম্পর্কগুলিকে পরিবর্তিত করতেই হবে যাতে করে পৃথিবীতে ভালোবাসা আবার ফিরে আসে, আর মানুষ যাতে আরও বেশি জ্ঞানবানই মাত্র নয়, আরও বেশি আবেগপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। এটা সেরকম কোনও একটা কর্তব্য নয় যে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা এক দৈব-উপদেশের সাহায্যে সম্পন্ন করে ফেলবেন। সামাজিক সম্পর্কের গোটা কাঠামোটাকেই পরিবর্তিত করে

ফেলতে হবে। সেই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোনও না কোনও ভাবে সেই পরিবর্তনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। হয় তার স্বপক্ষে যেতে হবে, না হয়ত বিপক্ষে যেতে হবে। আর স্বপক্ষে গেলে জয়ী হতেই হবে, বিপক্ষে গেলে পরাজিত হতেই হবে।

এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে লরেন্স তার সমাধান করতে ব্যর্থ হলেন কেন ? ব্যর্থ হলেন এই কারণে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে ঘৃণা করলেও সেই সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে লরেন্স কখনও সফল হননি। এইখানে তাঁর মধ্যেও আমরা সেই পুরাতন মিথ্যাটাকেই দেখতে পাই। সেই মিথ্যা হল : মানুষের 'স্বাধীন" সহজপ্রবৃত্তি তার 'রক্তের টান', তার 'দেহ' যতদূর স্ফুরণের পথ পায় ততদূরই মানুষ 'স্বাধীন'। সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানুষ স্বাধীন নয়, সামাজিক সম্পর্কগুলি **সত্ত্বেও** সে স্বাধীন।

এই বিভ্রমকে যদি কেউ বিশ্বাস করে—এটা যে গভীরতম ও সর্বাধিক দুরপনেয় বুর্জোয়া বিভ্রম তা আমরা আগেই দেখেছি এবং অন্য যাবতীয় বিভ্রম এটির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে,—তাহলে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের জন্য আঘাত পেলে, তাকে সেই সম্পর্কগুলি পরিত্যাগ করে স্বল্পতর 'বাধানিষেধযুক্ত' (constraints) এক আদিম অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যেই নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার সন্ধান করতে হবে। স্বভাবতঃই তাকে তখন এই কথা বিশ্বাস করতে হবে যে নিজস্ব ব্যক্তিগত কর্মের দ্বারা স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। কেউ তখন বিশ্বাস করবে না যে একমাত্র সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই এবং সেগুলিকে পরিবর্তিত করার জন্য অন্যের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারাই স্বাধীনতা ও সুখ পাওয়া যায়। লোকে তখন বিশ্বাস করে যে মানুষের কিছু না কিছু করার থাকেই ; সে মেক্সিকো পাড়ি দিতে পারে, ঠিক মত নারী বা ঠিক মত বন্ধুর সন্ধান পেতে পারে, আর এইভাবে মুক্তির (salvation) সন্ধান পেতে পারে। মানুষ যে একমাত্র তখনই নিজের মুক্তির সন্ধান পেতে পারে যখন সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের জন্য মুক্তির সন্ধানও সে পায়—এই সত্যটা সে কিছুতেই দেখতে পায় না।

সেই কারণে লরেন্স কখনই এই মূলগত (essential) স্বার্থপরতাকে এড়াতে পারেননি। এ কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা নয়। এ হল সেই স্বার্থপরতা যা হল বুর্জোয়া সংস্কৃতির ছক (pattern) । নিষ্ক্রিয়তাবাদ, প্রোটেস্ট্যান্টবাদ, এবং ব্যক্তিগত কর্মের দ্বারা লভ্য যাবতীয় বিভিন্ন ধরনের মুক্তির মধ্যে এটি উদ্ঘাটিত হয়। লরেন্স যে জগতে ফিরে যেতে চাইতেন তা প্রকৃতপক্ষে আদিম মানুষের জগৎ নয়। আদিম মানুষ বুর্জোয়া ইউরোপের সম্পর্কগুলির থেকে আরও অনেক বেশি কঠোর

সম্পর্কে বাঁধা। এ হল সেই পুরাতন বুর্জোয়া 'স্বাভাবিক মানুষের' রাখালরাজত্বের (pastoral) স্বর্গ। বুর্জোয়া 'স্বাভাবিক মানুষ' স্বাধীন কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই স্বর্গের আদৌ কোনও অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব যে নেই তার কারণ এ স্ব-বিরোধী এবং স্ববিরোধী হওয়ার কারণে এই স্বর্গকে লাভ করার জন্য বুর্জোয়া দুনিয়া যতই চেষ্টা করে ততই তার বিপরীতটাকে সে আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলে। দর্পনের মধ্যে আমরা যেমন কোনও বস্তুর দিকে যতই এগিয়ে যাই, ততই প্রকৃত বস্তুর থেকে দূরে সরে যাই,—এও ঠিক তাই। লরেন্সের সুসমাচার সেই কারণে বুর্জোয়া সংস্কৃতির আত্মবিধ্বংসী উপাদানের অংশটাকেই কেবল গড়ে তোলে মাত্র।

এত বরগুণ থাকা সত্ত্বেও লরেন্স সেই পুরাতন পেটি বুর্জোয়া ভুলেরই শিকার হলেন। ওয়েলসের মত তিনি বুর্জোয়া সংস্কৃতির জগতে উপরদিকে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। ওয়েলসের থেকে আরও বেশি শিল্পীসুলভ গুণসম্পন্ন তিনি ছিলেন এবং আরও পরবর্তী কালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অতএব সেই ইতোমধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়া শ্রেণীর নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা তাকে আকৃষ্ট করেছিল একথা বলা যায় না। তাদের সাংস্কৃতিক মূল্যগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই জগতে তিনি প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার প্রচণ্ড বুদ্ধিবৃত্তিগত ও শিল্পগত যাবতীয় সম্পদ আকণ্ঠ পান করে কেবল দেখতে পেলেন যে ওদের সম্পদ সব ধূলায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে। সেই আরোহণজনিত কষ্টের সঙ্গে এই মোহভঙ্গের আঘাত মিলে শেষ অবধি তাঁকে বুর্জোয়া মূল্যগুলির প্রতি ঘৃণায় পূর্ণ করে তুলল। নির্মমভাবে ও তিক্ততার সঙ্গে সেগুলির সমালোচনা তিনি করতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁর জীবনের সমগ্র স্থাপনার জন্য কোনও সমাধান তিনি তুলে ধরতে পারলেন না। বুর্জোয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল জগতে প্রবেশের জন্য তাঁর সেই দীর্ঘ কষ্টসাধ্য আরোহন কেবল এইটুকুই সুনিশ্চিত করল যে তিনি বুর্জোয়াই থাকবেন। তাঁর সংস্কৃতি সর্বদাই বুর্জোয়া সংস্কৃতি, নিজের অবক্ষয় সম্পর্কে সে সচেতন, আত্মসমালোচনাও সে করে। কিন্তু সেই পুরাতন যুগে যখন সব কিছু ছিল অন্য রকম সেখানে ফিরে যাওয়া ছাড়া, এবং যা কিছু বিকাশের ফলে বুর্জোয়া সংস্কৃতি এই কানাগলিতে এসে পৌঁছেছে ; সুতরাং সে সব কিছুকে নষ্ট করা ছাড়া অন্য কোনও সমাধান দুই সংস্কৃতি বাৎলাতে পারে না।

আরও পরবর্তীকালে যদি তিনি জন্মাতেন, সেই সূর্যকরোজ্জ্বল জগৎ যদি এই রকম দুর্বারভাবে তাঁকে আকর্ষণ না করত, তা হলে হয়ত তিনি দেখতে পেতেন যে তাঁর আরোহণ সুরু করার সময় যাদের অত কাছাকাছি তিনি ছিলেন সেই সর্বহারা

শ্রেণীই হল ভবিষ্যতের চালিকা শক্তি (dynamic force)। তাহলে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বাইরে দাঁড়িয়ে সেইখান থেকে তার সমালোচনা করার মত একটা জায়গাই কেবল তিনি পেতেন না, সেই জায়গা থেকে প্রকৃত সমাধানের সন্ধান—অতীতের মধ্যে নয়, ভবিষ্যতের মধ্যে সমাধানের সন্ধান—পেতেও তিনি সক্ষম হতেন। কিন্তু লরেন্স শেষ পর্যন্ত সেই রকমই একজন মানুষ রয়ে গেলেন নিজের সত্তাকে যিনি অন্যদের কাছে নত করতে পারেন না; সহযোগিতা করতে, শ্রেণী হিসাবে সংহতিসম্পন্ন হতে—যা হল সর্বহারা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য তা, তিনি পারেন না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণই তিনি রয়ে গেলেন। সকলেরই তিনি সমালোচনা করলেন, আর একা নিজেই রয়ে গেলেন শ্রীমণ্ডিত। সক্রোধে নিজেরই মুক্তির সন্ধানী এক বুর্জোয়া বিপ্লবীই রয়ে গেলেন তিনি। যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি ছাড়া অন্য যাবতীয় বুর্জোয়া বিভ্রম থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করলেন। শেষ অবধি জগৎকেও দেখতে পেলেন না, আবার নিজে প্রকৃতই যা সেটাও তিনি দেখতে পেলেন না। ঘটনাপ্রবাহকে একটা বুর্জোয়া ট্র্যাজেডি হিসাবে তিনি দেখলেন। এই দেখাটা সত্য হতে পারে, কিন্তু গুরুত্বহীন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা, যেটা কখনই তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়নি সেটা হল এই যে, এটা সর্বহারা শ্রেণীর একটা নবজাগরণও ছিল।

লরেন্সের সচেতন বা অচেতন অনুসরণকারীর দেখা আজ সর্বত্র মিলবে।—নিষ্ক্রিয়তাবাদী, ছিমছাম ক্ষুদে সুখবাদী, বিবেকবান যৌনতাবাদী, সদুদ্দেশ্যপরায়ণ উদারপন্থী, ভাববাদী, সকলেই সেই অসম্ভব সমাধানের সন্ধান করছেন; অবক্ষয় ও ধ্বংসের মাঝখানে বসবাস করে ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বাধীন কর্মের মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধান করছেন। একটা সাময়িক সমাধানের একটা ক্ষণস্থায়ী সুখের সন্ধান হয়ত তাঁরা পেতে পারেন, যদিও আমার ধারণা লরেন্স এদের কোনটারই সন্ধান পাননি। কিন্তু সেই সমাধানের প্রকৃতিটাই হল অপ্রতিষ্ঠ (unstable)। কারণ, যে বাহ্যিক ঘটনাগুলির সঙ্গে ব্যক্তিরা প্রত্যাবর্তনমূলকভাবে নিজেদের অভিযোজন ঘটিয়েছে তা অবিরাম নতুন নতুন বিভীষিকা ও অকল্পনীয় ধ্বংসের জন্ম দিয়ে থাকে। বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কিত কোলাহলের মধ্যে এই ধরনের মেকি চাকচিক্যময় নির্মিতি কোন্ কাজে লাগবে? লরেন্সের মত কানে তুলা দিয়ে কর্ণওয়ালে গিয়ে আত্মগোপন করে কেউ থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ লক্ষ সঙ্গী মানুষের আর্ত চীৎকার তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছাবেই এবং তাঁকে যন্ত্রণাও দেবে। আর, যুদ্ধটা থেকে যাহোক রেহাই পেলেও তার পরে নতুন নতুন বিভীষিকা দেখা দেয়। মন্দা হল বাজারের সর্বগ্রাসী বিযুক্তি [disintegration]। বর্বরতা ও বিভীষিকার বন্যা বইয়ে দেয় নাৎসীবাদ।

তারপর ? বিপর্যয়ের পাহাড়ের মত অস্ত্রশস্ত্রের স্তূপ জমা হতে থাকে, গণ-স্নায়ুরোগ দেখা দিতে থাকে, জাতিগুলি সব ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে উঠতে থাকে। এর কারণ সম্পর্কে যারা অবহিত নয় তাদের কাছে এই সব কিছুই অকারণ, বিভীষিকাময় ও বিশ্বব্যাপী বলে মনে হয়। বুর্জোয়ারা এখনও কি করে ভান করতে পারে যে তারা স্বাধীন ? এখনও সে কি করে ভান করে যে ব্যক্তিগতভাবে মুক্তির সন্ধান সে পেতে পারে ? একমাত্র আরও বেশি স্থূল বিভ্রমের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে, শিল্প, বিজ্ঞান, আবেগ এবং এমনকি শেষ অবধি জীবনকে পর্যন্ত অস্বীকার করেই তা সম্ভব। মানবতাবাদ বুর্জোয়া সংস্কৃতির সৃষ্টি। সেই মানবতাবাদও শেষ পর্যন্ত এই সংস্কৃতি থেকে পৃথক হয়ে যায়। খোলা আকাশে হেলান দিয়ে পুঁজিবাদ তার নগ্ন আতঙ্ক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লজ্জানিবারণের মত একটুকরা ছেঁড়া কাপড়ও তার গায়ে নেই। আর তাকে পরিত্যাগ করে, বা বরং বলা যায় জোর করে তাকে একপাশে হঠিয়ে দেওয়ার ফলে, মানবতাবাদকে এখন সর্বহারা শ্রেণীর দলে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, না হয়ত চুপচাপ এক কোনে সরে গিয়ে গলায় ক্ষুর চালাতে হবে। এই শেষ প্রশ্নটির মুখোমুখি হওয়া পর্যন্ত লরেন্সকে বেঁচে থাকতে হয়নি। বেঁচে থাকলে তিনি দেখতে পেতেন এই শেষ প্রশ্নটি স্বভাবতঃই তাঁর দর্শন ও তাঁর শিক্ষাকে কী অকিঞ্চিৎকর সামগ্রীই না করে তুলেছে !

চার

এচ. জি. ওয়েলস

॥ কাল্পনিক সুখরাজ্যবাদ সম্পর্কে একটি আলোচনা ॥

"কল্পনাবিলাসীদের চিন্তাপদ্ধতি উনবিংশ শতকের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাগুলিকে এখনও নিয়ন্ত্রণ করে। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত সমস্ত ফরাসী ও ইংরেজ সমাজ-তন্ত্রবাদীরা এরই পূজা করেছেন···এঁদের সকলের কাছে সমাজতন্ত্র হল অনপেক্ষ সত্য, যুক্তি ও ন্যায়বিচারের প্রকাশ এবং সেগুলিকে আবিষ্কার করতে পারলেই সেগুলির নিজেদের শক্তির গুণেই সারা জগৎকে জয় করা যাবে। এবং অনপেক্ষ সত্য যেহেতু স্থান, কাল ও মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের উপর নির্ভরশীল নয়, অতএব সেটা কখন কোথায় অবিষ্কৃত হল তা নিছকই আকস্মিক ঘটনা। এই সব কিছুর সঙ্গে প্রতিটি ভিন্ন মতগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতাদের কাছে অনপেক্ষ সত্য যুক্তি ও ন্যায়বিচার আবার ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। এবং যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ ধরনের অনপেক্ষ সত্য, যুক্তি ও ন্যায়বিচার আবার তার বিষয়ীগত বোধশক্তি, তার অস্তিত্বের সর্ত, তার জ্ঞানের ও তার বৌদ্ধিক প্রশিক্ষণের মাত্রার দ্বারা সাপেক্ষিত, সেই কারণে অনপেক্ষ সত্যগুলির এই দ্বন্দ্বে পরস্পরের অসম্পৃক্ত (mutually exclusive) হওয়া ছাড়া সেগুলির অন্য কোনও পরিণতি সম্ভব নয়। সুতরাং এ থেকে এক ধরনের সর্বশাস্ত্রসারধর্মী (eclectic) গড়পড়তা রকম সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না; এবং প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের বেশির ভাগ সমাজতন্ত্রবাদীর মনকে এই ধরনের সমাজতন্ত্রই আজ অবধি ছেয়ে আছে। সেইকারণেই অত্যন্ত ভিন্নধর্মী মতামতের এক জগাখিচুড়িকে মেনে নেওয়া হয়েছে; বিভিন্ন মতগোষ্ঠীর প্রবক্তারা এমন সব সমালোচনামূলক বিবৃতি, অর্থনৈতিক তত্ত্ব, ভবিষ্যৎ সমাজের ছবির জগাখিচুড়ি বানিয়েছেন যাতে ন্যূনতম বিরোধিতা দেখা দিতে পারে; এমন এক জগাখিচুড়ি যা যত সহজে বানানো যায় স্বতন্ত্র মতাবলম্বীদের সুস্পষ্ট মতপার্থক্যের ধারও বিতর্কের স্রোতে ততই ভোঁতা করে দেওয়া হয়, নদীর স্রোতে যেমন নিটোল নুড়ি তৈরি হয়।"

এঙ্গেলস : 'সমাজতন্ত্র : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক।'

উপরের আলোচনা থেকে খুব স্পষ্টই দেখা যাবে যে এচ. জি. ওয়েলস লেখক হিসাবে বিখ্যাত হওয়ার অনেক আগেই মার্ক্সের সহলেখক এঙ্গেলসের কাল্পনিক-সুখরাজ্যবাদের সঠিক চরিত্র নির্ধারণ করে গিয়েছেন। যে সব কাল্পনিক সমাজতন্ত্র-বাদীরা মনে করেন যে জগৎটা কেমন হওয়া উচিত তা তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন

তাঁদের প্রত্যেকের উপস্থাপিত প্রতিভাস (phenomenon) সম্পর্কেই যে কেবল এঙ্গেলসের আগ্রহ ছিল তাই নয়, এই কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীরা যখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুনির্দিষ্ট কিন্তু বিপুল পার্থক্যপূর্ণ ধারণা থেকে কোনও না কোন ভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেন তখন কর্মকে ব্যাহত করে এমন একটা সাধারণ আবছায়া অস্পষ্টতা ছাড়া আর কোনও ফল কেন যে পাওয়া যায় না সেই সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল। এই মিশ্রণকে এঙ্গেলস বলেছেন জগাখিচুড়ি।

অবশ্য এচ. জি. ওয়েলসের বৈশিষ্ট্য এবং এই মতাবলম্বীদের পরবর্তী বিকাশ হিসাবে এঙ্গেলস উল্লেখিত পূর্ববর্তী কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের থেকে ওয়েলস যে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র তা হল এই যে, তিনি এই জগাখিচুড়ির একজন সহায়ক মাত্রই নন, এই জগাখিচুড়ি তিনি নিজেই। এটা অপরিহার্য ওয়েলস তাঁর 'এক্সপেরিমেণ্ট ইন অটোবায়োগ্রাফি' পুস্তকে নির্বোধের মত ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁর ঘুলিয়ে যাওয়া চিন্তার কারণ হল তাঁর মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহের কোনও বৈশিষ্ট্য। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। যে জগতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেই জগতের নৈরাজ্যই হল এর কারণ। প্রথম যুগের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের কাছে জগৎটা ছিল একটা সুনির্দিষ্ট (precise) কিছু। কারণ বুর্জোয়া মূল্যগুলি তখনও সুনির্দিষ্ট ছিল। সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ প্রত্যয় বলে মনে হত। আজ যখন এক অদ্ভুত উপায়ে সাম্য হয়ে উঠেছে ট্রাস্টপুঁজির আধিপত্য, স্বাধীনতা হয়েছে মজুরি দাসত্ব আর গণতন্ত্র হয়েছে ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদ সেগুলি তখন কি করে আর অর্থপূর্ণ থাকতে পারে ?

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের অনপেক্ষ বন্ধনমুক্তি, স্বাধীনতা ইত্যাদি ছিল তৎকালীন বুর্জোয়া মূল্য। এগুলিকে চিরন্তন হিসাবে স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট করে তোলা হয়েছিল। ওয়েলসের মূল্যগুলিও তাই। কিন্তু এঙ্গেলসের কালে এই মূল্যগুলির এত দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল না যাতে সেগুলি রাতারাতি তাদের বিপরীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। ওয়েলসের কালে ঠিক এইটাই ঘটেছে। আর সেই কারণে প্রতি বছরই ওয়েলস এবং তাঁর মত লোকদের ভিন্ন ভিন্ন কাল্পনিক সুখরাজ্য আর নতুন নতুন বিশ্বদৃষ্টি হাজির করতে দেখা যাচ্ছে। ওয়েলসের অবস্থা হল সেই বেচারা দর্জির মত যার গজকাঠিটা রাতারাতি খেয়ালখুশি মত বদলে যেত। রোজ সকালবেলা সে ধৈর্যের সঙ্গে কাপড় মাপত আর দেখত অসঙ্গতিপূর্ণ মাপের কাপড়ের বাণ্ডিলের লম্বা সারি। ওয়েলস তাঁর প্রতিটি নতুন পুস্তকেই দেখেন কাল্পনিক সুখরাজ্য নতুন নতুন নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে ; মানুষের মুক্তির নতুন নতুন রূপ ; বর্তমান অসন্তোষের ব্যাখ্যা হিসাবে নতুন নতুন গোপন ব্যাধি নতুন নতুন

দেবতা, অদৃশ্য সব রাজা। এই সব কিছুর অযৌক্তিকতাতে ওয়েলস বিরক্ত হন। মানুষ যদি একটু যুক্তি পরায়ণ হোত! অথচ ওয়েলসের হাতে পড়ে যুক্তি এত নানা রকমের সমাধান তৈরি করেছে যে সেইসব দেখে মানুষের যদি যুক্তির উপর আস্থা আর না থাকে তাহলে মানুষকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সর্বজনীন বিশ্ব-গণতান্ত্রিক ফেডারেশন থেকে সুরু করে সামুরাই প্রভুদের দ্বারা পরিচালিত জগৎ, উদারপন্থী ফ্যাসিবাদ থেকে সুরু করে রুজভেল্ট ব্রেন ট্রাস্ট, খোলাখুলি ষড়যন্ত্র থেকে সুরু করে এমন এক বীভৎস যুদ্ধ দ্বারা পৃথিবীকে বাঁচানো যাতে সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যায় এই রকম নানা ভিন্ন ভিন্ন সমাধান ওয়েলস দিয়েছেন। ওয়েলসের মতাদর্শের গজকাঠির উপর আস্থা রাখার থেকে বরং ভিক্টোরিয়ার যুগের বুর্জোয়া পদ্ধতিতে ব্যাপারটার পরিমাপ করা অবশ্যই বেশি ভালো। অন্যান্য মানুষরা বুর্জোয়া ব্যবস্থার যেরকম যেরকম বিভিন্ন ধরনের অংশে বাস করেন সেই অনুযায়ী তাঁদের অনপেক্ষ সত্য, যুক্তি ও ন্যায়বিচারের ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি থাকে, এবং ওয়েলসের অনপেক্ষভাবে ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কাল্পনিক সুখরাজ্য তাঁদের আদৌ নাড়া দেয় না। ওয়েলসের কাল্পনিক সুখরাজ্যসংক্রান্ত তত্ত্বগুলির কোন কোন নীতি উপদেশ ঈশ্বরভীরু লোকের কাছে খুবই অন্যায় বলে মনে হয়। পোষাক ব্যবসায়ীদের কাছে 'মেন লাইক গডস'-এর নগ্নতা আদৌ স্বর্গীয় বলে মনে হয় না। আগামী দিনের এই সব রাষ্ট্রে বিজ্ঞানীদের অযথা বেশি রকমের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে ব্যবসায়ীরা মনে করেন। এমনকি অনপেক্ষ সম্বন্ধে যাঁদের প্রত্যয় ওয়েলসের মতই সরল ও পেটিবুর্জোয়াসুলভ তাঁরাও এই অস্বস্তিকর অনুভূতিকে চাপা দিতে পারছেন না যে নিটোল, ন্যায়পরায়ণ, সুখী ও সুন্দর রাষ্ট্রের যে ছবি ওয়েলস এঁকেছেন সেই রাষ্ট্র নিতান্তই ক্লান্তিকর হবে।

কারণ ওয়েলস একজন পেটিবুর্জোয়া, আর পুঁজিবাদের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে এই শ্রেণীর থেকে কুৎসিত আর কেউ নয়। এ থেকে যে পালাতে পারে না সে নিশ্চয়ই হতভাগ্য। আবশ্যিকভাবে এটি হল সেই শ্রেণী যার গোটা অস্তিত্বটাই একটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্রিয়াগত দিক থেকে এ শোষিত, কিন্তু যেহেতু বুর্জোয়া শোষণের ভূরিভোজের কিছু উচ্ছিষ্ট একে দেওয়া হয় সেইজন্য নিজেকে সে বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে একাত্ম হিসাবে দেখে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, ছোট দোকানদার বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের পারিবারিক ভৃত্য হিসাবে বুর্জোয়া ব্যবস্থার উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। জীবনে একটি মূল্যকেই সে বোঝে, তা হল নিজের অবস্থা আরও ভালো করা, আর বুর্জোয়াদের যেসব ভালো ভালো জিনিস তার নাগালের অনেক বাইরে সেই সব জিনিস পাওয়ার জন্য আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা।

একটি মাত্র ভীতিই তার থাকে, তা হল সম্মানিত স্তর থেকে সর্বহারার গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভীতি। গহ্বরটা বড় কাছাকাছি বলেই সেটা এত বিপজ্জনক বলে তার মনে হয়। এই শ্রেণীর কোনও শিকড় নেই; ব্যক্তিস্বাতন্ত্রপরায়ণ, নিঃসঙ্গ এবং ঘাড় ফুলিয়ে নিয়ত এক বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন জগতের দিকে মুখ তুলে সে তাকিয়ে থাকে। ধনী বুর্জোয়ার নিরাপত্তা বা শ্রমিকের বন্ধুত্ব দুইই তার অজানা কোনও কিছুতেই সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না, কারণ সর্বদাই সে নিজের অবস্থাকে আরও ভালো করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে। এই শ্রেণী হল সব থেকে মোহাচ্ছন্ন, কারণ বুর্জোয়াদের গালভরা অলীকত্বের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া শ্রমিক শ্রেণীর নির্মোহ মনোভাব তার নেই, বা বুদ্ধিমান বুর্জোয়ার বিদ্রূপমিশ্রিত অবিশ্বাসও (cynicism) তার নেই। বুর্জোয়া যখন নিজের স্বার্থে ধর্ম, রাজকীয়তা, দেশপ্রেম এবং পুঁজিবাদী 'কর্মোদ্যম' ও 'দূরদৃষ্টির' গালভরা অলীকত্বগুলিকে টিঁকিয়ে রাখে তখন সেগুলি সম্পর্কে কোনও মোহ তার থাকে না। পেটি-বুর্জোয়ার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নেই, আবার শ্রমিকদের ঘৃণা করে বলে তাদের ঐতিহ্যও সে গ্রহণ করে না। বুর্জোয়ার ঐতিহ্যগুলি সে গ্রহণ করে, অথচ তার কাছে সেগুলির কোনও গুণ নেই। কারণ সেগুলিকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সে কোনও সাহায্য করেনি। এই জগৎ এক ভয়ঙ্কর মজে যাওয়া জলাভূমির মত, কেবল কাদা আর তিক্ততা, এমন কি ট্র্যাজেডির যে সুষমা তাও তাতে অবর্তমান। 'এক্সপেরিমেণ্ট ইন অটোবায়োগ্রাফি' পুস্তকে সুন্দরভাবে তার বর্ণনা করা হয়েছে।

সকলেই চায় এই জলাভূমিকে এড়াতে। পেটিবুর্জোয়ার এই জগতের একমাত্র চালিকাশক্তি হল : যে জগতে তারা জন্মগ্রহণ করেছে তা থেকে উপরে ওঠার চেষ্টা, ধনী হওয়ার, নিরাপত্তালোকের, উপর-ওয়ালা হওয়ার চেষ্টা। আর পুঁজিবাদের বিকাশ এই জগতের গহ্বরটাকেই বাড়িয়ে তোলে; ধনসম্পদ, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে আরও বেশি বেশি করে দুঃসাধ্য করে তোলে এবং এইভাবে তার ভীতিকে বাড়িয়ে তোলে। পেটিবুর্জোয়ার মুখে ক্রমেই তুচ্ছ, অনর্থক, উদভ্রান্ত অসন্তুষ্ট মানুষের ছাপ পড়ে আরও বেশি বেশি করে। জীবনের জটিলতা ও ঘূর্ণাবর্ত প্রতি পদে পদে তাদের বাধা দেয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে। আশাভঙ্গ, পরাজিত হয় তারা; অসহনীয় হয়ে ওঠে সবকিছু। কিপ্‌স্ থেকে ক্লিসোল্ড পর্যন্ত ওয়েলসের প্রায় সব চরিত্রই মানসিক দিক থেকে এই আশাভঙ্গ পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষ। কেন যে সব কিছু এত গোলমেলে, কেন যে মানুষ এত যুক্তিহীন, জীবন কেন যে এত কঠিন—একথা তারা যে কিছুতেই বুঝতে পারে না তার কারণ এই যে তারা নিজেরাই ভীষণ যুক্তিহীন। পুঁজির দায়িত্বহীনতা ও কালাতিক্রমণের তীব্রতম রূপ থেকে তাদের জন্ম। আর এই কথাটাই তারা বুঝতে পারেনা।

পেটিবুর্জোয়া জগৎ থেকে পলায়নের নানা পথ। একটা পথ হল মিথ্যা বুর্জোয়া মোহগুলি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যে সর্বহারার নরককে সে সর্বদা ভয় করে এসেছে সেখানেই ফিরে যাওয়া। সেখানে যথেষ্ট কঠিন ও শ্রমসাধ্য জীবনের মুখোমুখি সে হবে বটে, কিন্তু মূল্যগুলি হবে স্পষ্ট। সমাজে যে ক্রিয়াগত ভূমিকা সে পালন করে তা থেকে সেগুলি উদ্ভূত। পেটিবুর্জোয়া রিক্ততার বিশিষ্ট ভীতিজনক স্বাদটা তখন চলে যায়। কারণ, যে সামাজিক শক্তিগুলি সেই দুঃখ সৃষ্টি করে—বেকারি, দারিদ্র্য ও অনাহার—তা এখন স্পষ্টই উপর থেকে বাইরে থেকে, একটা বিরোধী জগৎ থেকে আসছে বলে সে দেখতে পায়। একই শ্রেণীভুক্ত মানুষ হিসাবে, দুর্দিনের সঙ্গী হিসাবে মানুষ তখন সেগুলির মোকাবিলা করে। এবং এর ফলে সহানুভূতি ও সংগঠনের সৃষ্টি হয় যাতে সেগুলি সহজতর হয়ে ওঠে। 'গরীবরাই গরীবদের দেখে।' সর্বহারা ঘৃণা করতে বাধ্য হয়; পরস্পরকে নয়, নৈর্ব্যক্তিক জিনিসকে, যেমন যুদ্ধ, তেজী মন্দা বা নিজেদের শ্রেণীর বাইরের শ্রেণীগুলিকে—মালিকদের ধনীদের।

পেটিবুর্জোয়ার বিশেষ ধরনের দুঃখদুর্দশাই তাদের পরস্পরকে ঘৃণা করতে বাধ্য করে। যা তাদের আঘাত করে অথবা তাদের দুঃখদুর্দশা বা দারিদ্র্য ডেকে আনে তা কোনও নৈর্ব্যক্তিক জিনিস বা নিজেদের শ্রেণীর বাইরের 'শ্রেণী' নয়; নিজেদের শ্রেণীরই অন্যান্য মানুষরা যেন তাদের আঘাত করছে বলে মনে হয়। বাড়ির সামনের দোকানদার, প্রতিদ্বন্দ্বী ছোট ব্যবসায়ী, পাশের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে তারা সক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতা করে। একজন পেটিবুর্জোয়ার প্রতিটি সাফল্য অপর জনের বুকে ছুরির মত বেঁধে। নিজের প্রতিটি ব্যর্থতা অন্যের কার্যকলাপের ফল। কোনও বন্ধুত্ব, কোনও সংহতি সম্ভব নয়। নিচের স্তরের যে গহ্বর সর্বদা হাঁ করে আছে সেই শ্রমিকদের থেকে সুরু করে ঠিক উপরের স্তরের যে কৃতি পেটিবুর্জোয়াকে সে হিংসা ও ঘৃণা করে সেইখান পর্যন্ত তার ঘৃণার বিস্তার।

পুঁজিবাদের বিকাশ দুটি প্রবণতাকেই বাড়িয়ে তোলে: শ্রমিকদের সংহতি আর পেটিবুর্জোয়ার মতপার্থক্য ও তিক্ততা।

উপরদিকেও পরিত্রাণ সম্ভব। অনেককেই ডাক দেওয়া হয়। সর্বহারার মধ্যে যারা মিলিয়ে যায়নি তারা 'উপরে ওঠার চেষ্টা করে। কয়েকজনকে মাত্র বেছে নেওয়া হয়।' অল্প কয়েকজনই মাত্র ধনী বুর্জোয়ার স্তরে পৌছাতে পারে। সেই অল্পসংখ্যকদের একজন হলেন ওয়েলস। এই তীব্র ও প্রচণ্ড লড়াইয়ের কাহিনী এবং ব্যাঙ্কের পাশবইয়ের মাপকাঠিতে তাঁর চূড়ান্ত সাফল্যের কথা ওয়েলসের আত্মজীবনীতে লেখা আছে।

শিল্পের বা বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে পলায়নের চেষ্টা কেউ কেউ করে। কিন্তু এই

'পলায়ন' ক্রমেই আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। ওয়েলসের অবস্থানের তরুণ শিল্পীর কথা ধরা যাক। সম্ভবতঃ কবিতা, ছোট গল্প বা নতুন উপন্যাসের কলা-কৌশলের প্রতি আগ্রহ হিসাবে শিল্পের প্রতি একটা প্রবল আগ্রহ তার মধ্যে আসবে। প্রথম প্রথম তার কলাকৌশল শিক্ষা কষ্টকর ও নিস্ফলা হবে এবং অর্থনৈতিকও হবে না। তাতে তার কোনও লাভ হবে না। কিন্তু সে বাঁচবে কি করে? নিজেকে কি সর্বহারা করে তুলতে হবে তাকে? দয়ার উপর নির্ভর করে খোলার ঘরে তাকে উপবাস করে থাকতে হবে নাকি? কিন্তু সমাজের এক 'অস্পৃশ্য' ['despised'] ব্রাত্য সদস্য হিসাবে খোলার ঘরে উপবাস করে থাকাটা শিল্পী হিসাবে তার গোটা দৃষ্টিভঙ্গীটাকে আবশ্যিকভাবে সাপেক্ষীভূত করবে। সর্বহারায় পর্যবসিত হওয়ার পক্ষে বা বিপক্ষে, অথবা অসফল পেটিবুর্জোয়া হিসাবে, অথবা বাধ্য হয়ে সমাজবিরোধী সর্বহারা [loompen proletariat] গোষ্ঠীভুক্ত একজন মানুষ হিসাবে সে লিখবে এবং গোটা সমাজটা তার কাছে বাধ্যবাধকতা-মূলক, পচে যাওয়া ও শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে হবে। তাছাড়া, সেই যুগে এই সব এবং এইরকম পূর্বগামী অবস্থার দ্বারা সৃষ্ট শিল্পের সমষ্টি হিসাবে শিল্প জিনিসটাই আরও বেশি বেশি করে অপাংক্তেয়, নিজের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া, অ-ক্রিয়াধর্মী ও বিষয়াধর্মী হয়ে উঠবে; পিকাসো বা জয়েসের শিল্পের মত তা এক নিষ্ঠাবান, ক্ষয়িষ্ণু, নৈরাজ্যবাদী শিল্প হয়ে উঠবে।

এই জ্বালাময়ী আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পেটিবুর্জোয়া নরক থেকে পলায়ন করা, শিল্পকে সখ হিসাবে, একটা সামাজিক ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করা, বুর্জোয়া মূল্যের জগৎ থেকে বহিষ্কৃত এক ব্যক্তি হিসাবে নিজের মধ্যেই ফিরে যেতে বাধ্য হওয়া ওয়েলসের পক্ষে অসম্ভব ছিল। শিল্পকে সাফল্যের একটা উপায় হিসাবে এবং নগদ অর্থলাভের সর্বোৎকৃষ্ট পথ হিসাবে গ্রহণ করাই তাঁর পক্ষে একমাত্র সম্ভব ছিল। সাহিত্যের বাজারে পাঁচ অঙ্কের বিক্রয়সংখ্যা ও পাঁচ অঙ্কের অর্থাগমের জন্য তাঁর সংগ্রামের প্রথম যুগের কথাগুলি তাঁর আত্মজীবনীতে প্রকাশ পেয়েছে।

এটা খুবই সম্ভব যে ওয়েলসের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত এক মুখ্যতঃ শিল্পীসুলভ প্রবণতা ছিল। জীবন্ত উপমাপ্রয়োগের ক্ষমতা এবং শব্দের বুননের মধ্যেই আনন্দ বর্তমান এমন সব শব্দ ব্যবহার করার ক্ষমতা তাঁর রাশি রাশি বাগাড়ম্বরপূর্ণ শূন্যগর্ভ চিন্তার মধ্যে মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। কিন্তু শিল্পকে সামাজিক উপযোগিতা দ্বারা সমর্থিত একটা সখ হিসাবে একবার অস্বীকার করে এবং তাকে বিক্রয় দ্বারা সমর্থিত নগদমূল্য-স্রষ্টা হিসাবে স্বীকার করার ফলে লেখক হিসাবে তাঁর গুণের বিকাশ রুদ্ধগতি হয়ে পড়ল। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলি তাঁর নিজের

চরিত্রেরই ক্ষণস্থায়ী দিকগুলির প্রতিফলন মাত্র। তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের অস্তগুলি অবাস্তব, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি মনে কোনও রেখাপাত করে না এবং তারা অ-প্রগতিশীল। গোটা পটভূমি ও ক্রিয়াকর্ম জুড়ে একটা পল্লবগ্রাহিতা ও শূন্যগর্ভতা ব্যাপৃত। হেনরি জেমস সেটা সঠিকভাবেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ কোনও শিল্প ওয়েলস সৃষ্টি করতে পারেননি এবং উপরতলায় ওঠার পেটিবুর্জোয়াসুলভ সংগ্রামে ব্যথিত তাঁর জীবন বাস্তবের সংস্পর্শে তাঁকে আসতে দেয়নি। কোনও প্রকৃত সমসাময়িক সমস্যাই কখনও তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। বিজ্ঞানভিত্তিক অবাস্তব জগতের আবেদন কেন যে তাঁর কাছে এত বেশি সেটা নিঃসন্দেহে এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আর একমাত্র এই বিজ্ঞানভিত্তিক অবাস্তব কাহিনীর সাহায্যেই—তাও একমাত্র তাঁর যৌবনের রচনায়—যেটুকু শিল্পগত সাফল্য তিনি অর্জন করতে পেরেছেন।

'বিশুদ্ধ' চিন্তার জগতে পলায়নের পথটাও খোলা ছিল। কিন্তু শিল্পীকে যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, আজকের দিনে বিজ্ঞানীকেও সেই একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যদিও মাত্র ইদানিংই সেটা খুব তীব্র হয়ে উঠেছে। মানুষ চিন্তার সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে। কিন্তু তাহলে আবার প্রশ্ন আসে, ভাবনাচিন্তা করে (speculating), মানুষ কি করে ভাবনাচিন্তার সাহায্যে বাঁচতে পারে? সমস্যাটাও যে কোনও মানুষের চিন্তাকেই প্রভাবিত করবে। নিজের বিচ্ছিন্নতার দ্বারা এবং পরীক্ষানিরীক্ষা করার মত যন্ত্রপাতি ও সাহায্য পাওয়ার অক্ষমতার কারণে এটা ঘটে।

বিকল্প হিসাবে কোনও মানুষ চিন্তনকারী (thinker) হিসাবে কাজ পেতে পারে এবং নগদ মূল্যের বাজারে নিজের বিজ্ঞানবিষয়ক যোগ্যতাকে নিয়ে আসতে পারে। শিল্পের থেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বুর্জোয়াতন্ত্র এই ব্যাপারে একটু বেশি কৃপাময়। কারণ বিজ্ঞান তার কাছে শিল্পের থেকে বেশি লাভজনক। এমন অনেক পদ আছে যেখানে চিন্তনকারীকে কেবল মাত্র চিন্তা করার জন্যই টাকাপয়সা দেওয়া হয়। কিন্তু এগুলির সংখ্যা কম এবং ইতোমধ্যেই তা স্বল্পতর হয়ে উঠছে। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীকেই পেটেন্ট, অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ক গবেষণা আর শিক্ষকতার কাজ করে জীবন ধারণ করতে হয়। বুর্জোয়াতন্ত্র এই বলে তাদের সবিশেষ সাবধান করে দেয় যে বিজ্ঞান ক্রমশঃই একটা উৎপাত হয়ে উঠছে; অতিউৎপাদন হচ্ছে, 'নতুন আবিষ্কারের কাজকর্ম কিছুদিন বন্ধ থাকা উচিত।'

হল কি, পলায়নের এই উপায়টিও ওয়েলস চেষ্টা করলেন। হাক্সলির অধীনে তিনি গবেষণা করলেন। ঠিকই হোক আর ভুল হোক, তিনি বিশ্বাস করেন যে

তিনি একজন ভালো বিজ্ঞানী হতে পারতেন। কিন্তু পেটি-বুর্জোয়া দারিদ্র্য থেকে পলায়নের প্রয়োজনীয়তাটা আবার দেখা দিল। ডিমনস্ট্রেটরের চাকরি নিলেন যাতে বিবাহের সংস্থান করতে পারেন এবং তারপরেই জনপ্রিয় কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতে সুরু করলেন। স্ত্রী ও সংসার 'প্রতিপালনের' প্রয়োজনে সম্ভাব্য বিজ্ঞানীর জীবনে বাধা পড়ল।

কিন্তু স্বচ্ছলতার জগতে পলায়নের তাগিদে তাঁর এই সব অভিজ্ঞতাগুলি স্বভাবতঃই নিজ শ্রেণীর যাবতীয় অসুবিধা ও যাবতীয় আশাভঙ্গের ব্যাপারগুলির তীব্রতম রূপটি সম্পর্কে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিল। খাস পেটিবুর্জোয়ার প্রতি করুণায় তাঁর পুস্তকগুলি পরিপূর্ণ—'আমাদের বেচারা উদ্‌ভ্রান্ত' অমুক, নিঃসঙ্গ, অসন্তুষ্ট, উচ্চাভিলাষী, অন্ধ শক্তির ক্রীড়নক। বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতি—রুজভেল্টদের প্রতি সামুরাইরূপী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুঁজিপতিদের প্রতি—তাঁর পেটিবুর্জোয়াসুলভ সশ্রদ্ধ ভাবটাকে তিনি কিছুতেই অতিক্রম করতে পারেন না, আবার শ্রমিকরা কি রকম সে কথা কল্পনা করার ক্ষমতাও তাঁর নেই। তিনি স্বীকারই করেছেন তাদের তিনি চেনেন না, তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেননি, তাদের বুঝতে তিনি পারেন না। তাদের সম্পর্কে যেটুকু তাঁর জানা আছে তা হল পেটিবুর্জোয়ার স্তরের নীচে মুখব্যাদান করা সর্বহারার গহ্বরের শৈশবস্মৃতি, সেই ভয়ঙ্কর (মর্লকরা) যখন বিদ্রোহ ক'রে উপরে দিনের আলোয় উঠে আসে তখন তাদের অন্ধভাবে হত্যা করাই কর্তব্য।

এর অর্থ হল, ওয়েলসের জগৎ একটা অসম্ভব জগৎ। বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের মধ্যকার ঘাতপ্রতিঘাত থেকে আধুনিক সমাজের গোটা দুনিয়াটা তার শক্তি ও চরিত্র আহরণ করে; এই দুই শক্তির সংঘর্ষ থেকে যে ধূলো ওড়ে সেটাই হল পেটিবুর্জোয়া শ্রেণী। একমাত্র যে শ্রেণীটি ওয়েলস চেনেন তা হল এই পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীটি। সেইজন্যই আজকের দুনিয়ায় কি ঘটছে তা হৃদয়ঙ্গম করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সবকিছুই মনে হয় রহস্যময়, বিধিবহির্ভূত, আশাহত। কিন্তু বুর্জোয়া নিরাপত্তার জগতে যেহেতু তিনি আরোহণ করেছেন সেইজন্য কি যে তিনি করছেন তা উপলব্ধি না করেই সর্বদা বুর্জোয়ার স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতেই হবে তাঁকে। মহাযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে, শান্তির সময় উদারপন্থী ফ্যাসিবাদ এবং নিউ-ডীলের পক্ষে তাঁকে জেহাদ চালাতেই হয়। মর্লকদের উত্থানের সমস্ত 'নিষ্করুণ' বা 'তিক্ত' চিহ্নকে তাঁকে সর্বদা ঘৃণাই করতে হবে এবং মার্ক্সের বিরুদ্ধে বা শ্রেণীভেদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে এমন যে কোনও ধরনের সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে নিরলস জেহাদ তাঁকে অবশ্যই চালাতে হয়। আমাদের তিনি বলছেন যে শ্রেণীভেদ

হল নিছক অলীককল্পনা। 'কাল্পনিক চরিত্র' (personae) এবং পুরাণকাহিনী (myth) দিয়ে আমরা নিজেদের ভুলাই। সেই থেকেই এই শ্রেণীভেদের সৃষ্টি। অর্থাৎ কুলিশকঠোর পুঁজিপতিও জগৎটাকে যেটুকু চেনেন ওয়েলস তার থেকেও কম চেনেন তাকে। কিসের জন্য আর কার বিরুদ্ধে তাকে লড়তে হচ্ছে পুঁজিপতি সেকথা খুব পরিষ্কার জানে।

পেটিবুর্জোয়া স্তর থেকে উপর দিকে ওঠার লড়াইয়ে সমকালীন সর্তগুলি ওয়েলসকে কেবল যে আঘাত দিয়েছিল ও আশাভঙ্গ করেছিল তাই নয়, শিল্প বা বিজ্ঞানের কাছে তাঁর যা কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল সেগুলিকেই দলিত করতেও তিনি বাধ্য হন। সেই কারণে স্বভাবতঃই এই সর্তগুলির প্রতি একটা সমালোচনামূলক মনোভাব তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং সমপরিমাণ আবশ্যিকতাবেই একমাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সঙ্গে এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল মতামতের সাহায্যেই সেগুলির সমালোচনা তিনি করতে পারবেন। কারণ এই সর্তগুলিকে তিনি বুঝতেন না। জনপ্রিয় 'চিন্তনকারীদের' ভাবাদর্শমূলক উপন্যাসের ('novels of ideas') এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসের 'রূপরেখা' রচয়িতার ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন। কারণ প্রকৃত শিল্পের চর্চা করতে তিনি অপারগ ছিলেন এবং প্রকৃত বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। সৃজনশীল (creative) হতে তিনি পারেন না। কারণ, যে ব্যক্তি প্রকৃত শিল্পী বা প্রকৃত বিজ্ঞানী, সৃজনের বিশেষ অধিকার (prerogative) তাঁরই। সুতরাং আবশ্যিকভাবেই তিনি হয়ে উঠলেন আধুনিক বা তত আধুনিক নয় এমন সব তত্ত্বের একজন বড় উদ্যোক্তা (enterpreneur)। সম্প্রতি যদিও বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নতুন নতুন আবিষ্কার তাঁকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ধরুন ১৮৯০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত কালের—মনঃসমীক্ষণ, প্রাগৈতিহাসিক নৃতত্ব ও তুলনামূলক ধর্মতত্ব, প্রত্নতত্ব, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার ক্ষেত্রের যাবতীয় আবিষ্কারকে ব্যবহার করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কোনও বিশ্বদৃষ্টি তাঁর ছিল না এবং পেটিবুর্জোয়ার সহজাত কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাকেও তিনি এড়াতে পারেননি, সেই কারণে এই সব ধ্যানধারণাগুলিকে তালগোল পাকানো ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারলেন না— হল এক সর্বশাস্ত্রসারগ্রাহী জগাখিচুড়ি। তাঁর হাতে পড়ে সূক্ষ্মতম ও তীক্ষ্ণতম প্রকল্পটিও যেভাবে হোক জবড়জঙ্গ এবং তালগোলপাকানো হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারেরও যে বর্ণনা তিনি দেন তা হয়ে ওঠে ম্যাড়মেড়ে, বিবর্ণ। মৌলিক চিন্তার কথা দূরে থাক, স্বচ্ছ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার ক্ষমতাই যে লোকের এত কম সেরকম কোনও লোককে কেউ কি কখনও চিন্তাবিদ হিসাবে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে পারে

এনসাইক্লোপিডিস্টদের মত একটা অবস্থান ওয়েলস হয়ত অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু এনসাইক্লোপিডিস্টরা ছিলেন একটা বুর্জোয়া বিপ্লবের যুগের বুর্জোয়া সমাজের গতিশীল শক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁরা। সেই সমাজের কাঠামোর একটা অংশ, যন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ লিভার ছিলেন তাঁরা। আর ওয়েলস এমন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যা এমন কি একটা মুমূর্ষু শ্রেণীও নয়, যন্ত্রের কার্যনির্বাহ প্রক্রিয়ায় খসেপড়া একটা টুকরার থেকে সেটা বেশি কিছু নয়। এই এনসাইক্লোপিডিস্টদের সেই কারণে একটা পুরাপুরি স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট বিশ্বদৃষ্টি ছিল। যে জগতে তাঁরা বাস করতেন সেটা ছিল একটা বাস্তব জগৎ; আর তার কাঠামোটাকে ভিতর থেকে তাঁরা চিনতেন। যে সব সমকালীন আবিষ্কারকে তাঁরা জনপ্রিয় করেছিলেন সেগুলিকে একটা সুসংগত বাস্তব কাঠামোর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো হয়েছিল। সমকালীন আবিষ্কারগুলিকে যার মধ্যে খাপ খাওয়াবেন এমন কোনও কিছুই ওয়েলসের ছিল না। আর সেইজন্যই দেখা যায় এই বৈশিষ্টপূর্ণ ওয়েলসীয় তালগোল -পাকানো।

শিল্প, বিজ্ঞান ও কর্মকে পরিত্যাগ করে 'প্রচারের' অনুকূলে কাজ করে জগৎকে তিনি পরিবর্তিত করতে পারবেন বলে ওয়েলস বিশ্বাস করেন। ওয়েলসের এই বিভ্রম এক আশ্চর্য এবং এক দিক থেকে করুণ বিভ্রম। এর উৎপত্তি কি করে হল তা আমরা দেখতে পাই। পেটিবুর্জোয়া নরক থেকে তাঁর উপরে ওঠার পরিস্থিতি থেকে এবং শিল্প ও বিজ্ঞানকে তাঁর পরিত্যাগ করা থেকে আবশ্যিকভাবেই সেটা কি করে দেখা দিয়েছিল তা আমরা দেখতে পাই। বুর্জোয়াদের সেই বিশিষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই এটা রূপ নেয়। ভ্রান্তিটা হল এই যে, চিন্তা প্রথমে আসে এবং জগৎকে তা চালিত করে, এবং লোকে যদি কেবল একটু যুক্তি মেনে চলত (আর এদিকে পুঁজিপতির যন্ত্র এই সব লোকেদের প্রতিটি চলনকে বাধা দিচ্ছে) তাহলেই তারা সঠিকভাবে কাজ করত।

একদিকে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলির আশাহীন বিভ্রান্তি, অপর দিকে ঐ সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির মধ্যে পদার্থবিদ্যা (বিজ্ঞান) ও যন্ত্রপাতি (করণ-কৌশলগত সম্পদ) রূপে, প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ শক্তি থাকে যা কেবল বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই মাত্র বাস্তবায়িত করা যায়, এটা ওয়েলস দেখতে পান। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন যে কোনও লোকই এটা দেখতে পান, আর ওয়েলস ত তাদের থেকে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন—তিনি ত এটা দেখতে পাবেনই।

কিন্তু ওয়েলসের কাছে সর্বহারার অস্তিত্বই নেই। অতএব পরিবর্তনটা বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্য থেকেই একমাত্র আসতে পারে। জগৎকে 'সঠিক পথে স্থাপিত করার'

কাজটা হয়ে ওঠে বুর্জোয়াকে তাদের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেওয়ার কাজ। যুক্তিতর্কের (argument) দ্বারা জগৎকে সঠিক পথে স্থাপিত করতে হবে। কিন্তু তিনি যে এই রকম চিন্তা করেন এই ঘটনাটিই দেখিয়ে দিচ্ছে যে, যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি তা করবেন সেই রকম কোনও যুক্তিসম্মত ভিত্তি তাঁর নিজেরই নেই ; যাদের মতকে তিনি পরিবর্তিত করতে চান তাদের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তিনি সমগোত্রীয়। বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক কেবল যে প্রচুর ক্ষমতার এবং তাদের নিজেদেরই ধ্বংসের সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে তাই নয়, মতাদর্শের ক্ষেত্রে যাবতীয় যুক্তিহীনতারও জন্ম দিয়েছে যা সেই একই বিভ্রান্তিকে প্রতিফলিত করে। এই কথাটা যে কার্যকারণতার নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়েলস তা দেখতে পান না। বিপরীতভাবে, তিনি ধরে নেন যে তাঁর মনের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অবস্থিত প্রত্যয়গুলি তাঁর শিক্ষা ও পরিবেশের সাহায্যে রূপ পায়নি, বরং সেগুলি হল অনপেক্ষ ন্যায়বিচার ও সত্যের ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রত্যয়, অনির্বাণ এক স্ফুলিঙ্গ। পরিবর্তে তিনি মনে করলেন যে আশপাশের চেনা মানুষদের তালগোল পাকানো চিন্তা, অজ্ঞতা, অন্ধত্ব, দুষ্টামি, অপচয়প্রবণতা ও জঙ্গীপনা থেকেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের তালগোল-পাকানো জগৎটা সৃষ্টি হয়েছে ; যেন দাগ-না-কাটা শূন্য মন নিয়ে মানুষের জন্ম হয়নি, এই জগতে তারা শিক্ষালাভ করেনি, যেন আচমকা এই পৃথিবীতে তারা এসে পড়েছে এবং তাদের ইচ্ছায় অঙ্গুলি হেলনে এই অসহায় পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে। এ হল জ্ঞান অর্জন থেকে সত্তার সৃষ্টি, চিন্তার স্বাধীনতা ও তার মুখ্যতার সেই পুরাতন বুর্জোয়া ভ্রম। সর্বদাই যেমন হয়, এক্ষেত্রেও সেই রকম মানুষের ইচ্ছা জিনিসটা নিজেই স্বাধীন বলে বিশ্বাস করা হল, এবং তার স্বাধীনতা যাতে বাস্তবায়িত হয় এমন অবস্থার সৃষ্টি করে বলেই সেটাকে যে কেবল বিশ্বাস করা হল তা নয়। ইতিহাসের যে রূপরেখা ওয়েলসকে বিখ্যাত করেছিল, বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা তাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন এই কারণে যে তাতে অমুক অমুক ঘটনাকে অবহেলা করা হয়েছে, ছোটখাটো ভুল তথ্য তাতে আছে, বড় বড় লোকদের নস্যাৎ করা হয়েছে তাতে ; কর্মনীতির 'নতুন' ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বরং বিপরীত। এই রূপরেখার মত বুর্জোয়া ইতিহাসের এত ভালো ক্ষুদ্র সংস্করণ আর কখনও লেখা হয়নি। এখানে কোনও শ্রেণীভেদ নেই। হৌলিহানের [Houlihan] বৃটানিয়া ও ক্যাথ্‌লিনের মত উপজাতীয় গোষ্ঠীদেবতার সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের নিজেকে একাত্ম করার ফলেই যুদ্ধের জন্ম। 'রূপরেখার' মত বৈশিষ্ট্য এই যে এতে ঐতিহাসিক বিকাশের কোনও কার্যকারণগত উপস্থাপনা আদৌ নেই। যার ফলে মানুষের এই চমকপ্রদ ও মহান ইতিহাস, বিষয়বস্তুর দিক থেকে যা এত সমৃদ্ধ, প্রচেষ্টার দিক থেকে

এত তীব্র, গুণ ও প্রক্রিয়ার দিক থেকে এত নিত্য নতুন—সেই ঐতিহাসিক বিকাশকে মতাদর্শগত নিরর্থকতার এক দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। সেই দুঃস্বপ্নের জগতে যুক্তিজ্ঞানরহিত রাজা, বিজ্ঞানসম্মতচিন্তারহিত রাষ্ট্রনীতিবিদ আর শুভচিন্তা-সম্পন্ন ধর্মীয় নেতারা তাদের হতভাগ্য অনুবর্তীদের এক আলেয়ার ছায়ানৃত্যে সামিল করছে—সে এক হতাশায় ভরা দৃশ্য; আর তারই মধ্যে মাঝে মাঝে কেবল শোনা যায় ওয়েলসের ক্রুদ্ধ উপদেশ।

ওয়েলস সেই পুরাতন বুর্জোয়া অনুমানটি গ্রহণ করেছেন যে প্রতিটি মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের অভাব ও স্বপ্নই সামাজিক সম্পর্কের জগৎটিকে আকার দেয়। এবং সামাজিক সম্পর্কের জগৎটাই যে মানুষের অভাব ও স্বপ্নকে গড়ে তোলে এবং সেটা যে আবার সামাজিক সম্পর্কের জগতের উপর ঘাত-প্রতিঘাত ক'রে ঐতিহাসিক বিকাশের অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়, একথা তিনি গ্রহণ করেন না। স্বভাবতঃই এই কারণের ফলে ওয়েলস এই 'যুক্তিসঙ্গত' সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটাতে হলে বিশ্বাসজনকভাবে এবং আকর্ষণীয়ভাবে তাদের কাছে উপদেশ দিতে হবে, আর তাহলেই যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করা যাবে তাই অর্জন করা যাবে। তাছাড়া, যেহেতু তিনি ধরে নেন যে মানুষ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কটা হল সম্পূর্ণ তরল, মন যা চাইবে তাই পরিবেশ থেকে গড়ে নিতে পারে, সেইজন্য খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই পয়ঃপ্রণালী, ন্যায়নীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সমেত পুরাপুরি পরিকল্পিত একটা কাল্পনিক সুখরাজ্যের খসড়া করা তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে তিনি মনে করেন, যাতে তাঁর স্বমতে নিয়ে আসা পাঠকরা এই পরিকল্পিত সুখরাজ্যকে গড়ে তুলতে পারেন। এবং যেহেতু এই কল্পরাজ্য যেদিন তিনি লিখছেন সেদিন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া মতাদর্শ অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিকল্পিত, সেইজন্য তাঁর এই উদ্ভট বিভ্রম দেখা দেয় যে এটাই হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ এবং (প্রকৃতপক্ষে) মার্ক্সবাদ হল অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের, প্রথম ধাপ হিসাবে ওয়েলসের প্রয়োজন হল কার্যকারণতার যাবতীয় নিয়মের জায়গায় মনের স্বাধীন ক্রিয়াকে স্থাপিত করা, এবং তাঁর পুরাপুরি মানসিকতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ব্যাপারটি তাঁর নজরেই পড়ে না, এবং যে নীতিগুলির উপর তাঁর তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে তিনি বুঝতেও পারেন না। মার্ক্সের গোটা উদ্দেশ্যটাই যে ছিল ইতিহাসকে কার্যকারণতার দিক থেকে লেখা, একথাটা বিজ্ঞানের শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও ওয়েলস কখনও উপলব্ধি করেছেন কিনা সন্দেহ। 'প্রকৃতির' অন্ধ শক্তিগুলির দ্বারা সামাজিক বিকাশ আপাতঃদৃষ্টিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলেই যে মন্দা ও যুদ্ধের সৃষ্টি হয় বুর্জোয়া জগতে তা দেখা যায়। অথবা সাম্যবাদের

আসলে দেখা যায় সামাজিক বিকাশ সমাজের সচেতন এবং সেই কারণে পরিকল্পিত শক্তিগুলির দ্বারা তা উত্তরোত্তর নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই প্রতিভাসের নীচে একটা কার্যকারণগত সম্পর্ক থাকে। বুর্জোয়ারা যেহেতু কার্য-কারণতাকে অস্বীকার করে, ওয়েলস যেমন করেছেন তাঁর 'রূপরেখা' পুস্তকে, এবং কমিউনিস্টরা যেহেতু সেটার উপরেই জোর দেয় এবং তার নিয়মগুলি আবিষ্কার করে, সেই কারণে সাম্যবাদের যুগে মানুষ স্বাধীন হয়ে ওঠে। আদিম বর্বর মানুষ যেমন বস্তুগত কার্যকারণতার জায়গায় পুরাণকে বসিয়ে বস্তুগত কার্যকারণতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, সেই রকম নিয়মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ হল সেই নিয়ম-গুলির দাস হয়ে পড়া। সেগুলির উপর জোর দেওয়া বা সেগুলিকে আবিষ্কার করার অর্থ হল সেগুলির প্রভু হয়ে ওঠা। বিজ্ঞানীরা সেটাই করে থাকেন।

এই পরবর্তী দিনগুলিতে আমাদের দুর্দশাক্লিষ্ট জগতের জন্য কোনও আশাই ওয়েলসের নজরে পড়ে না। ধ্যানধারণার যে বৃত্ত তাঁর মনকে শাসন করে সেগুলি বুর্জোয়া ধ্যানধারণা। অতএব সেই ধ্যানধারণার মধ্যে কোন্ আশার অস্তিত্ব সম্ভবপর? বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে আজ কেবলমাত্র দুটি বিকল্প বর্তমান হয় ভেঙে পড়া, না হয় ফ্যাসিবাদ। আর শেষ পর্যন্ত দুটি একই ব্যাপার। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওয়েলসের সমস্ত কাল্পনিক সুখরাজ্য এই দুই বিকল্পের চারদিকেই আরও বেশি বেশি করে আবর্তিত—একদিকে নিউ ডীল, সামুরাই চালিত রাষ্ট্র, প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের ফলে সৃষ্ট এক দানবীয় অতি-সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক বিশ্বরাষ্ট্র। অপর দিকে, 'শেপ অব থিংস টু কাম' পুস্তকে যেমন দেখা যায়, পরিপূর্ণ ভাঙন। শুধু থাকে অস্পষ্ট এই বিশ্বাস যে, কোনও এক অনির্দিষ্ট উপায়ে, কোনও এক সুদূর প্রান্তে, যাবতীয় সমস্যার এক অলৌকিক সমাধান হয়ে গিয়েছে; আর এই কাল্পনিক সুখরাজ্য থেকে ঝকঝকে বিমানে চড়ে এক ত্রাণকর্তা এসে উপস্থিত হয়েছেন যিনি এক স্বর্গীয় আমলার মত উপর থেকে সব কিছু ঠিকঠাক করে দেবেন।

এই সব কাল্পনিক সুখরাজ্যের মধ্য দিয়ে চিন্তার এক নিঃসঙ্গ দারিদ্র্যই উদঘাটিত হয়। কর্মবিবর্জিত যে চিন্তা ভবিষ্যতের কল্পনা করে তা ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির উপর বর্তমানের হতাশাজনক দারিদ্র্যকে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। এই সব বুর্জোয়া স্বপ্নের সুখরাজ্যগুলি এবং তাদের সামান্যীকরণগুলি (standardisations) মানুষের কাছে যে সব জাতীয় বৈশিষ্ট্য খুবই চিত্তগ্রাহী সেগুলির বিলোপসাধন; তাদের বৈশিষ্ট্যবর্জিত, ব্যবসায়ভিত্তিক স্বাস্থ্যসম্মত সুপ্রজননবাদী, আর্য-ফ্যাসিবাদী একধর্মিতা,—আমাদের কেবল যে প্রলুব্ধ করে না তাই নয়, আমাদের মনকে সেগুলি বিদ্রোহী করেও তোলে। ভবিষ্যতের মধ্যে যদি

এর থেকে বেশি কিছু ধারণ করা না থাকে তাহলে আমরা বলি সভ্যতা জাহান্নামে যাক। সেগুলি আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না, বরং আমাদের পিছু টেনে ধরে এবং হতাশ্বাস করে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের এই কথাই বলে যে ব্যাপারটা অন্যরকম। চিন্তার উপর এখানে নির্ভর করা যায় না। চিন্তা যতক্ষণ চিন্তারই চারপাশে আবর্তিত হতে থাকে ততক্ষণ তা গতিহীন এবং তত্ত্ববিদ্যাবাদী যুক্তিবিদেরই মত নতুনের বা আরও জটিল কিছুর জন্ম দিতে তা অক্ষম। কেবল ইতোমধ্যেই যেসব উপাদানকে তা ধারণ করেছিল, কর্মের দ্বারা ইতোপূর্বেই যা অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রদত্ত ছিল, কেবল সেগুলিকেই সে নতুনভাবে হেরফের করে বিন্যস্ত করতে সক্ষম। কর্মই হল সমৃদ্ধিশালী ও সৃজনশীল; সত্তা অবিরাম নতুন নতুন সামগ্রিক আকার (pattern) ও উন্নততর জটিলতা গড়ে তুলছে। রহস্যহীন সেই রহস্য শব্দটির থেকে কর্ম অনেক বেশি রহস্যময়। খৃষ্টীয় স্বর্গরাজ্যের মত যে কাল্পনিক সুখরাজ্য বর্তমানের ইন্দ্রিয়পরায়ণ আনন্দগুলিকে পুনরাবৃত্ত করে, অথবা 'বচন যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, অথবা হৃদয় যাহাকে ধারণা করিতে পারে না' —এই ধরনের নঞর্থক সিদ্ধান্তের আশ্রয় নেয়, কর্ম সেই কাল্পনিক সুখরাজ্যের থেকেও অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ও অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর। বিকাশের প্রক্রিয়াই হল কর্ম, এবং আমাদের সীমিত চিন্তা আজ যা ধারণা করতে পারে না, কর্ম তারই জন্ম দেয় এবং সেই কাজ করার দ্বারা যেসব সমৃদ্ধতর চিন্তা আমরা করতে আগ্রহী অথচ অক্ষম, যে সব স্বপ্নে আমরা কেবল পাওয়ার স্বপ্ন দেখি সেই সব স্বপ্নকে সম্ভবপর করে তোলে। চিন্তা কি তাহলে নিতান্তই বৃথা, সত্তার সমুদ্রের অশান্ত আলোড়নের উপর এক আপতিক দীপ্তি মাত্র? না, কারণ চিন্তা হল সত্তা, সত্তার একটা অংশ। যে কর্মকে আমরা মুখ্য বলে মনে করি সেই কর্মকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যে কর্ম, তারই অংশ হিসাবে ইতিহাসের দিক থেকে তা বিকশিত। এই কর্ম আবার সত্তার উপর নতুন আলোকপাত করে। প্রতিটি স্তরে চিন্তাকে কর্ম থেকে প্রশ্নের সন্ধান করতে হবে এবং কর্ম থেকে যে শিক্ষা সে লাভ করেছে তা নিয়ে নতুন চিন্তনে ফিরে আসতে হবে, যা নতুন কর্মের দিকে আবার এগিয়ে যাবে। জ্ঞাত ও প্রভাবিত জগতের সীমানা এইভাবে অবিরাম বিস্তৃত হতে থাকে, এবং চেতনার মধ্যে তার প্রতিরূপ অবিরত গভীরতর ও জটিলতর হতে থাকে। কেবল বিজ্ঞানেরই নয়, যত কিছু চিন্তা আছে তারও বিকাশের নিয়মই হল এই। চিন্তার কাজ এই নয় যে তার জরাজীর্ণ প্রত্যয়গুলিকে নতুন করে বিন্যস্ত করে নতুন একটা হলেও-হতে পারত জগৎ গড়ে তুললেই তা থেকে কর্ম দেখা দেবে, এই আশা করা। চিন্তার কাজ হল সত্তার গভীরে অনুসন্ধান ক'রে তার কার্যকারণগত গঠনকে উদ্ঘাটিত করা এবং

সেই কার্যকারণগত গঠন থেকে ভবিষ্যৎ সত্তার সম্ভাবনাগুলিকে আহরণ করা। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে মানুষ ইতোমধ্যেই সেটা করেছে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ পদার্থের প্রয়োজনীয়তাকে জানার ফলে সেগুলির থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি এবং ঐসব নিয়মগুলির চৌহদ্দির মধ্য থেকে আমরা আপন ইচ্ছা মত তাদের বশীভূত করতে পারি। সমাজের ক্ষেত্রে কার্যকারণগত গঠনকে মার্ক্স সেই ভাবেই উদ্ঘাটিত করেছেন। বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের গতিবিষয়ক প্রধান প্রধান নিয়মগুলিকে উদ্ঘাটিত করে মার্ক্স সেখানে চিন্তা কিভাবে এই উদ্ঘাটিত মূল বুননটিকে অনুসরণ করে, তা দেখিয়েছেন। কর্মের দ্বারা, সমাজ বিপ্লবের দ্বারা সামাজিক সম্পর্কের এই বুননকে অনুসরণ ক'রে চিন্তা মানুষকে মানুষ হিসাবে নিজের সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন করে তুলতে পারে। এবং নিজের স্বাধীনতা অর্জন করার উদ্দেশ্যে সমাজ সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে তা মানুষকে সক্ষম করে তোলে। এইভাবে কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যবাদীরা তাদের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে যখন ভবিষ্যতের মধ্যে প্রক্ষেপ করে (project) এবং সত্তা তার সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠবে বলে আশা করে, কি করে তা অবশ্য তারা জানে না, তখন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীদের চিন্তার বিষয় হল বর্তমান সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যকার কোন্ ত্রুটির ফলে তার আকাঙ্ক্ষাগুলির জন্ম হয়েছে এবং বর্তমানের মধ্য থেকে ধাপে ধাপে সুষ্ঠু সামাজিক সম্পর্কের কোন্ নতুন ব্যবস্থার দিকে এই লক্ষণটি নির্দেশ করছে তার সন্ধান করা। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক যখন আর অন্ধভাবে মানুষকে পীড়ন করবে না, বরং মানুষ হয়ে উঠবে প্রকৃত স্বাধীন সেই জগৎটা কেমন দেখতে হবে, সেই ভবিষ্যৎ-চিত্র আমরা নিজেরা কি করে যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারব? আমাদেরই জরাজীর্ণ সামাজিক সম্পর্কগুলি সেই ধ্বংসের জাল বুনেছে। আমরা ত এক পতনোন্মুখ জগতের সন্তান।

এইভাবে সত্তার সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সমন্বয়কে (integrity) স্মরণে রাখার ফলে চিন্তা একটা ইতিহাস আয়ত্ত করে ও পরিবর্তিত হয়, এবং কর্মের অবশিষ্ট অংশের কাছেই ফিরে আসে তাকে সমৃদ্ধ ও পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে। চিন্তার এই যে ক্ষমতা, তা সে লাভ করে শুধু বুর্জোয়ার তত্ত্বের মধ্যেই। বুর্জোয়ার ব্যবহারিকপ্রয়োগের মধ্যে কিন্তু এই ক্ষমতার অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। বুর্জোয়া-তত্ত্বের ক্ষেত্রে চিন্তা প্রয়োজনমুক্ত এবং সেই কারণে বুর্জোয়া-প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের (necessity) মুখোমুখি হলে তা অসহায় হয়ে পড়ে। মার্কসবাদী তত্ত্বে চিন্তা প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন এবং সেই কারণেই তা স্বাধীন। চিন্তা ও চেতনাকে আদি গতিদাতা (prime movers) ব'লে বিশ্বাস ক'রে ওয়েলস তাঁর অনপেক্ষ সত্তা

(absolute truth) ও ন্যায়বিচারকে [justice] 'জনপ্রিয়' করার জন্য এবং সেগুলিকে উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক, সুস্পষ্ট ও সহজপাঠ্য করার জন্য সারা জীবন ব্যয় করেছেন। হাজার হাজার লোক তাঁর লেখা পড়েছেন, কিন্তু ঠিক সেই 'জনপ্রিয় করে তোলার' কারণেই তাঁর রচনা হয়ে উঠেছে বৃথা পক্ষচালনা। কারণ, হাজার হাজার লোকের কাছে তাঁর আবেদনের কারণটা এই যে, তাঁর পাঠকরাও তাঁরই মত একই বুর্জোয়া তত্ত্ববিদ্যার আবর্তে বাঁধা পড়েছেন, যেখানে চিন্তা বারম্বার নিজেরই চারদিকে আবর্তিত এবং তা কর্মের মধ্যে প্রকাশ পাওয়ার বা বাস্তবের সংস্রবে আসার কোনও পথের সন্ধান পায়নি। অথচ মার্ক্স, যিনি জনপ্রিয়তার কাছে কোনও নতিস্বীকার করেননি এবং তাঁর তত্ত্বকে চিত্তাকর্ষক করার কখনও চেষ্টা করেননি, যিনি সামাজিক প্রয়োজনের কাছে চিন্তার অধীনতা প্রচার করে গিয়েছেন এবং সুন্দর সুন্দর কাল্পনিক সমাজের পরিকল্পনা রচনায় কোনও সময় নষ্ট করেননি—এই মার্ক্সই বুর্জোয়া জগৎকে কাঁপিয়ে তুলেছেন বলে মনে হয়। মার্ক্সের রচনাই পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশের সরকারকে উৎখাত করে এক নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে বলে দেখা যায়। এই মার্ক্সের ধ্যানধারণাগুলিই অবশিষ্ট পাঁচ অংশে সর্বদা সামাজিক কর্মের সূচিমুখ হয়ে উঠেছে এবং সমস্ত দেশে বিপ্লবের সক্রিয়শক্তিগুলির কেন্দ্রবিন্দু সৃষ্টি করেছে। ওয়েলসের পতাকাকে অনুসরণ করে কোনও মানুষ সক্রিয় হয়ে ওঠেননি। চিন্তা একা যদি সত্তার সঙ্গে সংযোগনিরপেক্ষভাবে বাস্তবিকই 'তার নিজ অধিকার বলে' জগৎকে চালিত করে, তাহলে মার্ক্সের ধ্যানধারণাগুলি, এত অল্প 'প্রচারের' সাহায্যে যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আবেগগত আবেদন, সুন্দর সুন্দর ভাব ও অলীককল্পনা যেখানে একেই অবর্তমান, কাব্য ও যৌন-আবেদনের দিক থেকে যা এতই রিক্ত, তা কি করে বাস্তবকে জয় করেছে বলে মনে হল? মার্ক্সের এক বুর্জোয়া সমালোচক সম্পূর্ণ অ-সচেতনভাবে সত্যটি অনুধাবন করেছেন। তিনি বলেছেন, মার্ক্স কোথাও বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্ম দেননি। বিপ্লবী কার্যকলাপের পুনরুদ্ভবই মার্ক্সের-'পুনরুদ্ভব ও পুনঃপ্রসার' ঘটিয়েছে। আর কথাটা ঠিকই। মার্ক্সের মতাদর্শের এই প্রচণ্ড ক্ষমতা সেই মতাদর্শের রূপ থেকে আহৃত নয়, সমকালীন সামাজিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু থেকে তা আহৃত। মর্লক ও এলোয়াদের মধ্যে প্রতীকায়িত নিজের পেটিবুর্জোয়া ধ্যানধারণার সন্ধান করার উদ্দেশ্যে কাল-যন্ত্রের (time-machine) পিঠে চেপে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করার বদলে সমকালীন বুর্জোয়া সত্তার অন্তরকে মার্ক্স ভেদ করলেন এবং বুর্জোয়া মতাদর্শকে অতিক্রম করে বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোর মধ্যে তিনি প্রবেশ করলেন। এইভাবে যে কার্যকারণগত নিয়মগুলি তিনি আবিষ্কার করলেন সেগুলিকে তাঁর রচনায় মেলে ধরে সেই বিপ্লবের

কার্যকরী সংগঠনটাই [machinery of revolution] তিনি সম্ভবপর করে তুলেছেন যা কর্মের দ্বারা সামাজিক সম্পর্কগুলিকে পরিবর্তিত করবে। ঠিক যেমন বিজ্ঞানীর হাতে প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কারের ফলে সেই নিয়মের মধ্যে সামান্যী কৃত প্রতিভাসকে ইচ্ছামত সৃষ্টি করার উপযোগী যন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। মার্ক্সের মতাদর্শের পিছনে রয়েছে আমাদের যুগের সামাজিক শক্তিগুলির যাবতীয় চাপ। প্রতিটি মন্দা, প্রতিটি যুদ্ধ, প্রতিটি নতুন ব্যবসায়িক লেনদেন, পুঁজির প্রতিটি ঘনীভবন, প্রতিটি নতুন শোষণ, বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের বিকাশের প্রতিটি মুহূর্ত মার্ক্সের মতাদর্শে নতুন শক্তি যোগ করছে এবং তুষার যেমন মাটিকে ফাটিয়ে দেয় সেইরকম বুর্জোয়া চিন্তার অনুর্বরতায় দীর্ঘকাল নিদ্রাচ্ছন্ন আমাদের মনকে আগামী-দিনের উদয়োন্মুখ চেতনার জন্য প্রস্তুত করে তুলছে।

ওয়েলসের ট্র্যাজেডিটা এই যে সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে সমসাময়িকদের মধ্যে যাঁরাই আগ্রহী এবং বর্তমান সামাজিক সম্পর্কগুলির নৈরাজ্য যাঁরাই লক্ষ্য করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনিই সব থেকে কম সমাজতন্ত্রবাদী ও মার্ক্সবাদ থেকে সব থেকে দূরে আছেন। আর সেটাও হয়েছে তাঁর পেটিবুর্জোয়া মনের কারণেই।

বুর্জোয়া যখনই তাব নিজ শ্রেণীর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা ও অবক্ষয় দেখে বিরক্ত হয়ে পড়ে তখন স্বভাবতঃই সে সর্বহারা শ্রেণীর দিকে তাকায় এবং যেহেতু তাদের সে হীন পশু হিসাবে দেখতেই শিখেছে সেইজন্য লোকে যেমন পশুকে করুণা করে সেই রকম তাদের উপর করুণাব দৃষ্টিতে সে তাকায়। তারা যে সব থেকে বেশি দুর্দশাক্লিষ্ট শ্রেণী এই হিসাবে তাদের দেখতে সক্ষম হয় এবং সর্বাধিক দুর্দশাক্লিষ্ট শ্রেণী হিসাবে সর্বহারা শ্রেণীর প্রতি এই করুণায় ভাসেরমান, টলের, তলস্তয় ও বারবুসের রচনা দীপ্যমান এবং শ ও গলসওয়ার্দির রচনাতেও তারই উষ্ণস্পর্শ। ওয়েলসের রচনায় এর কোনও চিহ্নমাত্র নেই, কারণ ওয়েলস আসছেন সেই শ্রেণী থেকে যে-শ্রেণী সর্বহারাকে নিষ্ক্রিয়, অধম পশু হিসাবে দেখে না, বরং একটা নোংরা, মন্দ, বিপজ্জনক ও তাদের খুব কাছাকাছি বাস করা কিছু বলে তাদের মনে করে। পেটিবুর্জোয়া নরক থেকে উপরে ওঠার জন্য ওয়েলস এতই ব্যস্ত যে এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার মত বা সত্য জানার মত সময় তাঁর কখনও হয়নি।

সর্বহারা সব থেকে বেশি দুর্দশাক্লিষ্ট এক শ্রেণী। এই প্রত্যয়টি বিরক্ত বুর্জোয়াকে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ করে তোলে। সেটা আবেগ ও মানবতাবোধের এমন এক উৎস হয়ে ওঠে যা ভাসেরমানের খৃশ্চিয়ান ভাহ্‌নশাফ (Christian Wahnschaffe-Schaffe) পুস্তকে খুবই স্পষ্ট। এই ধরনের লেখকের রচনায় ওয়েলসের অবাস্তবতা বা আবেগগত বন্ধ্যাত্ব কখনই দেখা দেয় না। খৃশ্চিয়ান ভাহ্‌নশাফ তার পিতার উদ্দেশ্যে যেমন

চিৎকার করে বলে উঠেছিল সেইভাবে এই লেখকরা সর্বহারার দুর্দশার ক্রোধাগ্নিতে দীপ্ত হয়ে বলতে পারেন :

"মানুষ যা করে তা থেকে যে অন্যায়ের জন্ম তা স্বল্প এবং মানুষ যা করতে পারে না তা থেকে যে অন্যায়ের জন্ম তার সঙ্গে এর তুলনা সম্ভব নয়। কারণ, যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য দোষী তারা শেষ অবধি কি ধরনের লোক? তারা গরীব, হতভাগ্য, তাড়িত, মরীয়া, অর্ধোন্মাদ জীব, যারা নিজেদের তুলে ধ'রে যে পায়ের তলায় তারা পিষ্ট সেই পায়ে কামড় বসায়। অথচ তাদেরই দায়ী করা হয়, দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সীমাহীন যন্ত্রণা দিয়ে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু যারা তাদের কর্মের ব্যর্থতার জন্য দোষী তারা নিস্তার পেয়ে যায় এবং তারা সর্বদাই নিরাপত্তাপুষ্ট, এবং অছিলা ও অজুহাত তাদের হাতের কাছেই প্রস্তুত এবং সেগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণও বটে, অথচ আমি যতদূর দেখতে পাই, তারাই হল প্রকৃত অপরাধী। তাদের থেকেই যাবতীয় অন্যায়ের জন্ম।"

ওয়েলস তাঁর 'মর্লকদের' কখনই সেভাবে দেখতে পান না যেভাবে ভাসেরমান তাদের দেখেছেন। 'গরীব, হতভাগা, তাড়িত, মরীয়া, অর্ধোন্মাদ জীব' হিসাবে ভাসেরমান তাদের দেখেছেন। সর্বহারা শ্রেণী যে 'যন্ত্রণার অগ্নিতে দগ্ধ', শোষিত, সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত, সর্বদা এবং সর্বত্র সর্বাধিক দুর্দশাক্লিষ্ট শ্রেণী, এই কথা ভেবে ওয়েলস কখনই ক্ষোভে ফেটে পড়তে বা অস্থির হয়ে উঠতে পারেন না।

অথচ সর্বহারা শ্রেণীই যে সর্বাধিক দুর্দশাক্লিষ্ট শ্রেণী এই উপলব্ধিতে পৌঁছানোর পরেও বুর্জোয়া শ্রেণী যে সমাজের মধ্যে নিজেকে দেখতে পায় তার বাস্তবতাকে বুঝতে তাকে কত দূর পথই না পার হতে হয়! কারণ তাকে বুঝতেই হবে যে এই সর্বাধিক দুর্দশাক্লিষ্ট ও শোষিত শ্রেণী, এই দুর্ব্যবহারপ্রাপ্ত পশুর দল একটা অতীব ভিন্ন ধরনের কিছু: তারা হল সমকালীন সমাজের একমাত্র সৃজনশীল শক্তি। এই যে শ্রেণী যাকে সান্ত্বনা দিতে, মুক্ত করতে ও যার দুর্দশা লাঘব করতে সে এগিয়ে আসছে সেই শ্রেণীরই বরং দায়িত্ব হল তাকে সান্ত্বনা দেওয়া, মুক্ত করা ও তার দুর্দশা লাঘব করা। যুদ্ধ, পুঁজিবাদী নৈরাজ্য ও মন্দা দ্বারা ক্লিষ্ট এই দুর্দশাভোগীদেরই এই অন্যায়গুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং সেগুলিকে ধ্বংস করতে হবে। যৌবনকালে দেখা জগতের যে ধ্বংসস্তূপ সর্বহারাদের উপর ভেঙে পড়তে তারা দেখছে তাদেরই সেটাকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং আরও বড় করে পরিকল্পনা করতে হবে। এই লজ্জাজনক জ্ঞান একমাত্র নিজের সহজপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়েই লাভ করা যায়। যে সামাজিক সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে সে বাস করে সেই

কাঠামো সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। আর যাবতীয় জ্ঞানের মধ্যে এই জ্ঞানটি অর্জন করাই হল বুর্জোয়ার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন। ওয়েলস সেখান থেকে লক্ষ যোজন দূরে। বিপর্যস্ত তীর্থযাত্রীর এক দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন দল চিন্তা ও সত্তার বিপ্লবের পথ ধরে চলেছেন। অতি অল্পসংখ্যক বুর্জোয়াই সে পথে আজ পর্যন্ত উপস্থিত হতে সক্ষম হয়েছেন।

পাঁচ

নিষ্ক্রিয়তাবাদ ও হিংসা

বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে একটি আলোচনা

বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। সতীত্ব, গাম্ভীর্য, পরিত্রাণ ও পরিচ্ছন্নতা এখন আর এমন কোনও আলোচ্য বিষয় নয় যেগুলি সম্পর্কে বুর্জোয়া গভীরভাবে অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে, একটি মাত্র বিষয়ই আছে যার সম্পর্কে বুর্জোয়া বিবেক আজ সক্রিয় হয়ে ওঠে। বুর্জোয়া মতবিশ্বাসের (creed) মধ্যে যা সর্বদাই নিহিত সেই নিষ্ক্রিয়তাবাদ আজ প্রোটেস্টান্টপন্থী খৃষ্টধর্ম বা তার সমধিক বুর্জোয়া 'ভাববাদের' মধ্যকার আবেগপূর্ণ বিশ্বাসের একমাত্র অবশেষে এসে দাঁড়িয়েছে।

এটাকে আমি একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে বুর্জোয়া বিশ্বাসমূলক তত্ত্ব (doctrine) বলছি। কারণ, নিষ্ক্রিয়তাবাদ বলতে আমি বোঝাতে চাইছি যা সুনির্দিষ্ট ধরনের কর্ম দ্বারা অর্জন করা যায় এমন কোনও শান্তিকামনা নয়; যা হল এই বিশ্বাস যে, অপরের উপর সমাজিক বাধানিষেধের যে কোনও রূপ বা যে কোনও হিংসাত্মক কর্মই হল অন্যায় এবং যুদ্ধের মত কোনও হিংসাকে **নিষ্ক্রিয়ভাবেই** প্রতিরোধ করতে হবে। কারণ হিংসা দ্বারা হিংসার অবসান ঘটানো তর্কশাস্ত্রের দিক থেকে স্ববিরোধী। নিষ্ক্রিয়তাবাদকে (pacifism) আমি এই অর্থে সাম্যবাদী মতাদর্শের বিরোধী হিসাবে উপস্থাপিত করছি যে শান্তি অর্জনের একমাত্র পথ হল সমাজ ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং শাসকশ্রেণী হিংসাত্মকভাবে বিপ্লবকে প্রতিরোধ করে, আর সেই কারণে বলপ্রয়োগের দ্বারা তাকে উৎখাত করতেই হবে।

কিন্তু আধুনিক যুদ্ধও ত বৈশিষ্টপূর্ণভাবে বুর্জোয়া। বুর্জোয়া শক্তিগুলির অসম সাম্রাজ্যবাদী বিকাশ থেকে গত মহাযুদ্ধের মত সংগ্রামগুলির জন্ম হয়েছে, এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলিও বুর্জোয়া অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষ্যগুলির উদ্দেশ্যেই লড়া হয়েছিল; অথবা শিশু ডাচ প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধগুলির মত, সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিকাশশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর সংগ্রামগুলিরই তা প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ফ্যাসিবাদের শেষ স্তরে, গণতান্ত্রিক রূপগুলি যখন আর তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছে না বলে পুঁজিবাদ সেগুলিকে পরিত্যাগ ক'রে প্রকাশ্য হিংসার সাহায্যে শাসন চালায়, বুর্জোয়া সংস্কৃতিকেও তখন আক্রমণাত্মকভাবে জঙ্গী চেহারায় দেখা যায়। জঙ্গীয়ানা ও নিষ্ক্রিয়তাবাদ, ভীরুতা ও হিংসা উভয়কেই যখন আমরা চারিত্রিক দিক থেকে

বুর্জোয়া বলি তখন আমরা মার্ক্সবাদীরা কি কেবল বিচার-বিবেচনা না করে তাকে চিহ্নিত করি ?

না, তা আমরা করি না, যদি আমরা দেখাতে পারি যে যাবতীয় যুদ্ধ এবং যাবতীয় নিষ্ক্রিয়তাবাদকেই আমরা বুর্জোয়া বলছি না, এবং হিংসার কয়েকটি বিশেষ ধরনকেই আমরা তা বলছি ; এবং সেইসঙ্গে একটি মূলগত বুর্জোয়া অবস্থান কিভাবে এই দুই আপাতঃবিরোধী দৃষ্টিকোণেরই জন্ম দিচ্ছে তাও আমরা যদি দেখাতে পারি। যখন দুটি দর্শন, যা আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী—যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও ভাববাদ—দুটিই বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে বুর্জোয়া এবং দুটিরই উৎপত্তি একই বুর্জোয়া পূর্ব অনুমান (assumption) থেকে হয় বলে দেখিয়ে আমরা সেই একই কাজ করেছিলাম।

বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদ বৈশিষ্টপূর্ণ এবং তা, যেমন ধরুন, প্রাচ্যদেশীয় নিষ্ক্রিয়তাবাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, যেমন আধুনিক ইউরোপীয় যুদ্ধবিগ্রহকে সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। তাদের সামাজিক প্রকাশগুলিই (manifestations) যে কেবল ভিন্ন তাই নয়—দুটি সংস্কৃতির বিভিন্ন সামাজিক সাধনযন্ত্র (social organ) থেকে স্বভাবতঃই তাদের উৎপত্তি। বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদ, যেমন ধরুন সীমান্তগামী সৈন্যবাহী ট্রেনের লাইনের উপর বসে থাকা কোনও ভারতীয় নিষ্ক্রিয়তাবাদী গোষ্ঠীর মত একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠীর রূপ নেবে, একথা মনে করার অর্থ হল বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং কোথা থেকে সেটা তার এই চরিত্র পেল সে সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা। বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদের উদাহরণ গান্ধী নয়, ফক্স। বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদের মূল সুরটি প্রকাশ করছেন দি সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস। তা হল ব্যক্তিগত প্রতিরোধ।

বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদের জন্ম কিভাবে হয় তা বুঝতে হলে বুর্জোয়া হিংসার জন্ম কিভাবে হয় তা আমাদের বুঝতে হবে। সামন্ততান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী হিংসা ঠিক যেভাবে হয় সেইভাবেই এর জন্ম হয় ঐ সমাজব্যবস্থার বিশিষ্ট অর্থনীতি থেকে। মার্ক্সই প্রথম এই ব্যাখ্যা দেন যে বুর্জোয়া অর্থনীতির বৈশিষ্টগুলি হল এই : সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা রুদ্ধগতি ও উৎপাদনের দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়া বুর্জোয়া শ্রেণী সামাজিক সংগঠনের অভাবের মধ্যে,প্রত্যেক মানুষই তার নিজ যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নিজের লাভের জন্য নিজের কাজকর্ম চালানোর মধ্যে স্বাধীনতা ও উৎপাদনগত বিকাশ দেখতে পায়। আর বুর্জোয়া সম্পত্তি ও সেই সঙ্গে তার পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতাধর্মিতার (alienability) অনপেক্ষ চরিত্রের মধ্যে, এটা প্রকাশিত।

এই অধিকার অর্জনের জন্য তার সংগ্রাম সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার অবস্থানের তুলনায় তার অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতাকে সুনিশ্চিত করে। এই সংগ্রামের পরিস্থিতি এবং তার ফলাফল এই বুর্জোয়া স্বপ্নের জন্ম দেয় যে সামাজিক সম্পর্কগুলিকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করাই হল স্বাধীনতা।

কিন্তু এই ধরনের কোনও কর্মসূচি যদি কার্যকর করা হয় তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে সমাজের পরিসমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন ভেঙে পড়া। প্রত্যেকেই তখন কেবল নিজেরই জন্য সংগ্রাম করবে এবং সে যদি দেখে যে সে যেটা চায় অন্য লোকও সেটা চাইছে, তাহলে সে সেটা কেড়ে নেবে। কারণ, (পূর্ব-অনুমান হিসাবে) ধরে নেওয়াই হয়েছে যে সহযোগিতা জাতীয় কোনও সামাজিক সম্পর্কের অস্তিত্ব সেখানে নেই। যে সঞ্চয় ও দূরদৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্ভব তার তখন অস্তিত্ব থাকবে না। মানুষ হয়ে উঠবে পশু।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়ার সেরকম কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। সে বেঁচে আছে বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কব্যবসায়ের উপর। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ভিত্তি ছিল ভূমি; তার বিপরীতে পুঁজির উপর এখন বেঁচে আছে বুর্জোয়া। সেইজন্য 'সামাজিক বাধানিষেধ না থাকা' বলতে সে বোঝায় তার নিজের মালিকানার উপর, বিচ্ছিন্নতার উপর, বা যে পুঁজির উপর সে বেঁচে থাকে তা ইচ্ছামত সংগ্রহ করার উপর কোনও বাধানিষেধ না থাকা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি একটা সামাজিক 'বাধানিষেধ'। কারণ অন্য যাদের তা নেই তারা 'প্রকৃতির কোলে' থাকা অবস্থায় যা পেতে পারত সেই মালিকানা পাওয়ার ক্ষেত্রে 'বাধানিষেধপ্রাপ্ত'। কিন্তু পুঁজির উপর মালিকানাকে একটা পরিত্যাজ্য সামাজিক বাধানিষেধ হিসাবে বুর্জোয়া যে কখনও অন্তর্ভুক্ত করেনি সেটা শুধু এই কারণেই যে তার কাছে এটা আদৌ কোনও বাধানিষেধ নয়। এটাকে সেই হিসাবে দেখার কথাও সেইজন্য কখনও তার মাথায় ঢোকেনি এবং নিজের পুঁজিকে আঁকড়িয়ে থেকে বিশেষ সুযোগসুবিধা, একচেটিয়া অধিকার ইত্যাদি নির্মূল করার দাবিও কখনও তার কাছে সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয়নি।

তাছাড়া, একটা সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তি তার ছিল যা সে যখন আরও বেশি আত্ম-সচেতন হয়ে উঠল, তখন ব্যবহার করতে পারত। সামাজিক বাধানিষেধ একটা সামাজিক সম্পর্ক; অর্থাৎ মানুষে মানুষে একটা সম্পর্ক। প্রভু ও ক্রীতদাসের মধ্যকার সম্পর্ক একটা সামাজিক সম্পর্ক এবং সেইকারণে তা একজন লোকের স্বাধীনতার উপর অন্য একজন লোকের বাধানিষেধ। একইভাবে, প্রভু ও ভূমিদাসের মধ্যকার সম্পর্কটিও হল মানুষে মানুষে একটা সম্পর্ক এবং তা মানবিক স্বাধীনতার উপর একটা বাধানিষেধ। কিন্তু একজন মানুষ আর তার সম্পত্তির মধ্যকার সম্পর্ক হল একজন

মানুষ ও একটি সামগ্রীর মধ্যকার সম্পর্ক, এবং সেইকারণে তা অন্য মানুষদের স্বাধীনতার উপর কোনও বাধানিষেধ নয়।

এই যুক্তি অবশ্যই দোষদুষ্ট। কারণ সমাজের বন্ধন হিসাবে এই ধরনের কোনও বিশ্বজনীন সম্পর্ক থাকতে পারে না; বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যকার সম্পর্কের বেশেই মাত্র মানুষে মানুষে সম্পর্ক হতে পারে। আমি যদি বনে গিয়ে একটা বেড়ানোর লাঠি সংগ্রহ করি বা আমার আভরণের জন্য কোন একটা অলঙ্কার তৈরি করি সেই ক্ষেত্রেই কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বপক্ষে বুর্জোয়ার যুক্তিকে প্রয়োগ করা যায়; সামাজিক দিক থেকে গুরুত্বহীন তুচ্ছ সামগ্রী বা তৎক্ষণাৎ ভোগের সামগ্রীগুলির উপর অধিকারের ক্ষেত্রে সেই যুক্তি প্রয়োগ করা যায়। জনগোষ্ঠীর পুঁজি তৈরি হয় ভবিষ্যতে পণ্য উৎপাদনের জন্য আলাদা করে রাখা জনগোষ্ঠীর উৎপন্ন সামগ্রী দিয়ে (গোড়ার দিকের বুর্জোয়া সভ্যতায় তা ছিল আগামী দিনের শ্রমিককে খাদ্যশস্য, পোষাক, বীজ ও কাঁচামাল সরবরাহের জন্য, এবং আজকের দিনে সেই একই উদ্দেশ্যে এগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যন্ত্রপাতি ও কারখানা)। বুর্জোয়া অধিকার যখনই জনগোষ্ঠীর পুঁজির ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয় তখনই বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যকার এই সম্পর্ক হয়ে ওঠে মানুষে মানুষে সম্পর্ক; কারণ বুর্জোয়া এখন যা নিয়ন্ত্রণ করে তা হল জনগোষ্ঠীর শ্রম। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বুর্জোয়া মালিকানা এইখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, একদিকে জগৎ এবং সমাজ যা কিছু সৃষ্টি করেছে তা হল বুর্জোয়ার অধিকার আর অপর দিকে আছে নগ্ন শ্রমিক, নিজের দেহের চাহিদার তাগিদে যে বুর্জোয়ার কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয় যাতে করে নিজেকে এবং তার প্রভুকে সে খাওয়াতে পারে। বুর্জোয়া তার সেই শ্রমশক্তি ক্রয় করে একমাত্র তখনই যখন তা থেকে সে মুনাফা করতে পারে। এই সামাজিক সম্পর্ক সম্ভবপর একমাত্র পুঁজির উপর বুর্জোয়ার মালিকানার দ্বারা এবং সেটার উপরই তা নির্ভর করে। অর্থাৎ ক্রীতদাস বা ভূমিদাসের মালিকানাভিত্তিক সভ্যতায় মানুষে মানুষে একটা সম্পর্ক থাকে যেটা একটা প্রাধান্যবিস্তারকারী ও একটা বশ্যতাস্বীকারকারী শ্রেণীর মধ্যকার, বা শোষক ও শোষিতের মধ্যকার সম্পর্ক। বুর্জোয়া সংস্কৃতিতেও ঠিক সেইরকম একটা সম্পর্ক থাকে। কিন্তু পূর্বতন সভ্যতাগুলিতে যেখানে মানুষে মানুষের এই সম্পর্কটা ছিল সচেতন ও স্পষ্ট, বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে এটা মানুষে মানুষের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাধান্যবিস্তারকারী সম্পর্ক থেকে মুক্ত একটা ব্যবস্থা এবং মানুষ ও সামগ্রীর মধ্যকার কেবলমাত্র নিরীহ সম্পর্কই যেন সেখানে আছে, এই রকম একটা ব্যবস্থার ছদ্মবেশে তা ঢাকা থাকে।

অতএব যাবতীয় সামাজিক বাধানিষেধকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত

সম্পত্তির এই একটি বাধানিষেধ বজায় রেখে নিজে ন্যায়সঙ্গত কাজ করছে বলে বুর্জোয়া মনে করে। কারণ, তার কাছে এটা আদৌ কোনও বাধানিষেধ বলেই মনে হয় না ; এটাকে সে মনে করে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার, মৌলিক প্রকৃতিদত্ত অধিকার। এই তত্ত্বের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে প্রকৃতিদত্ত অধিকার বলে কিছু নেই। প্রকৃতিতে আছে কেবল পরিস্থিতি, এবং একজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অন্যেরা রক্ষা করবে এটা তার অন্যতম নয়। বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেবল বলপ্রয়োগের দ্বারাই সুরক্ষিত করা যায়—ঠিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজেরই মত, না-পাওয়ার দলের উপর পাওয়ার দলকে শেষ অবধি বলপ্রয়োগ করতেই হবে। এইভাবে দাস মালিক সভ্যতায় যেমন ঘটেছিল, সেইরকম হিংসাত্মক প্রাধান্যবিস্তারী সম্পর্ক দেখা দিল ; পুলিস, আইন, স্থায়ী সেনাবাহিনী, এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আইন-যন্ত্রের মধ্যে তা প্রকাশিত। বলপ্রয়োগ দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করাকে কেন্দ্র করে গোটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র আবর্তিত। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল অবিচ্ছেদ্য এবং ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য ব্যবসায়ের দ্বারা অর্জনযোগ্য, এবং প্রকৃতিদত্ত অধিকার ব'লে তাকে গণ্য করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই অধিকারকে একমাত্র বল প্রয়োগের দ্বারাই রক্ষা করা যায় ; যেহেতু অন্যদের শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করার ও তা থেকে মুনাফা আদায় করার এবং সুতরাং তাদের জীবনকে তত্ত্বাবধান করার একটা অধিকার এই রাষ্ট্রের সারবস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

অতএব শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়ার স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তব হতে পারে না। এই একটি জিনিস যা তাকে বুর্জোয়া করেছে সেটাকে রক্ষা করার জন্য সামাজিক বাধানিষেধ দেখা দিতে বাধ্য। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হওয়ার এই 'স্বাধীনতা' তার কাছে ব্যাখ্যার অতীতভাবে আরও আরও সামাজিক বাধানিষেধের সঙ্গে আইন, শুল্ক এবং ফ্যাক্টরি আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে হয় ; আর এই 'সমাজ' যার মধ্যে একমাত্র সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কই স্বীকৃত, তা আরও বেশি বেশি করে এমন এক সমাজ হয়ে ওঠে যেখানে মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলি বিস্তারিত এবং নিষ্ঠুর। যতই সে বুর্জোয়া স্বাধীনতা পেতে চায় ততই সে পায় বুর্জোয়া বাধানিষেধ। কারণ, বুর্জোয়া স্বাধীনতা একটা বিভ্রম মাত্র।

এইভাবে দাসমালিক সমাজের মত বুর্জোয়া সমাজও হয়ে ওঠে মানুষের উপর মানুষের দ্বারা হিংসাত্মক বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক সমাজ। বরং একদিক থেকে তা আরও বেশি হিংসাত্মক এই কারণে যে দাস কাজ করুক বা না করুক প্রভুকে তার দাসকে খাওয়াতে এবং রক্ষা করতেই হয়, স্বাধীন শ্রমিকের প্রতি কিন্তু বুর্জোয়া মালিকের কোন দায়দায়িত্ব নেই, এমন কি তার জন্য কর্ম সংস্থান করারও

দায় দায়িত্ব থাকে না। প্রয়োগের ক্ষেত্রে গোটা বুর্জোয়া স্বপ্নটা খানখান হয়ে যায়, আর বুর্জোয়া রাষ্ট্র হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে মানুষের হিংসাত্মক ও বলপ্রযুক্ত অধীনতার রঙ্গমঞ্চ।

কারণ অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ার হিংসা ঠগীরা যে উদ্দেশ্যে হিংসা করে, তার মত হলেও একটা পার্থক্য আছে। এই হিংসা একটা সামাজিক ভূমিকা পালন করে। এটা এমন এক সামাজিক সম্পর্ক যার দ্বারা বুর্জোয়া সমাজে সামাজিক উৎপাদন সুনিশ্চিত হয়; ঠিক যেমন দাসমালিক সভ্যতায় প্রভু-দাস সম্পর্ক উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করে। তার যুগে উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করার এইটিই হল সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি; বনের পশু হওয়ার থেকে দাস হওয়াও ভালো, দাস হওয়ার থেকে শোষিত শ্রমিক হওয়া ভালো। তার কারণ এই নয় যে বুর্জোয়া মালিক দাসমালিকের থেকে 'ভালো' (বরং প্রায়শঃই সে তার থেকে অনেক বেশি নিষ্ঠুর হয়)। তার কারণ এই যে, শেষোক্ত সম্পর্কের থেকে প্রথমোক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্পদ অনেক বেশি।

কিন্তু কোনও সম্পর্ক-ব্যবস্থাই গতিহীন নয়, তা বিকশিত হয় এবং পরিবর্তিত হয়। দাস মালিকানার সম্পর্কগুলি বিকশিত হয়ে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে, এবং তারপর তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলি উদ্‌ঘাটিত হয়। সেগুলি ভেঙে পড়ে। রোমান সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়ার কাহিনী হল ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে অগাস্টাস ও জাস্তিনিয়ানের শাসনকালের মধ্যে সাম্রাজ্যের করযোগ্য সম্পদের অবিরাম হ্রাসপ্রাপ্তির এক কাহিনী, যতক্ষণ পর্যন্ত না দারিদ্র্যপীড়িত একটা আবরণের মত তা বর্বরদের আক্রমণের মুখে ধ্বসে পড়ল। এতদিন পর্যন্ত এই আক্রমণকে অবশ্য সহজেই প্রতিহত করা গিয়েছিল। একইভাবে, গোলাপের যুদ্ধের নৈরাজ্যের ফলে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতা ইংলণ্ডে ধ্বসে পড়েছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বহিঃশত্রুর আক্রমণে তা ঘটেনি, এক অভ্যন্তরীণ শত্রুর কাছে, উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে তার পতন ঘটল।

বুর্জোয়া সম্পর্কগুলিও বিকশিত হয়েছিল। বুর্জোয়া তেজী ও মন্দার মধ্যে সেগুলি ব্যবস্থাটির অন্তর্নিহিত ক্ষয়কেই (potential decay) প্রকাশ করে। সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যে, অর্থাৎ অন্যান্য দেশের উপর বুর্জোয়ার 'প্রকৃতিদত্ত অধিকারকে' বলপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে এই ক্ষয়কে হঠিয়ে রাখা গিয়েছিল। এই সব পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে মুনাফাসফল ব্যবসায়ের এবং যে কোনও সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করার ও সংগ্রহ করার বুর্জোয়া অধিকার বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রেও, সামগ্রীর উপর তার প্রাধান্যবিস্তারী সম্পর্কের থেকে মানুষের উপর তার প্রাধান্যবিস্তারী

সম্পর্ককে গোপনে চাপিয়ে দিয়েছিল, যা তা সত্ত্বেও গণতন্ত্র বলে আড়াল দেওয়া যায়। কারণ, গণতন্ত্র কি একথা বলে না যে সব মানুষ সমান এবং কেউ যেন অপরকে দাস না করে? একমাত্র 'স্বাধীন' শ্রমিকের উপর পুঁজিবাদীর 'নিরীহ' প্রাধান্যবিস্তার ছাড়া প্রাধান্য বিস্তারী যাবতীয় সম্পর্কই—স্বৈরাচার, দাস-মালিকানা, সামন্ততান্ত্রিক বিশেষ সুযোগসুবিধা প্রভৃতি অন্য সব কিছুই কি এতে অবর্তমান নয়?

কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠার ফলে এক নতুন পরিস্থিতি দেখা দিল—অভ্যন্তরীণ হিংসা ও বলপ্রয়োগের জায়গায় দেখা দিল বহির্দেশীয় যুদ্ধ। কারণ, এখন পশ্চাৎপদ দেশগুলিকে শোষণ করতে গিয়ে অথবা যাকে বলা হয় তাদের সভ্য করতে গিয়ে, এক বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে অপর এক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হল, ঠিক যেমন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এক বুর্জোয়াকে অপর এক বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বুর্জোয়া বুর্জোয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালায় শান্তিপূর্ণভাবে। কারণ সেটাই আইন—আর এই আইন শোষিতদের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের রক্ষা করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। না-পাওয়ার দল যাতে বলপূর্বক সম্পত্তি কেড়ে নিতে না পারে সেই প্রয়োজন থেকেই অন্যের সম্পত্তি যাতে কোন বুর্জোয়া বলপূর্বক কেড়ে নিতে না পারে সেই আইন দেখা দিয়েছিল। এটা একটা অভ্যন্তরীণ আইন, বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রের আইন। শোষিতরা যাতে বুর্জোয়াদের সম্পত্তি কেড়ে নিতে না পারে সেই কারণে সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য যদি এই আইনের প্রয়োজন না হত, তাহলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলপূর্বক কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আইনটি কখনই দেখা দিত না। এই আইন বল প্রয়োগের মাধ্যমে বলবৎ করা হয় এবং সমাজের পক্ষে একটা 'প্রয়োজনীয়' আইন হিসাবে শোষিতদের বোঝান হয়। কারণ, বুর্জোয়া ব্যবসায়ের ব্যক্তিকেন্দ্রিক, প্রতিযোগিতামূলক প্রকৃতিই (প্রত্যেকেই অপরকে 'ছাড়িয়ে যেতে পারে') এমন যে কোনও বুর্জোয়াই অন্য একজন বুর্জোয়াকে নির্ধন করার মধ্যে অন্যায় কিছু দেখতে পায় না। সে যদি 'সর্বস্বান্ত' বা 'ধনহীন' হয়ে পড়ে তাহলে সেটা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু শোষিতের বিরুদ্ধে শ্রেণী হিসাবে সকলেই ঐক্যবদ্ধ, কারণ ঐ শ্রেণীর অস্তিত্ব এটার উপরেই নির্ভর করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেই ব্যাপারটা যদি একটা রাজকীয় লড়াই হয় তাহলে প্রত্যেক বুর্জোয়াই তার প্রকৃতি ও শিক্ষা থেকে এটাই বিশ্বাস করে যে, সমান সুযোগ পেলে অন্যকে সে ছাড়িয়ে যাবে। ন্যায়সঙ্গত ক্রীড়া 'ন্যায়সঙ্গত ক্রীড়াক্ষেত্র ও পক্ষপাতহীনতার' পক্ষে ঐতিহাসিক বুর্জোয়া আবেদন এবং অন্যান্য যে সব সংশ্লিষ্ট বুর্জোয়া স্লোগানগুলি

'ক্রীড়'মোদী' ইংরেজ ভদ্রলোকদের নীতিশাস্ত্রকে প্রকাশ করে তার মধ্যে বুর্জোয়ার এই শাশ্বত আশাবাদকে লক্ষ্য করা যায়।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি যখন তাদের বলপ্রয়োগকারী সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে পশ্চাৎপদ দেশগুলি অধিকারের জন্য পৃথিবীর আঙ্গিনায় প্রতিযোগিতার নামে ব্যাপারটা তখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। **সামগ্রিকভাবে** বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি যে শ্রেণীপর্যায়ের তার অস্তিত্ব বিপন্নকারী কোনও অসংখ্য শোষিত মানুষের শ্রেণী তখন নেই। বলপ্রয়োগ-কারী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যদি কখনও খালি হাতে, জনে জনে রাস্তার লড়াই দিয়ে 'হেস্তনেস্ত' ঘটত—শোষিত শ্রেণী তাহলে দায়ী হ'ত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ের ময়দানে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত বিকশিত জীবদেহের মত আবির্ভূত হয়। কারণ, বল প্রয়োগকারী রাষ্ট্রের ঐক্যবদ্ধতার কল্যাণে, একটা উন্নত সমাজের সমস্ত কিছু সহায়সম্পদ তারা এখন ব্যবহার করে, সেনাবাহিনীতে স্বয়ং শোষিত শ্রেণীর সেবাও [services] তার অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়ার ময়দানে পশ্চাৎপদ জাতি-গুলি এখনও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শোষিত শ্রেণীর যা ভূমিকা তাই পালন করে, কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীব কাছে শোষিত শ্রেণী যে রকম বিপদের ব্যাপার সেইরকমভাবে এই পশ্চাৎপদ জাতিগুলি সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি যে শ্রেণী পর্যায়ের তার কাছে কোনও বিপদের ব্যাপার নয়। তারা কেবল জড় পদার্থ মাত্র, প্রায়শঃই আত্মরক্ষায় অসমর্থ, একটা বিশাল প্রাণহীন অনুন্নত এলাকা মাত্র।

অতএব রাষ্ট্রের মধ্যে যেরকম সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে বিপ্লবের আশঙ্কা থাকে, সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির শ্রেণীপর্যায়ের কাছে সেইরকম কোনও বিশ্বব্যাপী বিপদের আশঙ্কা নেই। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রতিযোগিতা কেবল রয়েছে, এবং আমরা দেখেছি যে বুর্জোয়ার তা নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। সে শুধু চায় 'ন্যায়সঙ্গত ক্রীড়াক্ষেত্র এবং পক্ষপাতহীনতা' এবং সে-ই যে জয়ী হবে এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। বুর্জোয়াদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতাকে নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে কোনও আইনের প্রয়োজন সে অনুভব করে না। অতএব সার্বভৌম বুর্জোয়ারাষ্ট্র দেখা দেয় এবং পশ্চাৎপদ এলাকার লুঠের মালের জন্য অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সে লিপ্ত হয়। এটা হল সাম্রাজ্যবাদের যুগ, যার পরিণতি ঘটে বিশ্বযুদ্ধে।

বলা বাহুল্য, 'ন্যায়সঙ্গত ক্রীড়াক্ষেত্র এবং পক্ষপাতহীনতা'র এই বুর্জোয়া স্বপ্ন যখন বাস্তবায়িত হয় বুর্জোয়া তখন দেখতে পায় যে সে যা স্বপ্ন দেখছিল তার থেকে সেটা অনেক বেশি রক্তক্ষয়ী ও অনেক বেশি হিংসাত্মক। যুদ্ধ তার কাছে 'অন্যায়

প্রতিযোগিতা' বলে শীঘ্রই প্রতীয়মান হয়। দাম পড়ে যাওয়ার লড়াইয়ের মত এই লড়াই তাকে আতঙ্কিত করে এবং সে তখন চায় বাইরে থেকে কারও এই যুদ্ধ থামানো উচিত। সে তখন সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু 'বাইরে' কাউকে দেখা যায় না। কারণ, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির শ্রেণী পর্যায়ের সদস্য হিসাবে ত্রিভুবনে কার কাছে সে সাহায্য চাইতে পারে?

তবুও তার একটা প্রশ্ন থাকে। একটি দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর যদি আইনশৃঙ্খলা ও অহিংস প্রতিযোগিতা বলবৎকারী একটা রাষ্ট্র ও পুলিশবাহিনী থাকতে পারে, তাহলে রাষ্ট্রগুলির সেরা একটি রাষ্ট্র, বিশ্বরাষ্ট্র কেন তার থাকতে পারে না যেখানে বিশ্বশান্তি বলবৎ করা যাবে?

যুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই বুর্জোয়া আশা বার বার কেবলই দেখা যায়। লীগ অব নেশনস তারই একটা রূপ। কিন্তু বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ নিয়ম যে কারণটির দ্বারা সুনিশ্চিত হয়—এক বিপজ্জনক শোষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব—যেটি বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চে অনুপস্থিত। সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি যে শ্রেণীপর্যায়ের তার সামনে কোনও বিপদ থাকে না এবং সেই কারণে তাদের নিজের ইচ্ছার থেকে বড় একটা বলপ্রয়োগমূলক নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম স্বীকার করে নেওয়ার জন্য তারা কখনই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। বিপদটা কেবলমাত্র তাদের পরস্পরের মধ্যেই বর্তমান এবং প্রত্যেকেই ভালো বুর্জোয়ার মত বিশ্বাস করে যে উপযুক্ত 'জোট' 'combination', চুক্তি সম্পাদন ও পরিচালনা-কৌশলের সাহায্যে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম। সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার মত কোনও সাধারণ বিপদের অভাবে শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার বুর্জোয়া স্বপ্ন আয়ত্বের অতীত থেকে যায়। দ্রব্যমূল্য হ্রাস করার দুঃখজনক তিক্ত অভিজ্ঞতালাভের পর যেমন হয় সেই রকম যুদ্ধের দুঃখজনক তিক্ত অভিজ্ঞতালাভের পর তারা একটা স্বেচ্ছামূলক কার্টেল, লীগ অব নেশানসে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে বটে, কিন্তু কার্টেলেরই মত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংশক্তি [cohesion] এবং বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতার অভাব এতেও থেকে যায়, এবং সেইকারণেই বুর্জোয়াদের পরস্পরের মধ্যে মধ্যস্থতা করার মত কার্যকারিতাও তার থাকে না। এটা হয় একটা দ্রব্যমূল্য-চুক্তির মত; প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র উপকারের জন্য যেটা মেনে চলে। যেহেতু সাধারণভাবে বুর্জোয়া উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্রে কোনও চুক্তি সকলের মঙ্গলের জন্যই সমানভাবে কার্যকর হতে পারে না, সেইজন্য খানিকটা সময়ের শুধু অপেক্ষা যখন কেউ না কেউ কার্টেলের বিরোধিতা করে এবং না-পাওয়া বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি (জার্মান ও ইতালি) কার্টেলের বাইরে চলে যায় এবং যে সব বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি

পাওয়ার দলে তাদের (ফ্রান্স ও ইংলণ্ড) বিরুদ্ধে গিয়ে জোটবদ্ধ হয় এবং যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের একই ক্ষেত্রে অবস্থিত নয় (আমেরিকা) সেই রাষ্ট্র কখনই কার্টেলে যোগ দেয় না। এইভাবে মন্দার প্রকাশক হিসাবে যুদ্ধের অকার্যকারিতা প্রমাণ হয়ে যাওয়ার তিক্ততম শিক্ষালাভ কোনও জাতির হওয়া সত্ত্বেও যে সব রাষ্ট্রগুলির রূপ বুর্জোয়া স্বার্থকে বলপ্রয়োগাত্মকভাবে প্রকাশ করে সেই সব রাষ্ট্রের পক্ষে একটা অধিকতর সংহতিকারক শক্তিকে—রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে আইন-যন্ত্র অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেইরকম কোনও আইনযন্ত্র তৈরি করতে পারে, এমন এক শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এই অভ্যন্তরীণ যন্ত্র বিপজ্জনক শোষিত শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, অথচ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনও বিপজ্জনক শোষিত শ্রেণী থাকে না। এইভাবে শান্তিপূর্ণ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব স্টেটস্, লীগ অব নেশনস, হয়ে পড়ে বুর্জোয়া বিভ্রমের একটা অংগ, আর জাতিগুলি আরও বেশি বেশি করে নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত করে।

সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়া কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণীর সমতুল বলে গণ্য হতে পারে না, এবং স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি কি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে ধ্বংস করতে বাধ্য করতে পারে না? এটাই ছিল ট্রটস্কির দুঃস্বপ্ন যা থেকে এই সিদ্ধান্তই করা হয়েছিল যে বিশ্ববিপ্লব না হলে পৃথিবীর কোথাও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কিন্তু এই তত্ত্বে এই ঘটনাকে গণ্য করা হয়নি যে সোভিয়েত রাশিয়া একটা শোষিতদের রাষ্ট্র নয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শোষিত শ্রেণী হল বুর্জোয়ার কাছে মুক্তিপণে আবদ্ধ একটা শ্রেণী। সেখানে উৎপাদনের উপায়গুলি থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে। ক্ষেত্রটা হল: 'আমাদের জন্য কাজ কর, না হয়ত মর।' এই ধরনের পরিস্থিতি একমাত্র নৈতিক ও শারীরিক বলপ্রয়োগের সাহায্যেই টিকিয়ে রাখা যায়, এবং সেই কারণে বুর্জোয়া 'অধিকারগুলিকে' এইভাবে চিরকাল বজায় রাখতেই হয়; তা না হলে যে পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনযাত্রার উপায়গুলিই অন্যদের হাতে থাকে এবং তারা যদি অন্যের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে তবেই তা অর্জন করতে পারে, সেইরকম পরিস্থিতি মানুষ অবশ্য সহ্য করত না। কিন্তু রাশিয়ার এই শ্রেণী তাদের সম্পদ-লুণ্ঠনকারী শ্রেণীকে বরবাদ করে দিয়েছে। অন্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জন্য কাজ করা, অথবা মৃত্যু, ব্যাপারটা সেখানে এরকম নয়। রাশিয়ার শ্রমিকরা তাদের নিজেদেরই প্রভু। তাছাড়া, অন্যান্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিপরীতে, তাদের অর্থনীতিতে শোষণের নতুন নতুন ক্ষেত্র সন্ধান করতে বাধ্য এমন কোনও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (মূলধন সঞ্চয়) নেই।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাছে সেইকারণে বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চে রাশিয়াকে মূলগতভাবে বিপজ্জনক এক শোষিত শ্রেণী বলে মনে হয় না। অভ্যন্তরীণ দিক থেকে শান্তি-শৃঙ্খলাবদ্ধ বলপ্রয়োগকারী এক সাধারণ রাষ্ট্র—'তাদেরই একজন' বলে তাকে মনে হয়। খোলা বাজারে সে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সে পশ্চাৎপদ দেশের সন্ধান করে না, কেন করে না তা নিয়ে অবশ্য তাদের মাথাব্যথা নেই। সেইজন্য সে তাদের কার্টেলে যোগ দিতে পারে। এই কার্টেলে তার কর্তব্য হবে বুর্জোয়া খেলায়—একটি জোটকে অপর জোটের বিরুদ্ধে লাগানোর খেলায়—যোগদান করা—সাম্রাজ্যবাদী সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য নয়, তাঁর নিজের জন্য এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির হতভাগ্য সর্বহারাদের সপক্ষে শান্তি সুনিশ্চিত করার প্রয়োজনে।

এটা ঠিক যে সমস্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কাছেই রাশিয়া একটা বিপদের কারণ। কারণ, তার সাফল্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সর্বহারা বিপ্লবের একটা প্রেরণা। কিন্তু বিশ্বব্যাপী সর্বহারা বিপ্লবের অর্থ হল বুর্জোয়া অর্থনীতির অবসান এবং প্রথম দিকে বুর্জোয়ার কাছে এটা একটা নিছক উদ্ভট ব্যাপার মাত্র থাকে। একদিকে সে নিজেকে বোঝায় যে বলশেভিকবাদ একটা 'ক্ষণস্থায়ী পর্যায়' মাত্র, আবার অন্যদিকে বলে যে আধুনিক রাশিয়ায় আছে শুধু 'পরিকল্পনাভিত্তিক পুঁজিবাদ'। তাছাড়া, সর্বহারা বিপ্লব রাশিয়া থেকে আসবে না, তা আসবে দেশের অভ্যন্তর থেকে, এবং সেই কারণে, যেমন ধরুন রাশিয়া আক্রমণ করার দ্বারা বৃটিশ সর্বহারাকে অভ্যুত্থান থেকে বিরত করার চেষ্টা করা যুক্তিহীন। বিপরীত দিক থেকে, সেই রকম কোনও প্রয়াসের ফলে যে ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে সেইটাকেই ত্বরান্বিত করা হবে। এইভাবে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার মুণ্ডপাত করলেও তাকে আক্রমণ করান্যর জ তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, বরং তার সঙ্গে চুক্তি করতে তারা প্রস্তুত, যাতে অন্যের বিরুদ্ধে তাকে ব্যবহার করা যায়।

তার অর্থ এই নয় যে রাশিয়ার সামনে কোনও বিপদ নেই। বরং বিপরীত দিক থেকে, প্রত্যেক বুর্জোয়া রাষ্ট্রই যে পরিমাণে তারা সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিনিধিত্ব করে সেই পরিমাণেই পরস্পরের কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা করে। এই দিক থেকে জার্মানীর কাছ থেকে রাশিয়ার বিপদের আশঙ্কা ততখানিই যতখানি বৃটেনের বিপদের আশাঙ্কা জার্মানীর কাছ থেকে। সেইকারণে তার বুর্জোয়া প্রতিবেশিরা যেরকম অস্ত্রসজ্জা করছে রাশিয়াকেও সেইরকম নিজেকে অস্ত্রসজ্জিত করতে হবে এবং নানা চুক্তির সাহায্যে, যা কার্টেল ও বাণিজ্যচুক্তির আন্তর্জাতিক সমতুল, নিজেকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে হবে।

বুর্জোয়া যখন কমিউনিজমের অবশ্যম্ভাবিতা দেখতে সুরু করে একমাত্র তখনই সে অন্য যে কোনও বুর্জোয়া রাষ্ট্রের তুলনায় অধিকতর বিপদ বলে রাশিয়াকে গণ্য করতে সুরু করে। কিন্তু ঠিক এই উপলব্ধির জন্যই পুঁজিবাদী শ্রেণী ফ্যাসিবাদের শরণ নেয় এবং সেই কারণে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলিই হল আজ রাশিয়ার কাছে প্রধান বিপদ।

অর্থাৎ, এই হল বুর্জোয়া হিংসার বিশ্লেষণ। এটা এমন একটা কিছু নয় যা আকাশ থেকে কিছুদিনের জন্য হঠাৎ নেমে এসে মানবজাতিকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। বুর্জোয়া বিভ্রমের মধ্যেই এটা নিহিত।

সামাজিক পুঁজির ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্য দিয়ে মানুষের উপর মানুষের হিংসাত্মক প্রাধান্যবিস্তারের ভিত্তির উপরেই গোটা বুর্জোয়া অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যে কোনও মুহূর্তে তা পিটারলু বা অমৃতসরের ঘটনার মত, বা তার বাইরে বুয়োর যুদ্ধ বা মহাযুদ্ধের মত দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠার জন্য প্রস্তুত হয়ে সর্বদাই বর্তমান।

বুর্জোয়া অর্থনীতি যতদিন একটা ইতিবাচক সৃষ্টিশীল শক্তি হিসাবে থাকে ততদিন এই হিংসা গুপ্ত থাকে। উৎপাদিকা শক্তিগুলি যতদিন না উৎপাদন-সম্পর্কগুলির ব্যবস্থাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সমাজের মধ্যে একটা শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাপ থাকে না। সেইকারণে এই বিপ্লবাত্মক চাপ যতদিন না বিকশিত হচ্ছে, বলপ্রয়োগের ততদিন পর্যন্ত নিজেকে রক্তপিপাসু বা ব্যাপক মাত্রায় প্রকাশ করা বাকি থাকে।

কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতি যখন নিজের দ্বন্দ্বগুলির দ্বারাই ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে, যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সামাজিক অনিষ্ট হিসাবে দেখা যায়, যখন প্রাচুর্যলাভের উপায়গুলির মধ্যে দারিদ্র্য ও বেকারি বেড়ে ওঠে তখন বুর্জোয়া হিংসা আরও বেশি প্রত্যক্ষ হয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্বগুলি বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়, যার মধ্যে অবাধ হিংসারই রাজত্ব। অভ্যন্তরীণ দিক থেকে 'যুক্তির' জায়গায় কেবলমাত্র হিংসাই বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার পক্ষে পর্যাপ্ত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেহেতু প্রকাশ্যেই তার অকার্যকারিতার প্রমাণ দিচ্ছে সেইজন্য জনগণ এখন আর এমন একটা রূপের সরকার নিয়ে, সংসদীয় গণতন্ত্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণী অর্থনৈতিক উৎপাদন চালাচ্ছে আর সামগ্রিকভাবে জনগণের হাতে থাকছে কেবলমাত্র সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সংসদের মাধ্যমে, নিছক প্রশাসনিক বাজেট নির্ধারণের ক্ষমতাটুকু। এটাকে একটা ভড়ং বলে তারা বুঝতে পারছে এবং এই ভড়ংকে আর সহ্য করার কোনও যুক্তি দেখতে পাচ্ছে

না। সমাজতন্ত্রের জন্য দাবি বাড়তে থাকে, আর যেখানেই এই দাবি বেশ চাপ সৃষ্টি করতে পারে সেখানেই বুর্জোয়ারা প্রকাশ্য হিংসার আশ্রয় নেয়। অকার্যকর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে তারা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করে; আর এই একনায়কতন্ত্র, যা 'পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক' এই আওয়াজ তুলে ক্ষমতা দখল করে তা প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি হিংসাত্মকভাবে পুঁজিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করে, যেমন করেছে ফ্যাসিবাদী ইতালি ও জার্মানিতে। ফ্যাসিবাদের পাশবিক নিপীড়ন ও নির্দয় হিংসা বুর্জোয়া অবনতিরই চূড়ান্ত পর্যায়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে দুই ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া বিভ্রমের অন্তর্নিহিত হিংসা ফেটে বেরিয়ে আসে।

বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বুর্জোয়া হিংসার যুক্তিগত সমর্থন। একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীর দ্বারা সামাজিক শ্রমের বলপ্রয়োগাত্মক নিয়ন্ত্রণকে একটা সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে যুক্তির দিক থেকে সমর্থন করা হয়। এমন কি হেগেলের কালেও এই যুক্তিগত সমর্থন দেওয়া হয় নির্বোধের মত এবং অতি সরলভাবে। আদিম জঙ্গলে গিয়ে একটা লাঠি ভেঙে নিয়ে সেটাকে যেমন নিজের কাজে লাগাই সেইভাবে বুর্জোয়া যেন 'পুঁজি' জিনিসটাকে নিয়ে তার নিজের কাজে লাগায় বলে মনে করা হয়। মানুষের উপর প্রাধান্যবিস্তার করাটা হল খারাপ, আর সামগ্রীর উপর প্রাধান্যবিস্তার করাটা হল আইনসম্মত।

হেগেল যে এই ব্যাপারটা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন তা সম্ভব হয়েছিল বুর্জোয়া অর্থনীতির প্রকৃতির কারণেই। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতির যথার্থ প্রকৃতিকে মার্ক্স যখন সামাজিক শ্রম ও ব্যক্তিগত জীবিকার উপায়গুলির উপর মালিকানার মধ্য দিয়ে মানুষের উপর প্রাধান্যবিস্তারকারী একটা সম্পর্ক হিসাবে বিশ্লেষণ করে তাকে দেখালেন তখন এই নির্বোধ বুর্জোয়া মনোভাব কি করে আর বজায় থাকে? সেটা সম্ভব একমাত্র মার্ক্সকে গালমন্দ করার দ্বারা, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে ব্যাখ্যা না করে সর্বদাই তাঁকে প্রচণ্ড আক্রমণ করার দ্বারা, এবং পুরাতন বুর্জোয়া তত্ত্বটি অবিরাম শিক্ষা দেওয়া, প্রচার করা ও প্রয়োগ করার দ্বারা। তখনই বুর্জোয়া বিভ্রমটা হয়ে উঠল বুর্জোয়া মিথ্যা, যা হল বুর্জোয়া সংস্কৃতির হৃৎপিণ্ডে পচন ধরানো এক সচেতন প্রবঞ্চনা।

বুর্জোয়া যুদ্ধের হিংসার সমর্থনে যুক্তি সংগ্রহের আরও কঠিন কাজটিও বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টান-বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্র একাজটিও করতে পেরেছে। বুর্জোয়া বিভ্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবেই অন্যের স্বাধীনতায় যা কিছু হস্তক্ষেপ করে তাই অন্যায় ও দুর্নীতিপূর্ণ। কারও স্বাধীনতা যদি আক্রান্ত হয় তাহলে আক্রান্তপক্ষ নৈতিকতাকে রক্ষা করতে এবং প্রতি-আক্রমণ করতে সে বাধ্য হয়। এতএব সমস্ত

বুর্জোয়া যুদ্ধকেই উভয়পক্ষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ হিসাবে সমর্থন করে। সমস্ত বুর্জোয়া বৃত্তি (occupation)-বিচ্ছিন্ন করা, ব্যবসা করা ও মুনাফা অর্জন করা—প্রয়োগের অধিকার বুর্জোয়া স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। এবং যেহেতু এগুলির সঙ্গে অন্যদের উপর প্রাধান্যবিস্তারকারী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজটি সংশ্লিষ্ট সেইজন্য বুর্জোয়া যে প্রায়ই দেখতে পায় যে তার স্বাধীনতার উপর আক্রমণ হচ্ছে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না ক'রে বুর্জোয়ার পক্ষে তার নিজের স্বাধীনতা পুরাপুরি প্রয়োগ করা অসম্ভব। অতএব 'ন্যায়' যুদ্ধের কারণ না ঘটিয়ে পুরাপুরি বুর্জোয়া হওয়া অসম্ভব।

ইতোমধ্যে বুর্জোয়া অস্বস্তিগুলি (discomforts) বুর্জোয়া হিংসার বিপক্ষে এক বিরোধিতার জন্ম দেয়। বুর্জোয়া বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে এমন সব মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের মাথা এই বুর্জোয়া বিভ্রমে এমনই ঠাসা থাকে যে মানুষের উপর কোন সামাজিক বাধানিষেধ যখন থাকে না, তখনই কেবল মানুষ স্বাধীন ও সুখী থাকে, এবং তা সত্ত্বেও বুর্জোয়া অর্থনীতির মধ্যে বলপ্রয়োগ ও বাধানিষেধই বেড়ে চলেছে এটা তারা দেখতে পায়। এগুলি কেন যে বর্তমান থাকে তা আমরা দেখেছি : বুর্জোয়া অর্থনীতির নিজের অস্তিত্বের জন্যই বলপ্রয়োগ ও বাধানিষেধের প্রয়োজন। বৃহৎ বুর্জোয় পেটি-বুর্জোয়ার উপর অধিপত্য বিস্তার করে, ঠিক যেমন এরা দুজনেই সর্বহারার উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু গোড়ার দিকের এই বুর্জোয়া বিদ্রোহীরা এটা দেখতে পায় না। তারা 'সকলের জন্য সমান অধিকার', 'সামাজিক বাধানিষেধ থেকে অব্যাহতি', মানুষের 'প্রকৃতিদত্ত অধিকার' ইত্যাদি বুর্জোয়া স্বপ্নের জগতে প্রত্যাবর্তনের দাবি করেছিল। তারা ভেবেছিল যে বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে এটা তাদের মুক্তি দেবে এবং আবার তারা সমান প্রতিযোগিতা ফিরে পাবে।

এইভাবে রক্ষণশীল ও উদারপন্থীদের মধ্যে, অধিকার প্রাপ্ত বৃহৎ বুর্জোয়া এবং অধিকারলাভেচ্ছু ক্ষুদ্র বুর্জোয়ার মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত ঘটল। একজন দেখল যে ব্যাপারগুলি যেমন আছে সেই অবস্থাতেই থাকার উপর তার অবস্থান নির্ভর করছে ; অপরজন দেখল তার অবস্থান নির্ভর করছে আরও বেশি বুর্জোয়া স্বাধীনতা, সকলের জন্য আরও বেশি ভোট, বিচ্ছিন্ন করার জন্য ও মালিকানার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য আরও বেশি স্বাধীনতা, আরও বেশি অবাধ প্রতিযোগিতা, আরও কম সুযোগসুবিধার উপর।

উদারপন্থীরা হল সক্রিয় শক্তি। কিন্তু নিজেকে সে যতই বিপ্লবী মনে করুক না কেন. সে তা নয়, সে বিবর্তনপন্থী। বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতার জন্য প্রয়াস চালিয়ে এই কাজেরই দ্বারা যে সামাজিক বাধানিষেধকে সে ঘৃণা করে

সেটাকেই সে বাড়িয়ে তোলে। ক্ষুদ্র বুর্জোয়াকে সমর্থন করার প্রচেষ্টায় বৃহৎ বুর্জোয়াকেই সে গড়ে তোলে, যদিও এই প্রক্রিয়ায় নিজেকেও সে বৃহৎ বুর্জোয়াতে পরিণত করতে পারে। অপক্ষপাতিত্ব পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে পক্ষপাতিত্বকেই সে বাড়িয়ে তোলে। অবাধ বাণিজ্যের ফলে শুল্ক, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া কারবারের জন্ম হয়। কারণ তা বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে, এবং এই জিনিসগুলি হল বুর্জোয়া বিকাশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যে জিনিসগুলিকে সে ঘৃণা করে সেগুলিকে সে ডেকে আনে। কারণ, যতক্ষণ সে এই বুর্জোয়া বিভ্রমের কবলে রয়েছে যে সামাজিক পরিকল্পনার অনস্তিত্বই হল স্বাধীনতা, ততক্ষণ তাকে সামাজিক বন্ধনকে শিথিল করে নিজেকে আরও বেশি প্রবলভাবে দমনমূলক (coercive) সামাজিক শক্তিগুলির কবলে তুলে ধরতে হয়।

সেইকারণে, এই 'বিপ্লবী' উদারপন্থী, বলপ্রয়োগ ও হিংসার এই ঘৃণাকারী, অবাধ প্রতিযোগিতার এই প্রেমিক, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের এই সুহৃৎই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইতিহাসের অমোঘ বিধানে এই সব ব্যাপার বন্ধ করতেই যে কেবল সম্পূর্ণ অপারগ তাই নয়, তাঁর নিজের প্রচেষ্টার ফলেই তিনি বলপ্রয়োগ, হিংসা, পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিযোগিতা এবং দাস সৃষ্টি করতে বাধ্য হন। বুর্জোয়া হিংসার বিরোধিতা থেকেই তিনি কেবল বিরত থাকেন না, বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশকে সাহায্য করার দ্বারা তিনি সেটাকেই সৃষ্টি করেন।

যে হিংসা, যুদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতা তিনি ঘৃণা করেন, বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদী হিসাবে অন্ধ তিনি সেইগুলির সৃষ্টি হতেই সাহায্য করছেন। তিনি যেহেতু প্রকৃত নিষ্ক্রিয়তাবাদী এবং বিপ্লবী পথ ও অসহযোগের পথের মধ্যে নিছক একজন পুরাপুরি মাথা গুলিয়ে যাওয়া দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ নন, সেইকারণে তাঁর প্রকল্প হল এই : 'হিংসা যুদ্ধ এবং সামাজিক উৎপীড়নকে আমি ঘৃণা করি। আর এই জিনিসগুলি সবই হল সামাজিক সম্পর্কের কারণে। অতএব সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকেই আমাকে বিরত থাকতে হবে। যুদ্ধলিপ্সু আর বিপ্লবী দুই-ই আমার কাছে সমান ঘৃণার পাত্র।'

কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার অর্থ হল জীবন থেকেই বিরত থাকা। যতক্ষণ তিনি বেতন নেন বা অর্থ উপার্জন করেন ততক্ষণ তিনি বুর্জোয়া অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণ করছেন এবং যে হিংসা একে পুষ্ট করছে সেটাকেই তিনি তুলে ধরছেন। বৃহৎ বুর্জোয়ার ঘুমন্ত অংশীদার তিনি, আর সেটাই হল বুর্জোয়া অর্থনীতির সারবস্তু। দুটি অন্য দেশ যখন যুদ্ধ করে তাতে হস্তক্ষেপ করার এবং তাদের নিরস্ত্র করার ক্ষমতা তার নেই, কারণ তার অর্থ হল সামাজিক সহযোগিতা—

বলপ্রয়োগ থেকে সামাজিক সহযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে, বিবদমান বন্ধুদের যেমন কোন লোক ছাড়িয়ে দেয়; আর সে কাজটা, তাঁরই সংজ্ঞা অনুসারে, করার অধিকার তাঁর নেই। তাঁর নিজের দেশের বৃহৎ বুর্জোয়ারা যদি যুদ্ধ করবে বলে স্থির করে এবং রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগকারী শক্তিগুলিকে-দৈহিক ও নৈতিক—প্রস্তুত করে, তিনি তাহলে বাস্তব কিছুই করতে পারেন না। কারণ একমাত্র বাস্তব উত্তর হল বৃহৎ বুর্জোয়ার দমনমূলক কর্মকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং তাদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে সহযোগিতা করা। ফ্যাসিবাদ যদি বিকশিত হয় তাহলে তা সর্বহারাকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী গড়ে তোলার আগেই, সেটাকে তিনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে পারেন না। কারণ 'কথাবলার অবাধ অধিকারে' তিনি বিশ্বাসী। যে শক্তিগুলিকে বিকশিত হতে তিনি অনুমতি দিয়েছেন সেগুলি কিভাবে শ্রমিকদের পেটাচ্ছে এবং তাদের মাথা কাটছে, তিনি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখতে পারেন।

বুর্জোয়া যুক্তি দোষদুষ্টতার উপরেই তাঁর অবস্থান দৃঢ়ভাবে অবস্থিত। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তি হিসাবে মানুষের ক্ষমতা আছে। এটা তিনি দেখতে পান না যে, প্রত্যেকেই যদি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতেন এবং বলতেন 'আমি নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করব', তাহলেও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হত না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে মানুষ সহযোগিতা না করে পারে না; যেহেতু সমাজের কাজকর্ম চালিয়ে যেতেই হবে—ফসল কাটতে হবে, বস্ত্র বয়ণ করতে হবে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে, না হলে পৃথিবী থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একমাত্র এক পরজীবি শ্রেণীর সদস্য হিসাবে তাঁর অবস্থানই তাঁকে অন্য কোনও বিভ্রম যোগাতে পারত। শ্রমিক দেখে যে, অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপরেই তার জীবন নির্ভর করছে এবং এই সহযোগিতাই নিজের থেকে সামাজিক সম্পর্ক আরোপ করছে। অর্থনীতিটা যদি বুর্জোয়া হয় তাহলে সম্পর্কগুলিও বুর্জোয়া হবে; অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যুর হিংসাত্মক বিষয়গুলি কম বা বেশি মাত্রায় বৃহৎ বুর্জোয়ার হাতে তুলে দেবে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ কোনও বাস্তব কর্মসূচি নয়, পুরাতন কর্মসূচিকে সমর্থন করারই একটা রকমফের মাত্র। যে কোনও মানুষই হয় বুর্জোয়া নীতিতে অংশগ্রহণ করে, না হয়ত সে বিদ্রোহ করে এবং অন্য একটা অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে। আর একটা আপাতঃ পথ হল সমাজকে ভেঙে দিয়ে জঙ্গলে ফিরে যাওয়া, নৈরাজ্যের সমাধান। কিন্তু সেটা আদৌ কোনও সমাধানই নয়। বুর্জোয়া অর্থনীতির একমাত্র প্রকৃত বিকল্প হল সর্বহারার অর্থনীতি, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র; এবং সেই জন্যই যে কেউই হয় বুর্জোয়া অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণ করে, না হয়ত হয় সর্বহারাপন্থী বিপ্লবী। লোকে যে নিষ্ক্রিয়

ভাবে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করে, সে যে নিজে হাতে লাঠি বা কামান চালায় না, এই ঘটনাটা কোনও লোকের অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তিকে শক্তিশালী করা দূরে থাক, তার অবস্থানকে আরও বিরক্তিকরই করে তোলে, ঠিক যেমন চোরের থেকে বেড়া বেশি বিরক্তিকর, গণিকার থেকে তারা দালাল। লোকে চায় নোংরা কাজটা অন্যে করুক আর নিজে শুধু সুফলটিতে অংশগ্রহণ করি। বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদী যে কোনও সভ্যতাতেই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থানের অধিকারী। সে হল সেই খৃষ্টান প্রোটেস্ট্যান্ট যার নীতিশাস্ত্র, যে সংস্কৃতি সেই নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল সেই সংস্কৃতির বিকাশের ফলেই হাস্যাস্পদ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এর ফলে সেগুলি মেনে চলে যে আত্মপ্রসাদ সে লাভ করে, তাতে তার কিছু ঘাটতি পড়ে না। শ্রমিকদের মাথার উপর সে বসে থাকে, আর বুর্জোয়া যখন সেই শ্রমিককে লাথি মারে সে তখন তাকে চুপ করে সে সব সহ্য করতে উপদেশ দেয়। সর্বহারাশ্রেণী যখন স্বাধীনতার জন্য 'সহিংস' সংগ্রাম করে সেই সময় সে 'অত্যাবশ্যক কার্যগুলি চালু রাখে' (সাধারণ ধর্মঘটের সময় কোন কোন নিষ্ক্রিয়তাবাদী সেইরকমই করেছিলেন); তখন সে হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিত।

নৈতিকদিক তার যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন প্রোটেস্ট্যান্ট খৃষ্টধর্মের মতই, নিষ্ক্রিয়তাবাদ হল অতি স্বাতন্ত্র্যবাদ ও স্বার্থপরতার মতাদর্শ, ঠিক যেমন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম হল একচেটিয়া কারবার ও বিশেষ সুযোগ সুবিধাভোগী আধিপত্য বিস্তারের মতাদর্শ। বুর্জোয়া নিষ্ক্রিয়তাবাদী তার মতাদর্শের স্বপক্ষে যত যুক্তিই দিক না কেন সেগুলির মধ্যে এই স্বার্থপরতাই চোখে পড়ে।

প্রথম যুক্তি হল এটা অন্যায়। হত্যা করা বা হিংসার আশ্রয় নেওয়া হল একটা 'পাপ'। খৃষ্ট তা নিষেধ করেছেন। যে নিষ্ক্রিয়তাবাদী হিংসার পথ গ্রহণ করেন তাঁর আত্মা জঘন্য অপরাধে নিমজ্জিত। এই প্রত্যয়ের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তাবাদীর নিজের আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর সেই মূল্যবান আত্মা নিয়েই তাঁর যত দুশ্চিন্তা, সাধু বুর্জোয়ার যেমন তার নিজের মর্যাদা নিয়ে দুশ্চিন্তা, কারণ মর্যাদা হল এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পদ। সমাজ জাহান্নামে গেলেও কিছু আসে যায় না, তাঁর আত্মা ঠিক থাকলেই হল। পাপ সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণায় এতই তিনি মগ্ন যে নিজের আত্মা নিয়ে এবং নিজের মুক্তি নিয়ে সদাব্যস্ত থাকাটা যে স্বার্থপরতা একথা তাঁর মাথায় কখনও আসে না। হতে পারে যে সব কিছুর আগে নিজের চামড়া বাঁচানোটাই যে কোনও মানুষের পক্ষে সঠিক কাজ; হতে পারে হিংসার মারাত্মক পাপের হাত থেকে নিষ্ক্রিয়তাবাদীকে সব থেকে আগে নিজের মূল্যবান আত্মাকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু এটা বুর্জোয়াদের সেই সুন্দর পুরাতন

লেসে-ফেয়ার [laisse-faire] নীতি এবং বুর্জোয়াতন্ত্রের 'শেষে এলে বাঘে খায়' নীতিকথার আধ্যাত্মিক পরিভাষায় অনুবাদ ছাড়া আর কি ? এটা হল আধ্যাত্মিক লেসে-ফেয়ার নীতি। এটা হল সেই বিশ্বাস যে, কোনও কাজ অপরের যতই মঙ্গল করুক না কেন তা যদি কারও নিজের 'আত্মাকে' বিঘ্নিত করে তাহলে সেই কাজ না করাতেই সমাজের স্বার্থ—ঈশ্বরের উদ্দেশ্য—সব থেকে ভালোভাবে সাধিত হয়। 'মন্দ কাজ থেকে ভালো ফল পাওয়া গেলেও তা করা অনুচিত'—এই মহাজনপন্থার মধ্যে এই কথাটাই রূপ পেয়েছে।

পাপ সম্পর্কে আদিম মানুষের ধারণা আরও অনেক বেশি সামাজিক। পাপ নিন্দনীয় এই জন্যই যে গোটা উপজাতিকেই (tribe) তা বিপদে সংশ্লিষ্ট করে। পাপী যে তার গোষ্ঠী থেকে দূরে পালিয়ে যায় তার কারণ সে উপজাতিগোষ্ঠীকেই অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত করেছে, নিজেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নয়। তার পাপের ফলে সেটির সর্বনাশ হয়েছে। মরুভূমিতে গিয়ে নিজেকে সে হত্যা করে, বা নিহত হয়। এইভাবে তার উপযুক্ত পাপস্খালনের পর যে উপজাতিকে সে অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত করেছে তা থেকে তাকে উদ্ধার করে। দুটি ধারণাই ভুলে ভরা। কিন্তু বর্বরদের এই ধারণাটি বুর্জোয়া ধারণাটির থেকে মহত্তর ও প্রেমপূর্ণ। বুর্জোয়া ধারণাটিতে প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তার নিজের পাপের জন্যই দায়ী এবং ব্যক্তিগত-ভাবে খৃষ্টের রক্তের আশ্রয় নিয়ে সেই সব পাপ সে স্খালন করে। নিষ্ক্রিয়তাবাদী কেইনের উক্তিটি মনে রেখেছে : 'আমি কি আমার ভ্রাতার রক্ষক ?'

মুক্তির এই উপজাতীয় ধারণার কিছুটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে চার্চ ধরে রেখেছিল। চার্চের মনে **চার্চ মিলিট্যান্ট, চার্চ সাফারিং** এবং **চার্চ ট্রায়াম্ফ্যান্ট** এই তিনের ঐক্যটি পরিষ্কার ধরে রেখেছিল। এদের প্রত্যেকটিই, তার প্রার্থনার দ্বারা, অন্যদের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারত বা তাদের সাহায্য করতে পারত। সামন্ততান্ত্রিক খৃষ্টান পার্গেটরিতে যন্ত্রণাভোগী পবিত্র আত্মাদের জন্য প্রার্থনা করত, সে মারা গেলে যারা বেঁচে থাকবে তারা তার জন্য তখন প্রার্থনা করবে। এই আশা করত ; এবং উপজাতির মৃত সদস্যদের, স্বর্গে সন্তদের বিজয়ী আত্মাদের প্রতিনিয়ত আহ্বান করত তাকে এমন মাত্রায় সাহায্য করার জন্য যাতে এই শক্তিশালী সামাজিক জোটে স্বয়ং ঈশ্বরই প্রায় বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন। সামাজিক ঐক্যই একমাত্র উদ্ভূত হয়, এবং পাপস্বীকারের মধ্যে, নিছক সামাজিকীকরণের দ্বারাই ব্যক্তিগত পাপ ক্ষমা লাভ করে।

এইভাবে ক্যাথলিক ধর্মমত সামন্ততন্ত্রের সামাজিক প্রকৃতিকে প্রতীকায়িত

করত। উপজাতিটিই ছিল গোটা খৃষ্টান জগৎ। তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ ছিল ক্রুসেড, পৌত্তলিকতাবাদের উপর খৃষ্টানজগতের সহিংস আক্রমণ।

বুর্জোয়ার ধর্ম প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ স্বভাবতঃই গোষ্ঠিভিত্তিক ক্যাথলিক মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। ধর্ম হিসাবে সে ক্যাথলিক মতবাদের মধ্যকার যাবতীয় সামাজিক উপাদানগুলির 'সংস্কার' করল। এটা হয়ে উঠল সামাজিক উপাদানরহিত এবং ব্যক্তি বা স্বাতন্ত্র্যবাদযুক্ত ক্যাথলিক মতবাদ। প্রামাণিক ক্ষমতাকে [authority] পরিত্যাগ করা হল। পুরোহিত ছিল গোষ্ঠীর যাদুবিদ্যা ও বিবেকের ধারক। তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। মৃতের জন্য এবং সন্তদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ছিল অ-ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী; সেই কারণে পার্গেটরির অস্তিত্ব আর রইল না, আর সন্তরা হয়ে পড়লেন অসহায়। প্রত্যেক মানুষকে তার নিজের বিচার করতে হবে, নিজের পাপ বহন করতে হবে এবং নিজের মুক্তির পথ বার করতে হবে। ব্যক্তিগত অপরাধের ধারণা-বিনিয়ন [Binyon] এবং পিউরিট্যানদের মধ্যে যেমন দেখা যায়—এমন এক তুঙ্গে উঠল যা ক্যাথলিক দেশগুলিতে আগে কখনও দেখা যায়নি। সেই কারণে সৎপথে প্রত্যাবর্তনের (converson) নতুন প্রক্রিয়াও দেখা দিল যাতে এই অসহনীয় স্ব-আরোপিত অপরাধের বোঝা খৃষ্টের হৃদয়ে সমর্পণ করা হল। কারণ, প্রকৃতপক্ষে মানুষ কখনও একা বেঁচে থাকতে পারে না। এই 'সৎপথে প্রত্যাবর্তন' তার প্রমাণ; বুর্জোয়াতন্ত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শুধু একটা আড়াল, এবং যে মুহূর্তে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা সে বলে তখনই ব্যক্তির একটা কাল্পনিক সত্তার বা অন্যকৃত পাপের দৈব ভারবাহীর (Divine scapegoat) দরকার, যার উপর চূড়ান্ত স্বার্থপরতার যে দায়িত্ব সে নিজে কখনও পুরাপুরি পালন করেনি তার বোঝা সে চাপিয়ে দিতে পারে।

এইভাবে হিংসার নৈতিক অপরাধকে এড়াবার পদ্ধতি হিসাবে নিষ্ক্রিয়তাবাদ হল স্বার্থপর। প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে নিষ্ক্রিয়তাবাদী তার **নিজের** চামড়া বাঁচাবার অধিকার দাবি করে। মানুষের নিজের কথা সব থেকে আগে চিন্তা করাটাই নৈতিক দিক থেকে সঠিক কি না এ নিয়ে আমরা চিন্তা করছি না। ঠিক ঠিক মত প্রকাশ করলে বুর্জোয়া দার্শনিকের চিন্তা সেটাই। অন্য এক ধরনের সমাজব্যবস্থায় এটা সঠিক হতে পারে না। তৃতীয় একটা ব্যবস্থায়—সাম্যবাদের ক্ষেত্রে—এটা সঠিকও নয়, ভুলও নয়, এটা অসম্ভব; কারণ, সমস্ত ব্যক্তিগত কর্মেরই সমাজের অন্যান্যদের উপর প্রভাব আছে। এই ঘটনাটা বুর্জোয়াকে অসঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে, এবং এই মুহূর্তে সে চায় অন্যের জন্য জীবন দান করবে, আবার পর মুহূর্তেই চায় নিজের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য অন্যদের জীবনকে বলি দিতে।

কোন কোন নিষ্ক্রিয়তাবাদী একটা অন্য ধরনের যুক্তি দেখায়। তারা তাদের নিজেদের আত্মা নিয়ে চিন্তিত নয়। তারা কেবল অন্যের কথা চিন্তা করে। তারা বলে হিংসা এবং উৎপীড়ন বন্ধ করার একমাত্র পথই হল নিষ্ক্রিয়তাবাদ। হিংসা থেকে হিংসার জন্ম, উৎপীড়ন থেকে উৎপীড়নের। এই যুক্তি কতটা সুদৃঢ় এবং তা বুর্জোয়া বিভ্রমেরই একটা নিছক যৌক্তিকতা ছাড়া অন্য কিছু কি?

অ-প্রতিরোধ (non-resistance) যে কার্যকারণ পরম্পরার দ্বারা হিংসার সমাপ্তি ঘটায় তা আজ পর্যন্ত কোন নিষ্ক্রিয়তাবাদী ব্যাখ্যা করেননি। এটা ঠিক যে সেটা এই রকম সুস্পষ্টভাবেই ঘটে: হিংসাত্মক আদেশের যদি কোন প্রতিরোধ করা না হয়, তাহলে সেগুলি বলবৎ করার জন্য কোনও হিংসারও আবশ্যক হয় না। এইভাবে, খ যা কিছু তাকে করতে বলে ক যদি সেইসব কিছু করে, তাহলে খ' এর পক্ষে হিংসা প্রয়োগ করা আবশ্যক হয় না। কিন্তু এই ধরনের একটা আধিপত্য-বিস্তারকারী সম্পর্ক মূলতঃই হিংসাত্মক, যদিও হিংসাটা প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হয় না। বিজয়ীর প্রতি বিজিতের দুর্বলতা বা বিজয়ী যে ভীতি উৎপন্ন করে তা যদি প্রক্রিয়াটিকে অ-বলপ্রয়োগযোগ্য করেও, তা সত্ত্বেও প্রভুত্ব হল প্রভুত্ব, লুণ্ঠন লুণ্ঠন। শিকারের নখর না থাকলেও, মাংসাশী প্রাণীর যেমন তাকে টুকরো টুকরো করতে বাধে না, অ-প্রতিরোধও সেইরকম হিংসাকে নিরস্ত করতে পারে না। বরং বিপরীতটাই ঘটে। এই ধরনের প্রাণীকেই মাংসাশী প্রাণী তার শিকার হিসাবে বেছে নেয়। মাংসাশী প্রাণীকে অপসারিত করাটাই হল প্রতিবিধান অর্থাৎ যে সব শ্রেণী অন্যান্যদের শিকার করে বেঁচে থাকে তাদের নিশ্চিহ্ন করাটাই প্রতিবিধান।

আর একটা পূর্ব-অনুমান এই যে, মানুষ যা তাই হওয়ার কারণে অসহায় শিকারদের দেখলে তার করুণার উদ্রেক হয়। এখন এই পূর্ব-অনুমানটি স্বতঃই হাস্যকর নয়, এটিকে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। শিকারের অসহায় অবস্থা কি কখনও মানুষের করুণার উদ্রেক করেছে ব'লে ইতিহাস বলে? লক্ষ লক্ষ বিপরীত ঘটনার কথাই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ; যেমন আত্তিলা ও তার হান বাহিনী (হিংসার দ্বারাই একমাত্র যাকে বাধা দেওয়া গিয়েছিল), মুসলমান আক্রমণ, আদিম হত্যাকাণ্ড, ডেন এবং তাদের হাতে মঠবাসিদের নিহত হওয়া। কেউ কি সরল বিশ্বাসে এই প্রস্তাব রাখতে পারেন যে অ-প্রতিরোধ হিংসাকে পরাস্ত করে? শান্তিপূর্ণ বশ্যতাস্বীকার যদি বিজেতার হৃদয় স্পর্শ করত তাহলে দাসমালিক রাষ্ট্রগুলির অস্তিত্ব সম্ভব হ'ল কি করে? মূলতঃ অ-প্রতিরোধকারী লক্ষ লক্ষ ভেড়া, শূকর, গরু বরাবর হত্যা করে আসা কাজটা মানুষ সহ্য করছে কি করে?

তাছাড়া যুক্তিটিতে সেই চিরাচরিত ভুলটাই করা হয়; বুর্জোয়া তার বর্গগুলিকে

চিরস্থায়ী ক'রে এই বিশ্বাসকেই চিরস্থায়ী করে যে বিমূর্ত রবিনসন ক্রুশো ধরনের একজন লোক আছে যার কাজকর্ম সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কিন্তু কি করে তৈমুর লঙ, সক্রাতেস, চীনা মান্দারিন মানুষ, একজন আধুনিক লণ্ডনবাসী, একজন আজটেক পুরোহিত, একজন প্রাচীন প্রস্তরযুগের শিকারী এবং একজন রোমান গ্যালি-ক্রীতদাসকে একই বর্গের মধ্যে ফেলা সম্ভব? বিমূর্ত মানুষ বলে কিছু নেই; আছে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের জালে অবস্থিত মানুষ যাদের বংশানুক্রম একই রকমের কিন্তু শিক্ষা ও সামাজিক সত্তার অবিরাম চাপের ফলে বিভিন্ন প্রবণতার ছাঁচে ঢালা মানুষ।

আজকের দিনে আমরা বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কে অবস্থিত মানুষকে নিয়ে চিন্তা করি। হিংসাকে যদি আমরা আর প্রতিরোধ না করতাম, যেমন ধরুন, প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংলণ্ড যদি জার্মানির বেলজিয়াম অধিকার করাটা নিষ্ক্রিয়-ভাবে অনুমোদন করত এবং জার্মানি যা কিছু করতে চেয়েছে তা বিনা প্রতিরোধে মেনে নিত, তাহলে তার ফল কি হত?

নিষ্ক্রিয়তাবাদীর যুক্তির মধ্যে এইটুকু সত্য থাকে: বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের অবস্থায় কোনও দেশ যাযাবর দলের মত কাজ করতে পারে না। বুর্জোয়াতন্ত্র এটা আবিষ্কার করেছে যে তৈমুর লঙ্গী শোষণ বুর্জোয়া শোষণের মত ফলপ্রসূ নয়। কোন দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই দেশের সমস্ত মদ্য ও সুন্দরী রমণী ও স্বর্ণ লুঠ করে নিয়ে আবার সেই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় বুর্জোয়ার কোনও লাভ নেই। সুন্দরী রমণী বৃদ্ধা ও কুৎসিত হয়ে যায়, মদ্য পান করলে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং স্বর্ণ দিয়ে অলঙ্কার ছাড়া আর কিছু তৈরি হয় না। যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি মুনাফা ও চিরন্তন আধিপত্য বিস্তারের অফুরান খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকে তার মুখে এর স্বাদ লবণ হ্রদের জলের মতই মনে হত।

বুর্জোয়া সংস্কৃতি এই আবিষ্কার করেছে যে, যেটা ফলপ্রসূ তা হল বুর্জোয়া হিংসা। তৈমুর-লঙ্গী হিংসার থেকে এটা অনেক বেশি সূক্ষ্ম আর অনেক কম প্রত্যক্ষ। রোমান হিংসা ছিল মধ্যবর্তী অবস্থানে। তারা কেবল সুন্দরী রমণী আর স্বর্ণই লুঠ করত না, তারা ক্রীতদাসও নিয়ে আসত এবং বাড়িতে, খামারে, খনিতে তাদের দিয়ে কাজ করাত। বুর্জোয়া সংস্কৃতি এটা আবিষ্কার করেছে যে, সব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে লুণ্ঠন ও ব্যক্তিগত দাসত্ব অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং যেগুলি তাকে নিষিদ্ধ করে সেই সম্পর্কগুলিই বুর্জোয়ার কাছে সব থেকে লাভজনক। সেই কারণে বুর্জোয়া যেখানেই অ-বুর্জোয়া দেশ জয় করেছে, যেমন অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা বা ভারত, সেখানেই সে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক আরোপ করেছে, তৈমুর-লঙ্গী নয়।

স্বাধীনতা, আত্ম-নির্ধারণ ও গণতন্ত্রের নামে, অথবা কখনও কখনও কোন নাম না দিয়েই, তারা বুর্জোয়া সারবস্তু বলবৎ করেছে ; ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং মুনাফার জন্য উৎপাদনের উপায়গুলির উপর মালিকানা, এবং তার প্রয়োজনীয় পূর্ব-সর্ত, মজুরির বিনিময়ে নিজের শ্রমশক্তিকে বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য স্বাধীন শ্রমিক। বুর্জোয়ার এই অমূল্য আবিষ্কার যে বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টি করেছে কোনও তৈমুর লঙ বা কোনও ক্রোসাস তার স্বপ্নও কোনদিন দেখেনি।

সুতরাং বিজয়ী জার্মানি সমস্ত ইংরেজ রমণীদের ধর্ষণ করবে, সমস্ত ইংরেজ পুরুষদের মাথা কেটে ফেলবে আর এলগিন সংগ্রহশালাকে বার্লিনে তুলে নিয়ে যাবে— ইংলণ্ডের এই ভয় করার কোন দরকার নেই। বুর্জোয়া রাষ্ট্র সে কাজ করে না। সে কেবল ইংলণ্ডের রাজকীয় সম্পদগুলি নেওয়ার ও সেগুলিকে পুরাপুরি বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কে রূপান্তরিত করার লাভজনক কাজটি সম্পূর্ণ করার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখবে। বিপুল ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপিয়ে বাণিজ্যের প্রতিযোগী হিসাবে ইংলণ্ডকে পঙ্গু করার চেষ্টাও সে করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রতিরোধ কর আর নাই কর, সে যদি জয়ী হয় তাহলে ইংলণ্ডের সঙ্গে এই ব্যবহারই সে করবে, ইংলণ্ড জয়ী হলে জার্মানির সঙ্গে যে রকম ব্যবহার সে করত সেই রকমই।

এইভাবে, নিষ্ক্রিয়তাবাদীর স্বপ্ন যদি বাস্তবায়িত হ'ত তাহলেও বুর্জোয়া হিংসা ঠিকই অব্যাহত থাকত। প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তবায়িত করা যায় না। অপর একটি বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার সমস্ত মুনাফার উৎসগুলি সহিংসভাবে কেড়ে নেবে একথা কোন বুর্জোয়া বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্র কি করে মেনে নিতে পারে, আর তার হাতে হিংসার যত উৎস আছে সেগুলি ব্যবহার না করে কি সে থাকতে পারে? এই রকম কাজ অনুমোদন করার আগে তার রাষ্ট্রের সমস্ত অভ্যন্তরীণ বুনটটা (fabric) কিসে ছিন্নভিন্ন করে দেবে না? বুর্জোয়াতন্ত্র কি আজ তার ব্যক্তিগত মুনাফা ছেড়ে দিয়ে, তারই উপর ভিত্তি ক'রে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে তা পরিত্যাগ করার থেকে বরং সমাজের গোটা বুনটটাকেই সহিংসভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে না কি? দেউলিয়াপনার রক্তাক্ত পথের যাত্রী ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ তার সাক্ষ্য। বুর্জোয়া অর্থনীতি পরিকল্পনাবিহীন ; সে বরং নিজের গলা কাটবে তবু সংশোধন করবে না। আর নিষ্ক্রিয়তাবাদ হল বুর্জোয়া সংস্কৃতির এই জীবনমরণ যুদ্ধের একটা প্রকাশ মাত্র, যা বড় জোর যে সামাজিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সে দাঁড়িয়ে আছে তার সমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং চুপচাপ কিছু না করে বসে থাকবে।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে জোর করে বাস্তবায়িত করার সাহস কি আমাদের আছে? সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে কি গ্যারাণ্টি আমাদের আছে? একমাত্র বাস্তব গ্যারাণ্টি হল

কর্ম। বস্তুর উপর আমাদের বিশ্বাস জোর করে খাটানোর মত, মানুষের প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও বাড়িঘর, রাস্তা, ব্রিজ, জাহাজ তৈরি করে সমাজের বস্তুগত বনিয়াদ গড়ে তোলার মত সাহস আমাদের আছে, কারণ কর্ম থেকে সৃষ্ট আমাদের তত্ত্বগুলি কর্মের মধ্য দিয়ে পরীক্ষিত হয়। আমাদের যদি ভুল হয়, তাহলে ব্রিজ ভেঙে যাক, জাহাজ ডোবে ত ডুবুক, বাড়ি ভেঙে পড়ে ত পড়ুক। প্রকৃতির কার্যকারণতা আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি; যদি আমাদের ভুল হয় তাহলে তা আমাদের উপর প্রমাণিত হোক।

সামাজিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এর আগেও ব্রিজ ভেঙেছে, সংস্কৃতি ক্ষয়ে মিলিয়ে গেছে, বিরাট বিরাট সভ্যতা ধুলায় লুটিয়েছে, কিন্তু সেগুলির ক্ষয় বৃথাই যায়নি। প্রতিটি ভুল থেকে আমরা কিছু না কিছু শিখেছি এবং তৈমুর-লঙ্গী সমাজ, দাস মালিকানার সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কর্মের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তবু সে ব্যর্থতা আংশিক; প্রত্যেক ক্ষেত্র থেকে আমরা আরও একটু বেশি কিছু শিখেছি, ঠিক যেমন প্রথম ব্রিজটির ভেঙে পড়া থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তা আধুনিকতম ব্রিজের মধ্যে নিহিত আছে। শিক্ষাটা সর্বদা একই ছিল, ব্রিজের মধ্যে যে দুর্বলতাটা ছিল তা হল হিংসা, প্রভু ও দাসের, সামন্ত প্রভু ও ভূমি দাসের, বুর্জোয়া ও সর্বহারার মধ্যকার আধিপত্যবিস্তারকারী সম্পর্ক।

কিন্তু সমস্ত বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মতই নিষ্ক্রিয়তাবাদীও অনপেক্ষর (absolute) জন্য অলস কামনায় প্রপীড়িত। তারা সকলেই চিৎকার করেছে, 'আমায় অনপেক্ষ সত্য দাও, অনপেক্ষ বিচার দাও, একটা মোটা দাগের মাপকাঠি দাও যা দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে কর্মের ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারা বাস্তবের বৈশিষ্ট্যগুলি সন্ধান করার শ্রমসাধ্য কাজটি আমি এড়িয়ে যেতে পারি। যুক্তির একটা কবচ, একটা পরশপাথর দাও যা দিয়ে সমস্ত কর্মকে আমি তত্ত্ব দিয়ে পরীক্ষা করে বলতে পারি সেটা ঠিক কি ঠিক নয়। এমন একটা নীতি দাও, যেমন ধরুন, হিংসা ভুল, যাতে করে আমি সমস্ত হিংসাত্মক কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি এবং বুঝতে পারি যে আমিই সঠিক।' কিন্তু যে একমাত্র অনপেক্ষর সন্ধান তারা পায় তা হল বুর্জোয়া অর্থনীতির মাপকাঠি। 'সামাজিক কর্ম থেকে বিরত থাক'। মাপকাঠি তৈরি করতে হয়, পথে ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না।

কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। এমন কি 'কর্ম থেকে বিরত থাক', যা হচ্ছে হোক বলে ছেড়ে দেওয়া—সেটাও এক ধরনের কর্ম করা, যেমন একটা পাথর ফেলে দেওয়া থেকে হয়ত একটা হিমবাহ চলতে শুরু করে। এবং যেহেতু মানুষ সর্বদাই কর্ম করছে, সর্বদাই সে বলপ্রয়োগ করছে, সর্বদাই সে বস্তুর অবস্থানকে হয়

পরিবর্তিত করছে, না হয়ত বজায় রাখছে, সেই কারণে সর্বদাই সে হয় বিপ্লবী, না হয় রক্ষণশীল। অস্তিত্ব হল বস্তুগত পরিবেশ ও অন্যান্য মানুষের উপর বলের প্রয়োগ। ভোট দিই কি দিতে বিরত থাকি, পুলিসকে সাহায্য করি বা তারা তাদের মত চলুক, দুই যোদ্ধাকে লড়াই করতে দিই বা জোর করে তাদের পৃথক করে দিই, বা এক জনের বিরুদ্ধে অপর জনকে সাহায্য করি, কোন লোককে অনাহারে মরতে দিই বা তাকে সাহায্য করার জন্য ত্রিভুবন চষে ফেলি, বস্তুগত ও সামাজিক সম্পর্কের যে জাল নানা মানুষকে একই বিশ্বে গ্রথিত করেছে তা এটাই সুনিশ্চিত করেছে যে আমরা যা কিছুই করি অন্যের উপর তার ফলাফল বর্তায়। অনপেক্ষর উপর নির্ভর করে মানুষ কখনও স্থির থাকতে পারে না; সমস্ত কর্মের সঙ্গেই ফলাফল জড়িত, আর মানুষের কর্তব্যই হল এই সব ফলাফলগুলির সন্ধান করা এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা। কর্ম এবং নিষ্কর্মের মধ্যে একটিকে সে যে বেছে নেয়, তা নয়; একমাত্র জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে একটিকে সে বেছে নেয়। 'আমার উদ্দেশ্য ভালো ছিল', বা 'ভালো হবে ভেবেই এই কাজ করেছিলাম', বা 'আমি কোনও মহান উপদেশ ভঙ্গ করিনি', এই সব পুরাতন অজুহাত দিয়ে কখনও পাপস্খালন হতে পারে না। এমন কি বর্বরদেরও এর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রত্যয় থাকে, তাদের কাছে কোনও কাজের বিচার হয় তার ফলাফল থেকে, যেমন এমনকি একটা ব্রিজেরও বিচার হয় তার স্থায়িত্ব থেকে। অতএব মানুষের কর্তব্য হল কর্মের ফলাফল কি দাঁড়াল তার সন্ধান করা: যার অর্থ হল, সামাজিক সম্পর্কের নিয়মগুলি, আবেগ তাড়নাগুলি, ইতিহাসের হেতু ও ফলাফলগুলি আবিষ্কার করা।

অর্থাৎ পারসিকদের আক্রমণ থেকে গ্রীসকে, অথবা সন্ত্রাস্য ধর্ষণকারীর হাত থেকে তাঁর ভগ্নীকে তিনি রক্ষা করবেন কি না নিষ্ক্রিয়তাবাদীকে এসব প্রশ্ন করা নিরর্থক। আধুনিক সমাজ ভিন্নতর এবং আরও বেশি বাস্তব একটা প্রশ্ন তুলে ধরছে। হিংসার কোন্ পতাকার নীচে সে নিজেকে দাঁড় করাবে? বুর্জোয়া সম্পর্কের হিংসার দিকে, নাকি সেগুলিকে শুধু প্রতিরোধ করাই নয়, সেগুলির অবসান ঘটানোর জন্য হিংসার দিকে? যে শোষণ ও অপহরণের জন্য হিংসার উপর তার ভিত্তি, বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি সেগুলিকেই আরও বেশি বেশি করে উদ্ঘাটিত করছে। নৃশংসতা ও উৎপীড়নের দ্বারা সেগুলি আরও বেশি বেশি করে মানুষকে অস্থির করে তুলছে। কর্ম থেকে বিরত থেকে নিষ্ক্রিয়তাবাদী নিজেকে এই পতাকার নীচে, যেখানে ব্যাপার যা ছিল তাই আছে এবং ক্রমেই আরও খারাপের দিকে চলেছে সেই পতাকার নীচে, না পাওয়ার দলের উপর পাওয়ার দল যে আরও বেশি বেশি করে হিংসা ও বল প্রয়োগ করছে সেই পতাকার নীচে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। দারিদ্র্য,

অনাহার, কৃত্রিম মন্দা, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের অবনতি, ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের হিংসাকে সে আরও বেশি বেশি করে ডেকে আনে।

অথবা, নিজেকে নিয়ে গিয়ে সে বিপ্লবী পতাকার নীচে দাঁড় করাতে পারে, যে পতাকা হল অবস্থা যা হবে তার পতাকা। সেই কাজ করলে এই কঠোর প্রয়োজনকে সে স্বীকার করে নেয় যে, যে লোককে একটা সত্য, বা একটা প্রতিষ্ঠান বা একটা সামাজিক সম্পর্ক-ব্যবস্থাকে হঠাতে হবে তাকে তার থেকেও অপেক্ষাকৃত ভালো একটা বিকল্প সেখানে বসাতে হবে। একটা ব্রিজ যতই কাজের বার হোক না কেন সেটাকে যে ভেঙে ফেলবে তাকে একটা অপেক্ষাকৃত ভালো ব্রিজ সেখানে বসাতে হবে। দাস মালিকানার সামাজিক সম্পর্কগুলির থেকে হয়ত বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি অপেক্ষাকৃত ভালো। তার থেকেও বেশি ভালো কোন্ জিনিসের সন্ধান বিপ্লবীরা দিতে পারেন? আর সেই জিনিসের সন্ধান পাওয়ার পর সেগুলিকে কি করে তিনি রূপ দেবেন? কারণ বিপ্লবীর পক্ষে শুধু পরিকল্পনা করলেই ত হল না, কি করে সেটা গড়ে তোলা যাবে তাও দেখতে হবে। হিংসার সাহায্যে, বলের সাহায্যে জলজ্যান্ত পাহাড়গুলিকে ফাটিয়ে এবং যে পাথর দিয়ে সেটা তৈরি সেগুলিকে টেনে হঠিয়ে, পরিশ্রম করে কিভাবে সেটা গড়ে তোলা যাবে তা-ও দেখতে হবে।

অর্থাৎ, নিষ্ক্রিয়তাবাদের যে নেতিধর্মিতা অবক্ষয়ী জগৎকে কোনও মতে ঠেকা দিয়ে রেখেছে এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান দুঃখদুর্দশাকে সহ্য করে যাচ্ছে, বিপ্লবীকে তার জায়গায় সাম্যবাদের ইতিধর্মিতাকে বসাতে হবে। বুর্জোয়া সামাজিক শক্তিগুলিকে অধিগ্রহণ করে তার মধ্যকার বলপ্রয়োগাত্মক হিংসা থেকে সেটিকে বিমুক্ত করার উপযুক্ত এক নতুন অর্থনীতি তাকে গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু একটা শ্রেণী-সম্পর্ক থেকে এই হিংসার জন্ম হয়েছিল। সেই সম্পর্কটা ছিল একটা শোষিত শ্রেণীর উপর একটা শোষক শ্রেণীর আধিপত্য। এই হিংসার অবসান ঘটানোর অর্থ হল শ্রেণীহীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা। শান্তির সময়েই হোক, আর যুদ্ধের সময়েই হোক, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের এই হিংসাকে ঘৃণা ক'রে বিপ্লবীকে এমন একটা সমাজ সৃষ্টি করতে হবে হিংসার প্রয়োজন যার থাকবে না, তা সে শান্তির সময়েই হোক, আর যুদ্ধের সময়েই হোক। যেহেতু বস্তুগত বাস্তবকে নিয়ে তাকে নাড়াচাড়া করতে হয়, সেইজন্য তাকে একমাত্র সেই পথটিকেই দেখতে হয় যার সাহায্যে সহিংস বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ককে শান্তিপূর্ণ সাম্যবাদী সামাজিক সম্পর্কে পরিবর্তিত করা যায়। এটা হল বিপ্লবের ও সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের পথ, এর পরবর্তী কালে রাষ্ট্র ক্রমে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যাবে। স্থপতি যেভাবে বাড়ির ভিত্তি তৈরি করা ও মালপত্র পরিবহনের কথা ভাবে, বুর্জোয়া

হিংসাকে সাম্যবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিটাকে সে যদি স্পষ্ট দেখতে না পায়, তাহলে তার সমাজতন্ত্রও থেকে যায় শূণ্যগর্ভ স্বপ্ন ; মনে মনে তখনও সে নিষ্ক্রিয়তাবাদী, অবস্থা যা আছে সেইরকমই থাকার সে পক্ষপাতী, যত তাত্ত্বিক আপত্তি প্রতিবাদই সে করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া হিংসার, ধর্মঘট ভাঙার বা ফ্যাসিবাদকে 'বাক্‌স্বাধীনতা' দেওয়ার পতাকার নীচে সামিল হিসাবেই তাকে দেখা যাবে।

পরস্বাপহারীর সম্পদ কেড়ে নেওয়া, তাদের বলপ্রয়োগকে শ্রমিকের বলপ্রয়োগ দিয়ে বিরোধিতা করা, শ্রেণী সংঘর্ষ ও শোষণের যা কিছু হাতিয়ার বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে দানা বেঁধেছে সে সব কিছুকে ধ্বংস করাই হল প্রথম কর্তব্য। শোষিত ছাড়া এই সংগ্রামকে অন্য কে পরিচালনা করতে পারে? আর কেবল সমস্ত শোষিত মানুষই নয়, শোষিত হওয়ার ফলেই যারা সংগঠিত হয়েছে, তারা একত্রিত হয়েছে, এবং সামাজিক দিক থেকে সহযোগিতা করতে তারা বাধ্য হয়েছে, সেই সর্বহারা ছাড়া আর কে সে কাজ পারবে? যে শ্রেণীর সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয় সে যতক্ষণ আশা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে লড়াই চালাবেই। সেই কারণে পূর্বতন বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্র এবং তার বৈশিষ্টপূর্ণ রূপগুলির জায়গায় সর্বহারার একনায়কত্ব ও তার প্রয়োজনীয় রূপগুলি প্রতিষ্ঠা করার এই উত্তরণ কাজটি সহিংস ছাড়া আর অন্য কোনভাবে কার্যকর করা কি সম্ভব?

কিন্তু বুর্জোয়া সংখ্যালঘুদের একনায়কতন্ত্রকে চিরস্থায়ী করে তোলা হয়েছিল এই কারণেই যে বঞ্চিত শ্রেণীই সেখানে ছিল শোষিত শ্রেণী। আর সেই জায়গায় সর্বহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের একনায়কতন্ত্র নিজেকে চিরস্থায়ী করে না, কারণ তা বঞ্চিত শ্রেণীকে শোষণ করে না, বরং সে নিজেই উৎপাদনের উপায়গুলির মালিক ও শ্রমিক দুই-ই। এইভাবে, বঞ্চিত শ্রেণী যত লোপ পেতে থাকে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রও তার যাবতীয় রূপ সমেত ক্রমে ক্রমে ততই ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকে। নিষ্ক্রিয়তাবাদীর স্বপ্ন তখন বাস্তবায়িত হয়। মানুষের জগৎ থেকে হিংসা দূর হয়ে যায়। মানুষ অবশেষে স্বাধীন হয়ে ওঠে।

ছয়

ভালোবাসা

পরিবর্তনশীল মূল্য সম্পর্কে একটি আলোচনা

মানুষের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা এই যে, সে মনে করে কোনও কিছুই পরিবর্তিত হয় না, ধারণাগুলি সব শাশ্বত এবং শব্দ দিয়ে যা সূচিত হয় তা সেই শব্দেরই মত পরিবর্তনহীন ও অপরিবর্তনীয়। বাস্তবের খণ্ডগুলির প্রতি এই অস্পষ্ট ভঙ্গীগুলি, যাকে আমরা প্রত্যয় বলে থাকি সেগুলি. যে কেবলমাত্র যে বস্তুটির দিকে নির্দেশ করা হচ্ছে সেটিকে বর্ণনা করতে পারে না তাই নয়, এমন কি সেই একই বস্তুটিকে যে নির্দেশ করতে পারে তাও নয়। আমাদের উৎসুক দৃষ্টির সামনে সেগুলি কেবলমাত্র হয়ে ওঠার (becoming) প্রক্রিয়ার মধ্যে ভিন্ন ও পরিবর্তনশীল (divers et ondoyant) একটা কিছুর দিকে নির্দেশ করে। মুখ্যতঃ এই শিক্ষাটি দিয়েই প্রজ্ঞা (wisdom) গঠিত। সমস্ত ছোটখাটো ছুটন্ত জিনিসকেই কুকুর তার 'শিকার' বলে ধরে নেয়। একটা শব্দ হিসাবে সেটাকে সে উচ্চারণ করে না, তা সত্ত্বেও সেটাকে তাড়া করার একটা গতানুগতিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কুকুর তার প্রত্যয়ের অপরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। তার বোকামিটা আমরা বুঝতে পারি; কারণ আমরা 'শিকারকে' খরগোস, ইঁদুর, বিড়াল, এমন কি হয়ত ভিন্ন ভিন্ন অভ্যাসসম্পন্ন বিশেষ বিশেষ বিড়াল ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছি। কিন্তু উল্লেখের অপেক্ষাকৃত উপরের স্তরে আমরাও একই ধরনের ভুল করে থাকি।

যেমন ধরুন, ভালোবাসা একটা সুনির্দিষ্ট ও বেশ স্পষ্ট কিছু ব্যাপার একথা মনে করার একটা ঝোঁক আমাদের থাকে। আমরা যদি রোমান্টিক কবি, ঔপন্যাসিক বা চলচ্চিত্র-দর্শক হই তাহলে ভালোবাসা যেন একটা স্বর্গীয় গহ্বর আর আমরা তার মধ্যে পড়ে যাই, এইভাবে তাকে চিত্রিত করার একটা বিপদ আমাদের থেকে যায়। সেই গহ্বরের কিনারা পার হয়ে তার মধ্যে হাবুডুবুই খাই, বা তার বাইরে নিরাপদেই থাকি, সেটার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও সন্দেহ আমাদের থাকে না। সহজপ্রবৃত্তিবিষয়ক মনোবিদ্যার বিশারদদের কাছে ভালোবাসা একটা সহজাত প্রতিক্রিয়া (innate response); অর্থাৎ কোন উদ্দীপকের কারণে স্পষ্ট সুস্পষ্ট-ভাবে সূচিত একটা আচরণ-ছক (behaviour-pattern), ঠিক যেমন পয়সা ঢুকিয়ে দিলে একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চলতে সুরু করে দেয় সেই রকম। মনঃসমীক্ষকের কাছে ভালোবাসা হল কিছুটা পরিমাণ মানসিক শক্তি যার নাম কাম (libido), এক পাউণ্ড চর্বির

মত বা সীমাবদ্ধ ও সমসত্ত্ব; যা অবদমন (repression) ও বাধের (inhibition) সাহায্যে বিভিন্ন খাতে প্রেরিত হয়, এবং নিজের উপর ফিরে আসে ; সংক্রমিত হয়, কামজশক্তিসম্পন্ন ও স্থানান্তরিত হয় (cathexed and displaced), কিন্তু সেই একই সুসংগতিপূর্ণ চর্বির মত তাকে কল্পনা করা হয়।

কিন্তু ভালোবাসা বলতে আমাদের যুগের বিবাহ ও সম্পত্তির বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির উপর নির্ভরশীল একটা বিশেষীকৃত 'আচরণ-ছক', এই অর্থটুকুর মধ্যে আমরা যদি শব্দটিকে সীমাবদ্ধ না রাখি তাহলে ভালোবাসা হল সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যকার আবেগগত উপাদানকে মানুষেরই দেওয়া একটা নাম মাত্র। সমস্ত ভাষা ও প্রয়োগ-বিধিই এ বিষয়ে একমত বলে মনে হয় যে, আমি ভালোবাসি, j'aime এই প্রকাশগুলি যৌন এবং সামাজিক দুরকম আবেগ বোঝাতেই ব্যবহার করা যেতে পারে। ফ্রয়েডপন্থীরা এর যে ব্যাখ্যা দেবেন সেটা এখনই পরীক্ষা করা যাবে। আমাদের দেওয়া ভালোবাসার সংজ্ঞাটি যদি সঠিক হয়, তাহলে এটা সত্য যে ভালোবাসাই পৃথিবীকে চালাচ্ছে। কিন্তু এই কথা বললে বরং আরও সঠিক হয় যে, সমাজ যেভাবে চলছে সেইভাবে চলার দ্বারা ভালোবাসাকে সেটি যা তাই করে তুলেছে। জানা এবং হয়ে ওঠার মধ্যকার যে সম্পর্ক, যা কেবল দ্বান্দ্বিক উপায়েই বোঝা যায়,—এটাও সেই ধরনেরই একটা সম্পর্ক। চিন্তা ক্রিয়াকে পথ দেখায়, অথচ ক্রিয়াই চেতনার জন্ম দেয় এবং সেইজন্য দুটি পৃথক হয়ে যায়, সংগ্রাম করে, এবং পরস্পরের উপর ফিরে আসে এবং সেইকারণে অবিরাম বিকশিত হয়। মানব জীবন যেমন জানার সঙ্গে সত্তার মিশ্রণ, ঠিক সেইরকম সমাজ হল অর্থনৈতিক উৎপাদনের সঙ্গে ভালোবাসার মিশ্রণ। ভালোবাসাকে যিনি বায়বীয় ও আত্মার মধ্যে নিহিত ব'লে এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনকে স্থূল ও পার্থিব ব'লে চিন্তা করতে অভ্যস্ত তাঁর কাছে এই কথা অমার্জিত এবং এমন কি হাস্যকর বলেই মনে হবে। কিন্তু আমাদের দেহ দিয়ে আমরা ভালোবাসি, এবং আমাদের দেহ দিয়ে আমরা খাই, পরিশ্রম করি এবং দুজন ব্যক্তির মধ্যে গভীর ভালোবাসাকে অচিরস্থায়ী ভালো-বাসার থেকে এই পরীক্ষার সাহায্যেই সাধারণতঃ পৃথক করে দেখা হয় যে, দুজনে একত্র জীবনযাপন করতে চায় এবং তারপর সমাজের একটি অর্থনৈতিক একক হিসাবে কাজ করতে চায়। জীববিদ্যা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুজনের মধ্যে ভালোবাসা, তার যৌন রূপে, দেখা দেয় সামাজিক অর্থনৈতিক উৎপাদনের পূর্বে। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে অর্থনৈতিক উৎপাদন বিপাকক্রিয়ার (metabolism) প্রাথমিক স্বতন্ত্র রূপ হিসাবে আবশ্যকীয়ভাবে ভালোবাসার আগে দেখা দিয়েছে, কারণ সেটাই প্রাণের সারবস্তু (essence)। আদিম জীবকোষের মধ্যে ভালোবাসার অস্তিত্ব

দেখা দেওয়ার আগেও বিপাকক্রিয়া বর্তমান। জীবকোষগুলি প্রথমে বিভাজনের দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি করে, একধরনের অতিরিক্ত গঠন-প্রক্রিয়া (anabolism) হিসাবে ; এবং ঝাঁক-বাঁধা অবস্থায় (সামাজিক আচরণ) বা বংশরক্ষার জন্য জোড়-বাঁধা অবস্থায় (যৌন আচরণ) তারা একত্রিত হয় না। কিন্তু প্রাণের ইতিহাসের প্রথম প্রত্যূষে বিপাকক্রিয়া যেহেতু ভালোবাসার সম্পর্কের পূর্বেই দেখা দেয়, তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, ভালোবাসা হল প্রাণের ক্ষেত্রতলের উপরে এক আকস্মিক বিভাভা (iridescence)। বিপাকক্রিয়া তার প্রোটিন অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণ দাবি করে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বটে, তবু বস্তুগত স্তরে ইতোমধ্যেই বিপাকক্রিয়ার মধ্যে, মানুষ যার নাম দিয়েছে প্রাণশক্তি (Eros), সেই জিনিসের প্রাথমিক নির্ণয়সাধ্য উপাদান (rudiments) পাওয়া যায়। ভালোবাসা বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকতে বাধ্য।

সাধারণ মানুষের চিন্তা এবং দার্শনিকের চিন্তা দুই-ই ভালোবাসার এই গভীর ভিত্তিগুলিকে স্বীকার করেছে। যে আবেগোদ্দীপকগত (affective) বন্ধনসূত্রগুলি যৌন দিক থেকে স্ত্রী ও পুরুষকে, বন্ধুত্বের দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষকে, এবং পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সন্তান ও মাতাপিতাকে যুক্ত করে রাখে সাধারণ মানুষের চিন্তা সেগুলিকে একই নাম দিয়েছে। সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও প্রজার প্রতি রাজার ভালোবাসা, শিক্ষকের প্রতি তার ছাত্রের ভালোবাসা, আপন শাবক ও প্রভুর প্রতি পশুর ভালোবাসা সবগুলিকে একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানুষের মনে যে সমস্ত বিখ্যাত ধর্ম সাড়া জাগিয়েছে তার সবগুলিই ভালোবাসার কথা যে এত বেশি করে বলেছে সেটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। অচেতন (unconscious) সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রতীকীকরণ থেকেই ধর্মগুলি সর্বদা তাদের মূল্য ও শক্তি আহরণ করেছে এবং ভালোবাসা যেহেতু সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যস্থতা করে, সেইজন্য ধর্ম যখন ঈশ্বর, মুক্তি, স্বর্গ, নরক এবং করুণার বিষয়ে অলীক কথাবার্তা বলে তখন তা সর্বদা ভালোবাসার কথাই মূলতঃ বলে থাকে। ঈশ্বর প্রেমময়— অতীন্দ্রিয়বাদীদের এই দাবি এবং ভালোবাসার উদ্দেশ্যে সেণ্ট পলের স্তবগাথা হল যে সমস্ত ধর্ম অতীতে সামাজিক শক্তি ছিল তারই মূল্যবান সাধারণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এক যথাযথ বিবৃতি। ত্রি-ত্ব (trinity), দেবদূত (cherubims), পার্গেটরিতে পবিত্র আত্মাদের অবস্থান, সন্তদের সম্মিলন (Communion of the Saints)—এ সবের অস্তিত্ব নেই, এবং সেগুলির অস্তিত্ব আছে কি না তাতে মানুষের কিছু আসত যেত না, কারণ অতীতে মানুষ ইহুদী পুরাণের দেবতা ও নরক (Yahweh and Sheol), বুদ্ধ ও নির্বাণ, বাল (Boel) ও গিলগামেস নিয়ে সন্তুষ্ট

থেকেছে। মানুষের যেটা আসল ব্যাপার তা হল সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যকার আবেগগত উপাদান, যাকে এই পৌরাণিক কাহিনীগুলি প্রতীকায়িত করেছে এবং যা যুগে যুগে মানুষকে সে যা তাই করে তুলেছে। এই আবেগ এই সব সম্পর্ক-গুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে পৃথক কোন জিনিস নয়, সেগুলি থেকেই এই আবেগের জন্ম এবং এইভাবে তা ধর্মকে নির্ধারিত করে। প্রত্যেক যুগে মানুষের গুণ নির্ধারিত হয় তার আবেগগত ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত সম্পর্কগুলির সাহায্যে এবং এগুলি পৃথক নয়, তা একই সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ।

ফ্রয়েডপন্থীদের অবস্থানটা হল: সমস্ত আবেগগত সম্পর্কই আসল লক্ষ্য থেকে বঞ্চিত যৌন ভালোবাসার নিছক প্রকরণ (variations) মাত্র। এইজন্য সুকোমল সম্পর্কগুলির সমস্ত প্রকার ভেদকেই লোকে 'ভালোবাসা' বলে, যেহেতু সেগুলি নিছক রূপান্তরিত যৌনতা বা ভিন্নমুখীকৃত কাম (diverted libido)। সুকোমলবৃত্তি হল বাধযুক্ত যৌনতা। সরল ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদ চিত্তাকর্ষক হলেও এর ভিত্তি হল অবিন্যস্ত চিন্তা। এই মতবাদ ধরে নেয় যে, পরিষ্কার গন্তব্যস্থল একটা আছে, আর তা হল যৌন সংগম, এবং যে ভালোবাসাই এই লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না সেই ভালোবাসাই হল কোন না কোন অর্থে রুদ্ধগতি। এতে অবশ্য মনের মধ্যে লক্ষ্যটি সুস্পষ্টভাবে আছে এই রকম একটা কিছু পূর্বেই ধরে নেওয়া হয়, এবং ভালোবাসার কোনও দেবতায় যদি আমরা বিশ্বাস না করি, তাহলে এই 'একটা কিছু' একমাত্র প্রেমিকই হতে পারে। কিন্তু সংজ্ঞা অনুসারে মানস (psyche), যার বাধযুক্ত যৌনতা ভালোবাসা হয়ে ওঠে বলে মনে করা হয়—সেই মানস তার প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতন উদাহরণ হিসাবে, ফ্রয়েডের প্রেমতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেই শিশুর যৌনতার কথাই ধরা যাক। শিশুর স্নেহ-ভালোবাসা কিভাবে রুদ্ধগতি যৌন ভালোবাসা হওয়া সম্ভব? একদিকে শিশুর যৌন সংগমের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না এবং সে সচেতনভাবে সেটা কামনা করতে পারে না এবং সেটা অবচেতন দিক থেকেও সে কামনা করতে পারে না; অর্থাৎ দেহকোষের দিক থেকে পারে না। যেহেতু যৌন সংগম সম্পন্ন করার মত কোনও ইন্দ্রিয় বা প্রতিবর্ত তার নেই। উপযুক্ত প্রতিবর্ত (reflex) ছাড়া অবচেতনের কাছে যৌন সংগমের অস্তিত্ব অসম্ভব। শিশুর ভালোবাসা সেই কারণে অন্য ধরনের,—সেটা শিশুসুলভ ভালোবাসা। এটা ঠিক যে শিশুসুলভ ভালোবাসা অনেকগুলি শরীরস্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যার অনেকগুলি পরবর্তীকালে যৌন দিক থেকে কামধর্মী হয়ে ওঠে। কিন্তু তার অর্থ শুধু এই যে, মানুষ হল বস্তুমূলক, তার একটা দেহ আছে, এবং অন্য দেহের সঙ্গে সংযোগ ঘটানোর জন্য এই দেহের ব্যবহার করা হয়। জগতের অন্যান্য

অধিবাসীর সঙ্গে তার সংযোগকে প্রকৃত শারীরিকসংযোগ হতেই হয়—সে যখন শিশু থাকে তখন সেটা মুখ্যতঃ স্পর্শেন্দ্রিয়গত পরবর্তীকালে তার সঙ্গে দর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়গত দিকটিও যোগ হয়। শিশুর ভালোবাসা রুদ্ধগতি যৌন ভালোবাসা নয়, কারণ শিশু লক্ষ্য হিসাবে যৌন সংগম জানেও না, সেটা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা শিশুসুলভ ভালোবাসা। শিশুসুলভ ভালোবাসা পরবর্তীকালে যৌন ভালবাসা হয়ে উঠবে একথা স্বতঃসিদ্ধ। 'রুদ্ধগতি' বলাটা হল যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটাই ধরে নেওয়া। মনে করা যাক, এর পরিবর্তে, ফ্রয়েড বলেছেন যে শিশুসুলভ ভালোবাসা হল 'রূপান্তরিত' (modified) প্রাপ্তবয়স্কের ভালোবাসা। হেত্বাভাসটা (fallacy] তাহলে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাই। বিপরীতভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভালোবাসাটাই হল 'রূপান্তরিত' শিশুসুলভ ভালোবাসা। আরও প্রাথমিক আচরণ-ছকটিকে এটি অন্তর্ভুক্ত করে ; কিন্তু ফ্রয়েড যা স্বীকার করে নিয়েছেন সেটাকে তা আরও অনেক বেশি বিস্তারিত ও শক্তিশালী এক নতুন ব্যবস্থায় (system) সমন্বয়িত করে ; যৌন সংগমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিবর্তগুলির আবির্ভাবের কারণে, গৌণ যৌন হরমোন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানসিক গঠন ও বিষয়বস্তুতে যে সব গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে তার কারণে এই সমন্বয় ঘটে। অতএব ভালোবাসার বিকাশকে ফ্রয়েড উল্টো করে দাঁড় করিয়েছেন। শিশুর আবেগোদ্দীপকগত জীবনকে 'বহুমুখী কামবিকৃতিসম্পন্ন' ('polymorphous perverse) প্রাপ্তবয়স্কের রুদ্ধগতি বা বাধযুক্ত আবেগোদ্দীপকগত জীবন হিসাবে দেখাটা শিশুর দেহকে রুদ্ধগতি বাধযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কের দেহ হিসাবে দেখার মতই সঠিক হবে।

একই ভাবে, শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার সম্পর্কটিও রুদ্ধগতি বা বাধযুক্ত যৌন ভালোবাসা নয়। যৌন ভালোবাসা হল কোন কোন উদ্দীপকের (stimuli) দ্বারা জাগ্রত একটা আচরণ-প্রতিক্রিয়া (behaviour response)। যৌন সংগমের জন্য কামনা এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। শিশু এর উদ্দীপক নয়। শিশু সহজপ্রবৃত্তিগত বাৎসল্য ভাবের প্রাথমিক উদ্দীপক আদৌ কি না এ বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে। কুকুরীদের মধ্যে মিথ্যা গর্ভধারণ প্রক্রিয়াটি এর বিপরীতটাকেই প্রমাণ করে বলে মনে হয়। গর্ভধারণ কাল দেখা দিলে, কোন কোন অবস্থায়, এই প্রাণীদের মধ্যে গর্ভধারণ না করেও মাতৃসুলভ আচরণ ও আবেগ দেখা দেয়। অস্তিত্বহীন এক শাবকের প্রতি রুদ্ধগতি যৌন ভালোবাসা হিসাবে এই মাতৃসুলভ ভালোবাসাকে গণ্য করার অর্থ হল মনোবিদ্যাকে এক হাস্যরসাত্মক নাটকে পরিণত করা। মাতাপিতার ভালোবাসার আচরণ-ছক যৌনআচরণ-ছকের থেকে নানা ভাবে ভিন্ন।

আবার, চিরস্থায়ী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব থেকে শুরু ক'রে যাকে কখনও দেখিনি সেই লোকও নিজের দেশের লোক বা সমপর্যায়ভুক্ত মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন, শুধু এইটুকু জেনেই তার জন্য যে কোমল অনুভূতি আমরা অনুভব করি, সেই অবধি সব রকমের ভেদ-সহ একই লিঙ্গভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যকার বন্ধুত্বের স্বাভাবিক সম্পর্কগুলি এক নির্দিষ্ট পার্থক্যবিশিষ্ট আচরণ—ছকের গুচ্ছ গড়ে তোলে। এগুলিকে রুদ্ধগতি বা বাধযুক্ত যৌন ভালোবাসা হিসাবে গণ্য করা বিজ্ঞানসম্মত নয়। বাস্তবিক পক্ষে, সেরকম করার অর্থ হল যৌন বিকৃতির রীতিমত সুস্পষ্ট প্রত্যয়টিকে অর্থহীন করে তোলা। সমকামিতা বা পশু কামিতার ঘোরে যৌন আচরণ-আবেগগত ছকটি অস্বাভাবিক বস্তুর দিকে চালিত হয়, এবং সেইকারণে আবশ্যকীয়ভাবে তা রূপান্তরিত হয়। কিন্তু নিজ লিঙ্গভুক্ত মানুষ বা পশুর প্রতি মানুষের সমস্ত কোমলতাই যদি সেই অভিনব পরিবেশের দ্বারা রূপান্তরিত যৌন আচরণ-ছকই মাত্র হয় তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? বন্ধুত্ব এবং কামবিকৃতির মধ্যে পার্থক্য কি করে আমরা বুঝব? সহজপ্রবৃত্তি ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে যে কি তা বুঝতে ভুল করার জন্যই এই ভুল হয়। সহজপ্রবৃত্তি হ'ল অভিজ্ঞতার দ্বারা সাপেক্ষীকৃত বা রূপান্তরিত একটি নির্দিষ্ট সহজাত আচরণ-ছক বা প্রতিবর্ত-মালা। ভালোবাসা শব্দটিকে সাধারণতঃ যেভাবে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে, অন্য মানুষের উপস্থিতিতে আনন্দ, এক ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য ব্যক্তির প্রতি বেশি ইন্দ্রিয়ানুভূতি, তাদের প্রতি মহানুভবতা, তাদের দেখার বাসনা, এবং অন্যান্য অনেক ধরনের স্নেহপূর্ণ আচরণ, যা মনোবিদ্যা বিশারদরা কেবলমাত্র নীরস ও আনুষ্ঠানিক ভাবেই বর্ণনা করতে পারেন এমন ধরনের রূপান্তরিত আচরণ-ছকগুলি অন্তর্ভুক্ত। যৌন সঙ্গমের কামনাও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই শেষেরটি যেসব আচরণ-ছকের অংশ, কেবলমাত্র সেগুলিকেই যৌন ভালোবাসা বলা উচিত, এবং বন্ধুত্বের অন্যান্য সমস্ত রূপগুলিতে যৌন সংগমের চাপা কামনা থাকে একথা মনে করা হল সেই 'হোয়াইট নাইটের' পরিকল্পনাটি গ্রহণ করা—

> '…ঝুলপিজোড়াকে সবুজ রঙে ছোপাতে হবে। আর তারপর এমন বড়ো একটা পাখা ব্যবহার করতে হবে যে সেগুলো দেখা যাবে না।'

আর এটাই হল মোটামুটিভাবে ফ্রয়েডপন্থীদের অবস্থান।

সমস্ত পশুর মত মানুষও একটা প্রাণী যার সহজাত আচরণ-ছকগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা রূপান্তরিত হয়, সাধারণতঃ আরও ভালোর অনুকূলে, অর্থাৎ, বাস্তবের সঙ্গে আরও দক্ষভাবে যাতে সে মোকাবিলা করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে বলে শিক্ষা (learning), অন্যান্য প্রক্রিয়ার মত আমাদের ভালোবাসার প্রতিক্রিয়াগুলির

সাহায্যেও আমরা শিক্ষালাভ করি। এই প্রক্রিয়াকে বাধ বা অবদমন বললে বিবর্তনের প্রক্রিয়াটাকেই উল্টে ধরা হয়।

অবশ্যই, যৌন ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণসূচক প্রতিক্রিয়াগুলি খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এবং প্রত্যেক ছকেই দুটিরই সাধারণ উপাদান বর্তমান। কিন্তু যেহেতু একটি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ব্যবস্থাসহ একটি দেহ, সেইকারণে এটা সুস্পষ্ট যে তার যাবতীয় আচরণ ছকগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ উপাদান থাকবেই। উদাহরণ হিসাবে, যে কোন পশুর ক্ষেত্রে দৌড়ান কাজটা যৌন ব্যবহারের একটা অংশ হিসাবে দেখা দিতে পারে বা আত্মরক্ষামূলক আচরণের (ভয়) অংশ হিসাবে দেখা দিতে পারে। তা থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়না যে একটি সহজপ্রবৃত্তি অপরটির রূপান্তরিত, অবদমিত বা বাধযুক্ত রূপ।

এই সমস্ত পৃথক পৃথক সহজপ্রবৃত্তিগুলির পৌরাণিক কাহিনীমূলক সত্তাগুলিকে, যেমন ধরুন, পশু বা মানুষের বুকের মধ্যে নিহিত সুনির্দিষ্ট আত্মার মত এগুলিকে আমরা যখনই আমাদের মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারব তখনই এই ব্যাপারে আমাদের কথাটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'সহজপ্রবৃত্তির' মধ্যে বন্য সমাজের সেই আত্মা—যে ছোট্ট মানবকটি পুতুলের দেহের মধ্যে বাস করে তারগুলিতে টান দেয়—মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ফিরে এসেছে। ফ্রয়েডের কাছে কাম বা শাশ্বত প্রাণশক্তি (eternal Eros) নামে এই মানবকটি, রুশোর স্বাভাবিক মানুষের মত, স্বাধীনতার সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার এক ধরনের প্রতীক হিসাবে অদ্ভুতভাবে দেখা দিয়েছে। সমাজের কাঠামোর হাতে হতভাগ্য কাম, শোষিত পীড়িত ও শৃঙ্খলিত হয়েছে নিষ্ঠুরভাবে এবং তার যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সমস্ত সমাজতত্ত্বগত ও মতাদর্শগত প্রক্রিয়াগুলির (phenomena) জন্ম দিচ্ছে। এ সব কিছুই হল শাশ্বত বাসনা ও নিজস্ব লক্ষ্যবিশিষ্ট অভ্যন্তরে বসবাসকারী এক প্রাণশক্তির সেই নিছক পুরাতন 'প্রাকৃতিক দর্শনের' ('natural philosophy) ধারণায় প্রত্যাবর্তন।

এই ধারণাই ফ্রয়েডকে এই কথামনে করার দিকে নিয়ে গিয়েছে যে, একটা জিনিস যাই হয়ে উঠুক না কেন তা বাধযুক্ত বা উদ্গতিপ্রাপ্ত (sublimated) সেই একই জিনিস থেকে যায়। তার অর্থ হল পরিবর্তনকে অস্বীকার করা। মাটি যদি গোলাপ হয়ে ওঠে তখন সেটা শুধু বাধযুক্ত ও উদ্গতিপ্রাপ্ত মাটি থাকে না। অবশ্যই সেটা তখনও সেই একই মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত, কিন্তু সেটা একটা গোলাপও, বটে, যার নিজস্ব চরিত্র, গুণ ও নিয়ম রয়েছে। এখানেও ফ্রয়েড আর একটি ভুল করেছেন। কোন জিনিস থেকে নব কোনও জিনিস যদি সেই জিনিসটি ছাড়া আর কিছুই না

হয়, তাহলে সামাজিক সম্পর্কগুলি যৌন সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয় একথাও আমাদের বলা উচিত নয়। আমাদের বলা উচিত যৌন ভালোবাসা সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি নীচের ধারণাগুলি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে বিবর্তনের ক্ষেত্রে আদিম সামাজিক সম্পর্কগুলি আদিম যৌন সম্পর্কের পূর্বেই দেখা দিয়েছে।

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে স্বতন্ত্র প্রাণীর বিবর্তনের (ontogenesis) সঙ্গে মোটামুটিভাবে জীবজগতের বিবর্তনের (phylogenesis) একটা সাযুজ্য থাকে। যৌন ভালোবাসা অর্জন করার পূর্বে শিশু প্রথমে মা ও ভ্রূণের মধ্যকার সরল বিপাকমূলক (metabolic) সম্পর্কের অভিজ্ঞতা লাভ করে। যার মধ্যে যৌন ভালোবাসা প্রবেশ করে একথা বলা যায় না। কারণ, এক্ষেত্রে কোন কামাত্মক (eroetogenous) অঞ্চল থাকে না। মা ও সন্তানের মধ্যে এটা একটা অর্থনৈতিক সম্পর্ক। পরবর্তী ধাপ হল শিশুসুলভ ভালোবাসা। সেখানে কামাত্মক অঞ্চল আছে, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত যৌন আচরণ থাকে না। শেষ ধাপে, বয়ঃপ্রাপ্তির চরম মুহূর্তে, সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত যৌন প্রতিবর্তগুলি দেখা দেয়। যুক্তি দেখান যেতে পারে যে এই পর্যায়গুলির পূর্বে ডিম্বাণু ও শুক্রকীটের যৌন সম্মিলন ঘটে থাকে। কিন্তু এগুলি হল আত্মপ্রাণীসুলভ (protzoic) সম্পর্ক, মানুষ হল উচ্চ প্রাণী (metazoic)। উচ্চ প্রাণীর ক্ষেত্রে জন্ম ও পুষ্টির সরলতর সামাজিক সম্পর্কগুলির পরেই যৌন সম্পর্ক দেখা দেয়।

যাই হোক না কেন, একথা আত্মপ্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ডিম্বাণু ও শুক্রকীটের সম্মিলনের পূর্ববর্তী অবস্থা হল ডিম্বাণু ও শুক্রকীটগুলির উৎপাদন। এটা একটা অযৌন প্রক্রিয়া এবং স্পষ্টতঃই অর্থনৈতিক এক বিপাক ক্রিয়ার মধ্যে একত্রিত করে বাঁধা দেহকোষগুলির অভ্যন্তরীণ অযৌন অর্থনীতির অংশ। প্রাথমিক যৌন কোষগুলির মধ্যকার সম্পর্কগুলি সেই কারণে যৌন হওয়ার পূর্বে অযৌন থাকে। কিন্তু সমস্ত আত্মপ্রাণীর ক্ষেত্রেই, এমন কি যেগুলি উচ্চপ্রাণী হয়ে ওঠে না সেগুলির ক্ষেত্রেও, ব্যাপারটা একই রকম। তাদের মধ্যকার অযৌন সম্পর্কগুলি যৌন সম্পর্কের পূর্বেই দেখা দেয়। যৌন সম্পর্কগুলি সেগুলির পরবর্তীকালীন পৃথকীভবন (differentiation) হিসাবে দেখা দেয়। বাস্তবিকপক্ষে, ব্যাপারটা স্পষ্টতঃই সেই রকম। যৌন সম্মিলনের দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটার পূর্বে বিভাজন দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি হতেই হবে, কারণ গণিতের দিক থেকে সংযুক্তির (fission) দ্বারা এক থেকে বহু পাওয়া যেতে পারে না। বিভাজন প্রথমে হতেই হবে এবং বিভাজনের জন্য প্রয়োজন এক অতিরিক্ত গঠনপ্রক্রিয়া (surplus anabolism) যা নিজেই এক আদিম অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই বোঝায়। এই

ধারণাগুলি থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে 'এ ছাড়া আর কিছুই নয়' ভিত্তিতে, যৌন ভালোবাসা সামাজিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু অবশ্যই 'এ ছাড়া আর কিছুই নয়' পরিণতিটা অ-সিদ্ধ। মানবজাতির মধ্যে যৌন ভালোবাসা হল, যে সহজাত প্রতিক্রিয়া পুরুষ ও স্ত্রীকোষের মধ্যে সংযুক্তি উৎপাদন করে, তার থেকে আরও বেশি কিছু' একটা ব্যাপার। যে বিপাক উচ্চপ্রাণীর বা কুণ্ডলীকৃত উপনিবেশের (volvex colony) কোষগুলিকে সংবদ্ধ করে (coordinates) তার থেকে মানব-সমাজে সামাজিক সম্পর্কগুলি আরও বেশি কিছু একটা ব্যাপার। তীব্র আবেগযুক্ত ভালোবাসা আর সামাজিক পরার্থ প্রেম দীর্ঘকালব্যাপী ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ফল, এবং সেই পরিবর্তন বাস্তব; এটা যে সেই পুরাতন শাশ্বত সামগ্রই মুখোশ পরে হাজির হয়েছে তা নয়। কিন্তু আধুনিককালে সহজপ্রবৃত্তিবিষয়ক মনোবিদ্যা বিশারদকে পারমেনিদেসের (Parmenides) মত 'হয়ে ওঠার' বাস্তবতাকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক বলেই মনে হয়।

সাধারণ উচ্চপ্রাণীর দেহে বা উপনিবেশ হিসাবে পরিচিত অযৌন আত্মপ্রাণীর সমষ্টির মধ্যে যেমন দেখা যায়, কোষগুলির মধ্যকার অপেক্ষাকৃত সরল সম্পর্কগুলি হল আদিম সামাজিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক, এবং তা সেই ভিত্ত গড়ে তোলে যা থেকে মানবসমাজের উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্ফুরণ ঘটে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেগুলি বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সাধিত একই জিনিস। সেগুলি যা তাই, নিজস্ব বৈশিষ্টসূচক নিয়মের তারা অধীন। সমাজ আর স্বতন্ত্র দেহের মধ্যে যেটা সাধারণ সামগ্রী তা এই যে: মানবদেহের কোষগুলির মধ্যকার সম্পর্ক হল অর্থনৈতিক, শ্রম বিভাজন সেখানে বর্তমান, তার মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ, উৎপন্ন বিনিময় ইত্যাদি। প্রয়োজন দেখা দিলে ব্যক্তি নিজ স্বার্থকে সমষ্টির প্রয়োজনের অধীন করে তোলে। সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই যেমন ঘটে থাকে সেইরকম, কোষগুলি পৃথকভাবে যা অর্জন করে একীভূতভাবে তার থেকে বেশি অর্জন করে। কিন্তু দেহ হল জৈব নিয়মের অধীন, সমাজ সমাজবিদ্যা-বিষয়ক নিয়মের অধীন।

বয়ঃপ্রাপ্তি কালে যৌন কোষগুলি দেখা দেয়; উচ্চপ্রাণীর দেহ কিছু দিন ধরে একটা সামাজিক সামগ্রী হয়ে ওঠার পরেই সেটা দেখা দেয়। যৌনতা সেইকারণে এক ধরনের বিলাসিতা, সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির একটা বিশেষ রূপান্তর হিসাবে পরবর্তীকালে তার আবির্ভাব,। **যৌন ভালোবাসা হল এক রূপান্তরিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক।** উদাহরণ স্বরূপ, ফ্রয়েড যেমন বলেছেন, পরার্থপ্রেম, যখন তা সামাজিকভাবে প্রদর্শিত হয় তখন, ভালোবাসার পাত্রটির সঙ্গে

নিজেকে একাত্ম করার ফল এবং সেই কারণে তা হল যৌন ভালোবাসার একটা বিশেষ রূপ। ব্যাপারটা তা নয়। অপরের জন্য কোনও স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থত্যাগের আদিম ও মৌলিক রূপ হিসাবে পরার্থপ্রেম যৌন ভালোবাসার অনেক পূর্বে, মানব দেহের কোষগুলির যৌনতার সঙ্গে সংযোগহীন বিপাকের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু মানুষের সচেতন পরার্থপ্রেম ঠিক শ্বেতকণিকার অচেতন 'আত্মত্যাগের মত নয়। এ হল পুরাতন পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এক নতুন গুণ। আর যৌন ভালোবাসা হল তার পূর্বে যে অপেক্ষাকৃত সরল সামাজিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল তা থেকে পৃথকীভূত এক নতুন গুণ।

পৃথকীভবনের মধ্য পার্থক্য নিহিত থাকে। সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির পরবর্তীকালীন বিকাশ হিসাবে যৌন ভালোবাসা যদিও নিজের মধ্যে তার ভিত্তির গুণগুলিকে সঞ্চিত করে, কিন্তু তার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে নতুন জিনিসও কিছু থাকে। যৌন ভালোবাসা একমাত্র নিজের জন্যই বর্তমান এমন এক বিলাসিতা; নয়, যে সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকে তার জন্ম তারই মধ্যে আবার সে ফিরে আসে তার ফলে সেগুলি পূর্বে যা ছিল এখন তা থেকে ভিন্ন হয়ে ওঠে। আর এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে, সেগুলি তাদের মধ্যে যে নতুন জিনিসগুলি প্রোথিত থাকে সেগুলিকে আরও বেশি বেশি করে পুষ্ট করতে থাকে। দুটিই পরস্পরকে আলোকিত করতে থাকে; ছিন্নমুণ্ড গিনিপিগের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, যে যৌন ভালোবাসা, মূলতঃ সরল সুষুম্না প্রতিবর্তের (spinal reflexes) একটি মালা। এটা সুস্পষ্ট যে যৌনভালবাসা মানুষের ক্ষেত্রে অনেকগুলি অর্থনৈতিক সম্পর্ককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং সেগুলির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। যৌন সংগম ক্রিয়ার পক্ষে সম্পর্কগুলির এই পারস্পরিক বুননকে জড়িত করার প্রয়োজন হয়না এবং নিম্নপ্রাণীর ক্ষেত্রে তা ঘটেও না। মানুষের পারিবারিক জীবনে সন্তানপালনের সঙ্গে জড়িত সম্পর্কগুলির সঙ্গে বা মানুষের বিবাহের ক্ষেত্রে জীবিকা উপার্জন গৃহস্থালির কাজ এবং বন্ধুত্ব পাতানো প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত সম্পর্কগুলির সঙ্গে যৌন সংগম ক্রিয়াটির ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ার আবশ্যক হয় না। কিন্তু যেহেতু সেটা এইরকম ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে সেই কারণে এই ক্রিয়াটি এইসব সম্পর্কগুলিকে তাপ বিকিরণ করার উৎসের মত করে তোলে, এবং সেগুলি আবার ইন্ধনের কাজ ক'রে তাকে পুষ্ট করে ও সমৃদ্ধ করে তোলে। গোটা ব্যাপারটা এক বিস্তারিত ব্যবস্থা গড়ে তোলে যা সমাজের বুনটকরা পর্দারই (tapestry) একটা অংশ; আর এই পারস্পরিক বুনানি থেকে যে নক্সাটি তৈরি হয় তা এইটাই দেখিয়ে দেয় যে, সামাজিক সম্পর্কগুলিকে রূপান্তরিত যৌন ভালবাসা হিসাবে

দেখায় ফ্রয়েডীয় ধারণাটিই হয়ে ওঠার' প্রক্রিয়াটিকে বিপ্রতীপ (inverse) করে ধরে।

দেহধারী জীবের ইতিহাসে যৌনতার বিবর্তন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ-প্রাণীর কোষগুলির মধ্যে যে ধরনের আদিম বিপাকমূলক সম্পর্ক থাকে তার বৈশিষ্ট্য হল এক সর্বগ্রাসী (totalitarian) নির্দয়তা, যার মধ্যে স্বতন্ত্র কোষ হিসাবে কোষগুলির কোনও অস্তিত্ব থাকে না। স্বতন্ত্র কোষ সামগ্রিক দিক থেকে জীবদেহের সম্পূর্ণ অধীন। ব্যাপারটা অবশ্যম্ভাবী। কারণ কোষটি তার নিজ অধিকারে স্বতন্ত্র নয়; যে মূল কোষটি থেকে সেটি পৃথকীভূত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে তারই একটা অংশ মাত্র। এর ফলে মূল কোষটির সঙ্গে এর প্রায় হুবহু একটা সাদৃশ্য জড়িত থাকে যাতে করে এই ধরনের কোষগুলি যতদিন বিভক্ত হওয়ার ক্ষমতা বজায় রাখে ততদিন তাদের এক ধরনের অমরত্ব থাকে, সন্তানগুলি মূল কোষগুলির সঙ্গে প্রায় অবিকল একই হয়। সেই অনুসারে নতুনের পক্ষে আবির্ভূত হওয়াও কঠিন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ছক পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। মূল কোষটি টক আঙুর খেয়েছিল, আর সেই কারণে অবশ্যম্ভাবীভাবে নাতিদের দাঁত শিরশির করে :

যৌনতার আবির্ভাব একঘেয়ে অভ্যাসের উপর আঘাত হানে। সমাজের চৌহদ্দির মধ্যে সেই কারণে এটা হয়ে যায় স্বাতন্ত্র্যের একটা উৎস। সুনির্দিষ্টভাবে নতুন একটা কিছু এখন আবির্ভূত হয়। কারণ সন্তান এখন মাতা বা পিতার হুবহু নকল হবে না; দুজনের থেকেই বাছাই করা জনিকে (gene) সংযুক্ত ক'রে দুটির থেকেই পৃথক এক স্বতন্ত্র জন হয়ে উঠবে। তাছাড়া, প্রত্যেক সন্তানের মধ্যেই জনিগুলি পৃথক পৃথকভাবে নির্বাচিত হওয়ায় তারা সামান্য একটু ভিন্ন হবে; এবং এইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা মন্দ গুণগুলি দূর করা যেতে পারে। সব সন্তানেরই দাঁত শিরশির করবে না। সন্তানের মধ্যে গুণের পরিসরটাও (range) বর্ধিত হবে। অবশ্য এটাও ঠিক যে অযৌন (asexual) মাতাপিতার সন্তানের থেকে এই ধরনের সন্তানদের কেউ কেউ খুবই নিকৃষ্ট হবে। কারণ মাতাপিতা দুজনেরই দোষগুলি তাদের মধ্যে একত্রিত হবে, কিন্তু অন্যগুলি উৎকৃষ্টতর হবে, এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনও ঘটবে বিস্তৃততর পরিসরের মধ্যে থেকে। এ যেন মন্দের মধ্য থেকে ভালোর আবির্ভাব হল পৃথিবীতে, এবং বিপরীতের অভেদ (identity of opposites) তত্ত্বটি যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করি তাহলে ব্যাপারটা কি সেইরকমই দাঁড়ায় না?

একই সঙ্গে পৃথিবীতে মৃত্যুরও আবির্ভাব ঘটল, ভালোবাসা যেমন স্বাতন্ত্র্যের জনক, তেমনি তা ব্যক্তিত্বের নঞর্থক প্রতিপাদ্য (antithesis) মৃত্যুরও জনক। সেই কারণেই

জীবনমুখী-সহজপ্রবৃত্তি, ও মৃত্যুমুখী-সহজপ্রবৃত্তি, প্রাণশক্তি ও মৃত্যুশক্তি (Eros and Thanatos) এত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত বলে মনে হয়, সেগুলি বিশেষ সহজ-প্রকৃতি হওয়ার কারণেই এটা মনে হয়। ফ্রয়েড যেভাবে ভেবেছিলেন সেইরকম নয়; কারণ মৃত্যু ভালোবাসার অর্থ স্থির করে। সরল বিভাজনের দ্বারা লব্ধ আদিম কোষগুলি যখন মিলিত হয় ও সন্তানের উদ্ভব ঘটায় তখন তাদের অমরত্ব লোপ পায়। মাতাপিতা এখন সন্তানদের মধ্যে কেবলমাত্র এক সাময়িক অর্ধাসক্তভাবে বেঁচে থাকে।

জীবন বলতে আমরা যা বুঝি তাই হয়ে ওঠার জন্য, আরও বেশি পার্থক্যের জন্য, জীবন এই ধরনের এক মূল্য দিয়ে থাকে। অধিকতর সমৃদ্ধি ও জটিলতার জন্য, কালের কাঁটাকে দ্রুততর করে, মৃত্যুর অমূল্য মুদ্রা দিয়ে আমরা দাম দিয়ে থাকি। স্বতন্ত্র কোষগুলির সন্তানরা এখন আর নিজেদেরই নিছক কুঁড়ি মাত্র নয়। সেই সন্তানদের কাছে স্বতন্ত্র কোষগুলি আরও সুপ্রচুর জীবন ও অধিকতর পৃথকীভূত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার দান করে যেতে পারে। কিন্তু নিজের অর্ধেক জনিগত অংশকে চাপা দিয়ে এবং তাদের আশু অমরত্বকে বিসর্জন দিয়েই মাত্র সেটা তারা করতে পারে।' কেবলমাত্র যৌন ভালোবাসার ও প্রকৃত মৃত্যুর এই আবির্ভাবের ফলেই 'ব্যক্তিত্ব' ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের' সম্বন্ধে আমরা কথা বলতে পারি; অন্যান্য কোষগুলি কুঁড়ি মাত্র। নতুন ব্যক্তিত্বের জন্মের জন্য পুরাতনের মৃত্যু অত্যাবশ্যক। এই যে 'অহং যার মৃত্যু হয়, মৃত্যু তাকে সৃষ্টি করে।

যৌন ভালোবাসা কিন্তু দেখতে স্বার্থপর। যৌন কোষগুলি কেবলমাত্র তাদের দুটিরই মধ্যকার ঘনিষ্ঠ স্বয়ংসম্পূর্ণ বন্ধনের অনুকূলেই অ—যৌন প্রজননের সমষ্টিগত ও সামাজিক বন্ধনকে বর্জন করে। তারা বিলাসপ্রিয় কোষ, উচ্চপ্রাণীর দেহের অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা তাদের নেই। এবং একইভাবে সামাজিক জীবনে যৌন ভালোবাসার একটা স্বার্থপর দিকও আছে। প্রেমিকরা গোষ্ঠীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তাদের দাবি হল একা থাকার দাবি, নিজেদের নিয়ে থাকার দাবি, পরস্পরকে ভোগ করার দাবি। যৌন ভালোবাসা এইভাবে সমাজে এক দ্রাবক শক্তি (dissolving power) হিসাবে দেখা দেয়।

সামাজিক অযৌন কোষ কঠোরভাবে জীবদেহের পরিকল্পনার অধীন। গোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য সে অক্লান্তভাবে কাজ করে যায়, নিঃসৃত হয়, বা অনুরণিত হয়, বা মৃত্যু বরণ করে। এর পাশে গোষ্ঠীর মধ্যে যৌন কোষকে মনে হয় যেন অনুরাগী, কঠোর পরিশ্রমী, চিরকুমারের পাশে স্বার্থপর ভোগসুখবাদী। যৌন কোষ তার সমস্ত সত্তা দিয়ে এমন একটা জিনিসে সাড়া দেয় যা ব্যক্তিকে যে তৃপ্তিটুকু দেয় কেবলমাত্র

সেইটুকু দিয়েই প্রলুব্ধ করে। অপর জনকে গণ্য করার দিক থেকেও ভালোবাসাকে প্রণয়পাত্রের উপর প্রক্ষেপিত এক দৈত্যাকার স্বার্থপরতা বলেই মনে হয়। কিন্তু এইটাই সমগ্র সত্য নয়। এই একই স্বার্থপর কোষ এমন একটা জিনিসের জন্ম দেয় যেটা পূর্বে অজানা ছিল—সেটা হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। যৌনতার আবিষ্কার দ্বারা জৈব বিপাক প্রক্রিয়ার অনড় পরিকল্পনা থেকে সাময়িকভাবে মুক্ত হয়ে কোষটি এই ক্রিয়ার দ্বারা আচরণের দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়। এ সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রীকরণের সূচনা মানুষের ক্ষেত্রে যা সচেতনতায় পর্যবসিত হয়। যৌন-আচরণ জীবনে একটা নতুন ছক নিয়ে আসে। এক দিকে যৌন কোষগুলি 'সমাজের' চাহিদাকে অবহেলা করার ফলে তাদের আমিত্বকে সমৃদ্ধ ও জটিল করে তোলে; আরও গুরুত্বপূর্ণ দিকটা হল এই যে, এই যৌন অংশীদার নতুন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যগুলির জন্ম হওয়ার মধ্য দিয়ে কালক্রমে এই দুই ব্যক্তিত্বেরই সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটার সঙ্গে জড়িত। নতুন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে উঠবে মাতা পিতা দুজনেরই জনিগুলির নির্বাচিত অংশ থেকে, এবং সেইকারণে সেগুলি দুজনের থেকেই ভিন্ন হবে। আত্মত্যাগী কোষগুলি তাদের আত্মত্যাগের পুরস্কার হিসাবে শাশ্বত অমরত্বের সম্ভাবনার সুযোগ ভোগ করে। যৌনকোষ নামহীন এক যুগের বিনিময়ে তার ক্ষণস্থায়ী গৌরবোজ্জ্বল জীবনটুকু লাভ করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই মৃত্যু ও জীবনের দ্বারাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুপ্ত সম্ভাবনায় সে জন্ম দেয়।

এটা অবশ্য ব্যাপারটিকে বড় বেশি নরত্বারোপমূলকভাবে (anthropomorphic) দেখা। অযৌনতা যতক্ষণ বজায় থাকে ততক্ষণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে আদৌ কিছু বলাই সম্ভব নয়। গাছের পাতাগুলি কি স্বতন্ত্র? না, তারা একই গাছের অংশ। একই ভাবে উচ্চপ্রাণীর দেহকোষগুলি প্রত্যেকে পরস্পরের অংশ, যদিও স্থানিক দিক থেকে তারা পৃথক। পরস্পরের থেকে বিভাজনের ফলেই সেগুলি সৃষ্ট। সেই কারণে আত্মত্যাগ বা অমরত্ব কোনটারই কথা ওঠে না। অযৌন কোষের ত্যাগ করার মত কোন 'আত্মনই' নেই, আর অমরত্বও অর্থহীন, ('Self') সমস্ত জড়পদার্থই অমর, এই অর্থে ছাড়া। ব্যক্তিগত অমরত্ব ছাড়া অমরত্ব অর্থহীন, আর অযৌন কোষের কোনও (personal) ব্যক্তিত্ব নেই।

অমরত্ব উন্নত ধরনের মরণশীলতা নয়, অনন্তকাল পর্যন্ত বিস্তৃত জীবন নয়, সীমাহীন ব্যক্তিগত টিঁকে থাকা নয়। এ এক আদিম অবস্থা যা থেকে মরণশীলতা ও ব্যক্তিত্ব দুয়েরই উদ্ভব হয়েছিল। বলতে গেলে স্বতন্ত্র প্রাণীর জীবন ছাড়া জীবনের ধারণা আমাদের কাছে অর্থহীন। আমরা বলতে বাধ্য যে মৃত্যু থেকে জীবনের উদ্ভব; দুটিই পৃথকীভবনের একই চলনের বিভিন্ন দিক। অমরত্বের জন্য যাবতীয়

আকাঙ্ক্ষা খুবই মানবসুলভ এবং খুবই বোধগম্য; তা সত্ত্বেও তা হল প্রত্যাবৃত্তির (regression) জন্য এক আকাঙ্ক্ষা, আদিম অচেতন সত্তায় ফিরে যাওয়ার জন্য এক আকাঙ্ক্ষা, আমাদের কাঁধ থেকে চেতনা, ভালোবাসা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুরু দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার এক আকাঙ্ক্ষা। পরিচিত পরিবেশের মধ্যে সঞ্চরণশীল ব্যক্তিত্বের নিরন্তর টি'কে থাকা হিসাবে অমরত্বের যাবতীয় ধারণা মনের কাছে এক অদ্ভুৎ অবাস্তবতার বোধ বলে প্রতিভাত হয়। অসম্ভব হলেও অমরত্বের একমাত্র যে ধারণাটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় তা হল বৌদ্ধ ও হিন্দুদের অমরত্ব সম্বন্ধে ধারণা। অমরত্বকে তাঁরা পরমব্রহ্মের মধ্যে জীবাত্মার মিলন হিসাবে, সত্তাহীন আদিম নিদ্রা, নির্বাণ হিসাবে দেখেন। আর এটাই অমরত্ব, আদিম সত্তার অন্ধ অচেতন প্রত্যাবৃত্তিতে ফিরে যাওয়া, আরও পিছিয়ে গিয়ে অমর জড় পদার্থের কালহীনতায় ফিরে যাওয়া। কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে জীবন যেহেতু বিকাশের পূর্বতন স্তরে অর্জিত কোনও সমাধানে সর্বদা ফিরে যেতেই চায়, সেই কারণে অমরত্বের এই ধারণার আবেদন আছে মানুষের কাছে, বিশেষ করে হীনাবস্থা বা হতাশার অধ্যায়ে।

এই অমরত্ব নিয়ে ভাবনা মৃত্যুভয় ততটা নয় যতটা তা পরাজিত মনোভাব নিয়ে মৃত্যুর কাছে এক বিশেষ ধরনের আত্মসমর্পণ, পরবর্তীকালের মিশরীয় ও প্রাচ্যদেশীয় রহস্যপূর্ণ পূজা-আচারের (mystery cults) মধ্যে যেমন তা দেখা যায়। অমরত্ব সম্বন্ধে হাল্কা বিশ্বাস বা **পুরাপুরি অবিশ্বাস** মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ দূরে থাক, স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু সম্বন্ধে এক প্রচণ্ড বীতরাগের জন্ম দেয়। সমস্ত পরাজিত, হতাশাগ্রস্ত ও আতঙ্কিত মানুষ সমস্ত দাস ও বিত্তহীন শ্রেণী অন্য এক অমর কালসীমাহীন জীবনের দিকে সান্ত্বনার জন্য তাকিয়ে থাকে। জৈব অমরত্ব, ব্যক্তিত্ব ও মৃত্যু এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তা এমন দুটি বিপরীত জিনিসের জন্ম দেয়, যারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। আমাদের জীবন যতই পূর্ণ হয়, ও প্রাচুর্যে ভরা হয় ততই আমরা মৃত্যুর দ্বারা বিকর্ষিত হই; আর এই বিকর্ষণ এত দুঃখদায়ক, তবু আনন্দদায়ক। কারণ, তা আমাদের বর্তমানে মূল্যবান এই জীবনকে সমৃদ্ধি ও জটিলতায় পূর্ণ করে তুলতে, বড় মাপের কাল ও কর্মকে আঁকড়িয়ে ধরতে, মৃত্যুর আগে অনেক কিছু আয়ত্ত করতে, জয় করতে, ভালোবাসতে ও দুঃখ পেতে বাধ্য করে। মৃত্যু, যা হল জীবনের প্রতিষেধ [negation], এইভাবে তার জন্ম দেয়। যত বসন্ত, যত যৌবন, যত স্বাস্থ্য, তার যে এত বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধ সুস্বাদ তা এই কারণেই যে তারা চলে যায়:

And at my back I always hear,

Time's winged chariot hastening near.
পশ্চাৎ হতে মোর সর্বদাই শ্রবণে আসি পশে
কালের পক্ষধারী রথ দ্রুতবেগে আসিছে নিকট।

* * * *

দেহকোষের [somatic cells] সরল বিপাকমূলক সমাজ থেকে মানব সমাজকে পৃথক করে দেখার কারণ এই যে সেটি বিপাকমূলকের থেকেও বেশি কিছু, সেটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলকও বটে। ব্যক্তি আপাতঃদৃষ্টিতে সমাজের বিরোধী। তা সত্ত্বেও, সমাজের অন্তর্নিহিত যে চালিকাশক্তি তা, ব্যক্তিই তাকে দান করে, এবং সমাজ তার অভ্যন্তরীণ বিকাশের দ্বারা নিজেই তার এককগুলির স্বতন্ত্রীভবন [individuation] ঘটায়।

কীটপতঙ্গের সমাজের সঙ্গে এখানে মানবসমাজের বৈপরীত্য। প্রথমটিতে আপেক্ষিক অমরত্বের দিকে একটা প্রত্যাবৃত্তি ঘটেছে। কর্মীদের সকলকে যৌন-শক্তিহীন করা হয়েছে। তাদের স্বতন্ত্র সত্তা তারা হারিয়েছে এবং প্রায় দেহকোষের পর্যায়ে তাদের প্রত্যাবৃত্তি ঘটেছে। মৌচাক বা পিঁপড়েদের বাসায় সদস্যদের মধ্যে যে অদ্ভুৎ সমঝোতা দেখা যায় তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকে না, যখন আমরা সেগুলিকে কার্যতঃ একই দেহের বিভিন্ন অংশ হিসাবে, রাণীমক্ষিকা বা রাণী পিঁপড়ের সন্তানকোষ হিসাবে চিন্তা করি। কিন্তু এই একই প্রত্যাবৃত্তি ও স্বাতন্ত্র্যহীন হয়ে পড়াকে মানব সমাজের সঙ্গে তুলনা করলে প্রবাহরুদ্ধতার জন্ম দেয়। যাবতীয় পরিবর্তন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শক্তি অল্প কয়েকটি যৌনশক্তিসম্পন্ন সদস্যের জনিগত পরিবর্তনের মধ্যে ঘনীভূত হয়। সেই কারণে এ এক মন্থর পরিবর্তন। কীটপতঙ্গের সমাজের অস্তিত্ব আর প্রায় নেই। পরিবর্তনশীল অথচ জীবন্ত কালের হাত থেকে রেহাই পেয়ে হীরকের নিস্তেজ অমরত্বের কিছুটা তারা অর্জন করেছে।

মানবসমাজে অবশ্য ব্যক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির মধ্যকার, ভালোবাসা ও বিপাক প্রক্রিয়ার মধ্যকার অবিরাম লড়াই অবিরাম সামাজিক অগ্রগতির উৎস। যৌনতা যেহেতু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম দিয়েছিল, সেইজন্য তা চেতনার উদ্ভবকেও সাহায্য করেছিল। বিপাক প্রক্রিয়া (বা উৎপাদিকা শক্তিগুলি) যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়, এবং এই পরিবর্তন উৎপাদন-সম্পর্কগুলির উপর এক চাপ (tension) সৃষ্টি করে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব সমাজের সর্বত্র প্রসারিত হয়ে, মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রে, তার চেতনার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট রূপে অনুভূত হয়; কারণ চেতনা মূলতঃ আবেগোদ্দীপক মূলক (affective)। মনে হয় সমাজের বাহ্যিক শক্তিগুলি যেন মানুষের আবেগগত জীবনকে উপবাসী রাখছে বা রুদ্ধগতি করছে, জীবন যেন আকর্ষণহীন, নিষ্ঠুর হয়ে

উঠছে। কারণ, উৎপাদন-সম্পর্কগুলি হল সামাজিক সম্পর্ক এবং তার মধ্যে সচেতন কোমলতা [tenderness] সৃষ্ট হয়।

যৌন ভালোবাসা নিজেই অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির দ্বারা অবিরত সমৃদ্ধ ও পরিবর্তিত হয়, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি ভালোবাসা থেকে নতুন উষ্ণতা ও জটিলতা লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক স্তরের অর্থনৈতিক বিকাশের আনুপাতিক এক সমৃদ্ধতর, সূক্ষ্মতর, আরও বেশি সংবেদনশীল আচরণ-ছক যৌন ভালোবাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে থাকে অতিরাগযুক্ত ভালোবাসা, সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিতে থাকে রোমাণ্টিক বা শিভাল্‌রিযুক্ত ভালোবাসা, আর দাস-মালিক গ্রীক সংস্কৃতিতে থাকে প্লাতনীয় ভালোবাসা।

আমাদের প্রজন্মে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সঙ্গে যৌন ভালোবাসার সংযোগটা বিধিবহির্ভূত (arbitrary) বলে মনে হয়। তার কারণ এই নয় যে ভালোবাসা সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা খুবই সমৃদ্ধ ; তার কারণ এই যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের ধারণাটা খুবই বুর্জোয়াসুলভ। বুর্জোয়া সভ্যতা সামাজিক সম্পর্ক গুলিকে নগদমূল্যে পর্যবসিত করেছে। সেগুলি স্নেহশূন্য হয়ে পড়েছে। মনো-বিদ্যা-বিদদের কাছে মনে হয় গোটা জগৎটাই যেন ভালোবাসার অভাবে ভুগছে, এবং এই অভাব পরিপূরক ও ব্যাধিবিদ্যার দিক থেকে মানসিক রোগ, ঘৃণা, বিকৃতি ও অস্বস্তি হিসাবে দেখা দেয়।

এমন কি আজও, অল্প যে কয়েকটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক তাদের প্রাক্-বুর্জোয়ারূপে এখনও টি'কে আছে সেগুলির মধ্যে সম্পর্কের সারবস্তু হিসাবে কোমল অনুভূতিকেই আমরা দেখ.তে পাই। পণ্যের উপরে যে অন্ধভক্তি (commodity-fetishism) মানু:ষ মানুষে সম্পর্কের মধ্যে কেবল মাত্র সামগ্রীতে সামগ্রীতে সম্পর্ককেই দেখে থাকে তা এখনও এটিকে শুকিয়ে তোলেনি। মায়ের সঙ্গে ভ্রূণের, শিশুর সঙ্গে মাতাপিতার, এবং তার বিপরীতমুখী (vice ver*a) অর্থনৈতিক সম্পর্কটি এখনও তার আদিম রূপ বজায় রাখার মধ্য দিয়েই এটা স্পষ্ট দেখা যায়। অস্পষ্টতর চিহ্ন আমরা দেখতে পাই গুরু ও শিষ্য, ধাত্রী ও শিশু, গৃহভৃত্য ও প্রভু বা প্রভু-পত্নীর মধ্যে এবং প্রভু ও প্রজার মধ্যে অল্প যে কয়েকটি সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত টি'কে আছে তার মধ্যে।

এইগুলির পরিবর্তে আমাদের সংস্কৃতি যে বিশিষ্ট বুর্জোয়া সম্পর্কগুলিকে তুলে ধরেছে তার মধ্যে—পুঁজিপতি ও শ্রমিক, হোটেলভৃত্য ও খরিদ্দার ; ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ও শেয়ারমালিক ; ডাক মারফৎ শিক্ষার লেখক ও অতিপরিশ্রমী পরীক্ষার্থীর মধ্যে এই কোমলানুভূতি আমরা কোথায় পাব ? অন্য সমস্ত সম্পর্ক থেকে

বিতাড়িত এই কোমলতা আজ 'একই রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী' হওয়ার একমাত্র সামাজিক সম্পর্কের বন্ধন-শক্তি হিসাবে এক অস্পষ্ট রহস্যময়ভাবে সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হয়। এটা একটা যথার্থ সামাজিক সম্পর্ক, এক দমনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান ক'রে একটি শাসকশ্রেণী দ্বারা শোষিত হওয়ার সম্পর্ক। কিন্তু সেটা এমন কোন সামাজিক সম্পর্কের নাম নয় যা কোমলতার জন্ম দিতে পারে। এই নগ্ন সম্পর্ককে সেই কারণে একটা কাল্পনিক নাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়—একটা কাল্পনিক 'জাতিগোষ্ঠী' ('race'), এক আশ্চর্য সুখী পরিবার, বা এক প্রকৃতক্ষমতাহীন রাজা বা নেতা, যার প্রজ্ঞা, শাসন দক্ষতা ও চরিত্রকে অর্ধ-স্বর্গীয় বলে গণ্য করা হয়, এমন কি সংবিধানের দিক থেকে তার অবস্থান রবার স্ট্যাম্পের মত হলেও তাই করা হয়। এইভাবে, এক শক্তিশালী 'অংশগ্রহণকারী অতিন্দ্রীয় ক্ষমতাকে' ('participation mystique') সুনিশ্চিত করা হয়। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ থেকে দেখা গেছে যে শোষণ যত বেশি হিংস্র হয়, দেশপ্রেম তত বেশি উদগ্র ও পুরাণধর্মী হয়; সম্পর্কগুলি যত হৃদয়হীন ও আবেগহীন হয়, ভণ্ড অনুভূতিকে তত বেশি জাহির করে দেখাতে হয়। উন্নত বুর্জোয়া সম্পর্কগুলির এটা বৈশিষ্ট্য। নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা থেকে দেখা গেছে কোনও গোষ্ঠীর মধ্যকার আদিম সম্পর্কগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক উৎপাদন সামাজিক স্নেহপ্রীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে, প্রধান ও প্রজাদের মধ্যে অথবা একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে, উৎপাদন-সম্পর্ক উপহার আদানপ্রদান হিসাবে, আক্ষরিক অর্থে স্নেহ-উপহার হিসাবে দেখা যায়। উপহারের সঙ্গে যা জড়িত থাকে তা হল ভালোবাসা, দান করা। সেটাই হল এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক জিনিস। অনেক আদানপ্রদান প্রথম যুগের বুর্জোয়া পর্যবেক্ষকদের কাছে বুর্জোয়া বিনিময়-ক্রিয়া বলে মনে হয়েছিল, অর্থাৎ যতটা সম্ভব কম দিয়ে যতটা সম্ভব বেশি পাওয়া যায় বলে মনে হয়েছিল। আরও গভীরভাবে অনুসন্ধানকারী পর্যবেক্ষকদের কাছে সেগুলি তার বিপরীত বলেই আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রত্যেক পক্ষই প্রচুর উপহার দিয়ে অপর পক্ষকে লজ্জায় ফেলতে চাইছেন বলে আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে যে মেলানেশীয়দের গর্ব হল মামাকে বা প্রধানকে কে কত বেশি মিষ্টি আলু দান করেছে। উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ান আদিবাসীরা নিজেকে রিক্ত ক'রে নিজের সামাজিক মূল্যের প্রমাণ দেয় পটল্যাচ (potlatch) ভোজের সময়। অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কোমলানুভূতির সম্পর্ক বলে এবং উদারতা ও পরার্থপ্রেমের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে দেখার ধারণাটি বর্বর, এবং এমন কি সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের মধ্যেও তা দেখা যায়। সেগুলিকে আদর্শ বলে গণ্য অবশ্যই আমরা করব না, আবার এই কল্পনাও করব না যে সরল বন্য মানুষের কোমলতা, আর

আমরা যে উন্নত, সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত আবেগ অনুভব করি তা একই জিনিস। কিন্তু তথ্যচেপে রেখে বা বিকৃত করে আফ্রিকা, আমেরিকা ও ওসিয়ানিয়ার জাতিগুলির মধ্যকার কৃষি, শিকার ও ভূমির খাজনা-বিষয়ক বিভিন্ন আদিম অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলির বুর্জোয়াসুলভ মানববিদ্বেষী ব্যাখ্যা দেওয়াটাও সমান ভুল।

সমস্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বুর্জোয়া সম্পর্কের মধ্যকার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, কোমলতাকে সেখান থেকে পুরাপুরি বিতাড়িত করা হয়েছে; কারণ, কোমলতা থাকতে পারে কেবল মানুষে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে, আর পুঁজিবাদের মধ্যে যাবতীয় সম্পর্কই মানুষ ও পণ্যের মধ্যকার সম্পর্ক হিসাবে দেখা দেয়।

গিল্ড মালিকের সঙ্গে তার ঠিকা কারিগরের (journeyman), দাস মালিকের সঙ্গে তার ক্ষেতের ক্রীতদাসের, ভূস্বামীর সঙ্গে তার ভূমিদাসের, রাজার সঙ্গে তার প্রজার সম্পর্ক ছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যদিও সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল না, ছিল প্রভুত্ব ও বশ্যতার, শোষক ও শোষিতের, তবু তা ছিল একটা মানব সম্পর্ক। মানুষের সঙ্গে তার কুকুরের যে সম্পর্ক সেই রকম অপ্রিয় হতে পারে সেটা, তবু সেটা অন্ততঃ কোমলতাপূর্ণ ছিল। শেয়ার মালিকদের গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন (limited liability) কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্পর্কের মধ্যে কি সেটুকু বিবেচনাও প্রবেশ করতে পারে? বা ভারতীয় কুলি আর ইংরেজ চা-পায়ীদের মধ্যে? বা বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র আর সর্বহারার মধ্যে?

বুর্জোয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মধ্যে এক মাত্র স্বীকৃত আইন-সম্মত সামাজিক সম্পর্ক হল চুক্তি, যা নগদের হিসাবে মিটিয়ে দেওয়ার যোগ্য। কোন মানুষের উপর টাকায় দাম চুকান ছাড়া আর কিছুই চাপিয়ে দেওয়া যায় না, এমন কি উপযুক্ত পরিমাণ নগদ ক্ষতিপূরণের সাহায্যে বিবাহের হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। টাকায় দাম চুকান ছাড়া মানুষ পুরাপুরি স্বাধীন। বুর্জোয়া সম্পর্কের এইটাই প্রকাশ্য চরিত্র। গোপনে সেটা অবশ্য ভিন্ন; কারণ, সমাজ একমাত্র মানুষে মানুষে সম্পর্কই হতে পারে, মানুষ আর সামগ্রীর মধ্যকার নয়। এমন কি মানুষ আর নগদ টাকার মধ্যকার সম্পর্কও নয়। বুর্জোয়া সমাজ মনে করে যে এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই সে চলছে। কিন্তু, মার্ক্স যেমন দেখিয়েছেন, বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে এখনও তা মানুষে মানুষে সম্পর্ক, শোষক ও শোষিতের মধ্যকার সম্পর্ক। এটা হল এক বিশেষ ধরনের শোষণের বাহন। বুর্জোয়া স্বপ্ন দেখে যে, সামন্ততান্ত্রিক দাস-মালিক বা আদিম সমাজের এই মানুষে মানুষে সম্পর্কের জায়গায় সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত করে মানুষ পুরাপুরি স্বাধীন হয়ে ওঠে। কিন্তু সেটা বিভ্রম। যেহেতু একমাত্র সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েই মানুষ স্বাধীন হয়ে ওঠে, সেইজন্য তার অর্থ

হল প্রকৃত ঘটনাকে বুর্জোয়া দেখতে চায় না। সচেতন পরিকল্পিত সামাজিক সম্পর্কের জায়গায় সে অচেতন অপরিকল্পিত সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, যা সমস্ত অচেতন শক্তির মতই অন্ধ ও ধ্বংসাত্মকভাবে কাজ করে।

যাই ঘটুক না কেন, বুর্জোয়া এই বিশ্বাস করতে বদ্ধপরিকর যে বাজারই হল মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যে একমাত্র সামাজিক সম্পর্ক। তার অর্থ হল, ভালোবাসা যে সামাজিক সম্পর্কের একটা অচ্ছেদ্য অংশ সেটা তাকে অবিশ্বাস করতেই হবে। তার সামাজিক সচেতনতা থেকে এই কোমলতাটিকে সে অবদমিত করল। চূড়ান্ত রূপে এটা হয়ে উঠল মানুষের ভালোবাসার ক্ষমতার প্রতি মানুষের বিদ্রোহ, এটা হয়ে উঠল স্নায়বিক রোগ, ঘৃণা, অলীককল্পনার রূপে ভালোবাসার আবির্ভাব, যা মনঃসমীক্ষকরা বুর্জোয়া মানুষের মধ্যে সর্বত্র আবিষ্কার করছেন। এক অর্থে বিবাহিত নারীর সম্পত্তি বিষয়ক আইনটি (Married Women's Property Act) নারীদের স্বাধীনতার সনদ। আর এক অর্থে সেটা কেবল বুর্জোয়া দমনের সনদ, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি আর কোমলতাপূর্ণ নয়, সেগুলি কেবল যে নগদভিত্তিক মাত্র তারই স্বীকৃতি।

বুর্জোয়া সম্পর্কগুলি তাদের প্রথম দিকের স্তরগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তীব্র করে তুলে যৌন ভালোবাসাকে এক বিশেষ উন্নীতভাব দান করে। সেগুলি নগদের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে দানা বাঁধার (crystallize) আগে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি অপ্রচলিত সামাজিক বন্ধনগুলি থেকে মানুষের স্বাধীনতার চাহিদাকে প্রকাশ করে বলে মনে হয়; এবং স্বকীয়তার জন্য এই চাহিদা তখন একটা প্রগতিশীল শক্তিই থাকে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে যৌন ভালোবাসা এখন স্বকীয়তার (individuality) সর্বোত্তম প্রকাশ হিসাবে একটা বিশেষ মূল্য লাভ করে। বুর্জোয়া সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্জিত সম্পদের উদ্ভব আমরা দেখতে পাই অতিরাগযুক্ত (passionate) ভালোবাসার মধ্যে, যাকে রোমান্টিক ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুটি রূপেই চিন্তা করা হয়। অপর দিকে গ্রীক বা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি রোমান্টিক ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভালোবাসাকে পরস্পর অসম্পৃক্ত (exclusive) বিপরীত ছাড়া অন্য কোনও ভাবে চিন্তা করতে পারত না। অনুভূতি ও সচেতন জীবনকে অতিরাগযুক্ত ভালোবাসা এক নতুন বাড়তি-সুর (overtones) দান করে। তাছাড়া, স্বকীয়তার জন্য এই চাহিদা যতদিন বিপ্লবী ও সৃজনশীল ছিল ততদিন তা ভালোবাসার অন্যান্য রূপগুলিকেও সমৃদ্ধ করেছিল। এটা মানুষকে পরস্পরের প্রতি এক নতুন কোমলানুভূতি দিয়েছিল, যেটাকে পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতি, পরস্পরের ব্যক্তিগত যোগ্যতার প্রতি এক কোমলানুভূতি হিসাবে চিন্তা করা হয়েছিল। এইভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতি তার যৌবনকালে

অতিরাগযুক্ত যৌন ভালোবাসা এবং সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের 'স্বাধীনতার'—ব্যক্তিগত রূপরেখার—প্রতি এক কোমলানুভূতির জন্ম দিয়েছিল। এই দুটিই যথার্থ সমৃদ্ধি; সভ্যতা এখন আর এদের হারাতে পারে না।

যাই হোক, ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধা যে সাধারণের দুঃখ-কষ্ট, স্বাধীনতা যে ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজবৈরীভাবে সন্ধান করা হচ্ছে, বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব কালক্রমে নিশ্চিতভাবে তার স্বরূপ প্রকাশ করল। অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, এবং এইভাবেই যে তার কাজ করা উচিত—বুর্জোয়াদের এই দাবির অর্থ দাঁড়াল কেবল এই যে, এই সম্পর্কগুলি পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কের ছদ্মবেশ ধরল। এই বিকাশমান সম্পর্ক যখন শিল্প-পুঁজিবাদ (industrial capitalism) ও আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের জন্ম দিল তখন যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক থেকে তা কোমলানুভূতিকে শুষে নিল। শেষ পর্যন্ত এটা যৌন ভালোবাসাকেও আঘাত করল, এবং কোমল সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকে যৌন ভালোবাসা যেসব সমৃদ্ধি আহরণ করেছিল, সেগুলিকেও তা থেকে কেড়ে নিতে সুরু করল। আজ অতিরাগযুক্ত বুর্জোয়া ভালোবাসা হয়ে পড়েছে একটা ফুলের মত, যার পাপড়িগুলি এক এক করে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক থেকে লব্ধ আচরণের ছক হল এই পাপড়িগুলি। যৌন ভালোবাসাকে এগুলি সংক্রমিত করা হয়েছিল এবং তার দ্বারা সেগুলি রূপান্তরিত হয়েছিল ও প্রাণের উষ্ণতা পেয়েছিল, ঠিক যেমনভাবে ফুলের রঙীন পাপড়িগুলি গুণ-পরিবর্তিত (converted) পত্র দিয়ে গঠিত হয়। বুর্জোয়া বিবাহ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি—স্বতন্ত্র পরিবার, ব্যক্তিগত উপার্জন—যৌন ভালোবাসার উষ্ণতা লাভ করে একটা আভিজাত্যের কিছু হয়ে ওঠে। একথা ঠিক যে, বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি এইভাবে রূপান্তরিত হলেও তাদের কুৎসিত অ-কোমল চরিত্রের কিছু কিছু অংশ বজায় রেখেছিল। পুরুষ প্রায়ই ভালোবাসাকে বুর্জোয়া সম্পত্তি-সম্পর্কের অনুরূপ একটা কিছু ব'লে, মানুষ ও সামগ্রীর মধ্যকার সম্পর্ক ব'লে, এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নয় ব'লে মনে করে। স্ত্রী হল তার সারাজীবনের সম্পত্তি। তার সম্পত্তি-সংগ্রহকারী প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্য স্ত্রীকে সুন্দরী হতে হবে; পুরুষের সম্পত্তি পুরুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না বলে স্ত্রীকে হতে হবে বিশ্বস্ত; কিন্তু পুরুষ মালিক, সে অবিশ্বস্ত হতে পারে; কারণ, নিজের বর্তমান সম্পত্তিকে ব্যাহত না করে সে অন্য সম্পত্তি অর্জন করতে পারে। যে সন্তানদের সে খাইয়েছিল, পরিয়েছিল এবং সুতরাং তাদের মজুরি চুকিয়ে দিয়েছিল, তাদের উপরেও অনুরূপ এক সম্পর্ক আরোপিত হয়েছিল। রোমান দাসমালিক সভ্যতায় সন্তানের আইনগত অবস্থান

পিতার সঙ্গে দাসের সম্পর্ক বলেই মনে হয়। আর তাছাড়া, এই দাসের আবার দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের (manumission) যোগ্যতাও থাকে না। কিন্তু দাসত্ব মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা সম্পর্ক। বুর্জোয়া সম্পর্কের এই মালিকানাসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি বুর্জোয়া ভালোবাসাকে সর্বদাই এক স্বার্থপর ঈর্ষাপরায়ণ অনুস্বর (undertone) দিয়েছিল, নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা যেটাকে সহজ-প্রবৃত্তিগত ও স্বাভাবিক বলে গণ্য করে। বুর্জোয়াতন্ত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভাবন করেনি। এটা মানুষের প্রকৃতির মধ্যকার এক সুপ্ত সম্ভাবনা, না হলে বুর্জোয়াতন্ত্র কিছুতেই এর আবির্ভাব ঘটাতে পারত না। কিন্তু বুর্জোয়াতন্ত্র হল তার পুষ্পোদ্যান, তার উন্নীত রূপ এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির মূল চালিকা শক্তি; আর তার সৌরভও সেই কারণে গোটা বুর্জোয়া জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে।

বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি নিঃশেষিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া অতিরাগযুক্ত ভালেবাসাও অর্থনৈতিক ঝড় ঝাপটার মুখে পড়ে শুকিয়ে যেতে সুরু করে। এক দিকে বিবাহ ক্রমেই বেশি 'ব্যয়সাপেক্ষ' হয়ে পড়ছে। বেশি বয়স পর্যন্ত সেটাকে মুলতুবি রাখতেই হয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতির পক্ষে এবং বিশেষ করে নারীর পক্ষে বিবাহ ছিল ভালোবাসার আচরণের সর্বাধিক মূল্যবান এক ছক। সেই (love behaviour) বিবাহ আজকের দিনে তার এক বিলম্বিত ও বিশেষীকৃত রূপ নিয়েছে। সন্তানও ক্রমেই বেশি বেশি ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠছে এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোমল সামাজিক সম্পর্কগুলিও আদর্শমান বিবাহ ছকের আরও দুর্লভ অংশ হয়ে উঠছে। এই সমস্ত এবং অন্যান্য কারণের ফলে সেই বিস্তারিত ও জটিল সৃষ্টি, যাকে বলে অতিরাগযুক্ত বুর্জোয়া ভালোবাসা, তার দলমণ্ডলটি (corolla) আরও বেশি বেশি করে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং আদিম কালের ক্ষণিক (fugitive) যৌন সংগমের রূপে ফিরে আসছে। বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি নিঃশেষিত হয়ে পড়ার এই অপরিহার্য পরিণতিকে 'পাপ' ব'লে 'যৌবনের চাপল্য' ব'লে, 'বিবাহব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে' বলে, 'জন্মনিয়ন্ত্রণের ফল' ইত্যাদি বলে অপরাধী সাব্যস্ত করা হচ্ছে। এই সমস্ত ধিক্কারই মূল কথাটিকে কিন্তু স্পর্শ করে না। অতিরাগযুক্ত বুর্জোয়া ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে তার নিজের মৃত্যুর পথ প্রস্তুত করেছে। একদিন যে কারণগুলি তার পুষ্পোদ্গম ঘটিয়েছিল কালক্রমে সেই কারণগুলিই তার এই ঝরে যাওয়াকে ডেকে আনছে।

ভালোবাসার উপর বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক যেসব অন্যায় ও প্রবঞ্চনা করেছে ভালোবাসা তার এক ভয়াবহ অভিযোগলিপি তৈরি করতে পারে। জগতের দুঃখকষ্ট

অর্থনৈতিক, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেটা নগদভিত্তিক। সেটা হ'ল এক বুর্জোয়া ভ্রান্তি। সেগুলি যেহেতু অর্থনৈতিক, ঠিক সেই কারণেই সামাজিক মানুষের কোমলতম ও সর্বাধিক মূল্যবান অনুভূতির সঙ্গে সেগুলি জড়িত। বুর্জোয়া সম্পর্ক তাকে যে সমস্ত সমৃদ্ধ আবেগগত সামর্থ্য (capabilities) থেকে এবং সামাজিক কোমলানুভূতি থেকে বঞ্চিত করেছে সেগুলির পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ বৃথাই ধর্ম, ঘৃণা, দেশপ্রেম, ফ্যাসিবাদ এবং চলচ্চিত্র ও উপন্যাসের ভাবালুতায় দিকে ছুটে যায়। যে ভালোবাসার অভিজ্ঞতা জীবনে সে লাভ করে না, সেই ভালোবাসাকেই এগুলি কল্পনায় চিত্রিত করে। এই কারণের জন্যই মানুষ স্নায়ুরোগগ্রস্ত, অসুখী, অসুস্থ, যুদ্ধ ও ইহুদীবিদ্বেষের গণঘৃণার শিকার হয়ে পড়ে, রাজকীয় জুবিলি বা শেষকৃত্যানুষ্ঠানের আজগুবি অথচ করুণ উৎসাহ এবং হিটলার ও আর্য পিতামহীদের প্রতি উন্মাদ অসম্ভব আনুগত্যের শিকার হয়ে পড়ে। এই কারণের জন্যই জীবন তার কাছে শূন্য, বিবর্ণ ও আকর্ষণহীন। পুরুষ তাকে আনন্দ দেয় না, নারীও না।

এইভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যাবতীয় কোমল সম্পর্কগুলিকে পণ্যের সঙ্গে সম্পর্কে রূপান্তরিত করে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক তার নিজেরই ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করে। সামন্ত প্রভুকে তার প্রজার সঙ্গে, প্রধানকে উপজাতির সঙ্গে, দাসপ্রভুকে গৃহদাসের সঙ্গে, পিতাকে সন্তানের সঙ্গে যে সূত্রগুলি বেঁধে রাখে সেগুলি কোমল বলেই দৃঢ়। কিন্তু যে সূত্রগুলি শেয়ার মালিককে মজুরি-ভিত্তিক কর্মচারীর সঙ্গে, পৌর-কর্মচারীকে করদাতার সঙ্গে, এবং সমস্ত ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক বাজারের সঙ্গে বেঁধে রাখে, সেগুলি যেহেতু নিছক নগদমূল্য মাত্র এবং কোমলসম্পর্করহিত, সেই কারণেই সেগুলি দৃঢ় নয়। উপজাতি প্রধানের আইনগুলি বোধগম্য। বরদেবতার হুকুমনামাও একটা ব্যক্তিগত ও স্নেহসিক্ত আদেশ। কিন্তু যোগান ও চাহিদার নিয়মগুলির (বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে এদেরই প্রতিকল্প) অন্ধ বাধ্যবাধকতা ছাড়া অন্য কোনও ক্ষমতা নেই। ভালোবাসা আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক আজ যেন দুই বিপরীত মেরুতে গিয়ে জমা হয়েছে। এক মেরুতে জমা হয়েছে মানুষের সহজপ্রবৃত্তির যাবতীয় অব্যবহৃত কোমলতা, আর অপর মেরুতে জমা হয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি, পণ্যের উপর অনাবৃত দমনমূলক অধিকারে যেগুলি পর্যবসিত। মেরুতে মেরুতে এই বিচ্ছেদ এক ভয়ঙ্কর চাপের উৎস, এবং তা বুর্জোয়া সমাজের এক বিপুল রূপান্তরের জন্ম দেবে। এক বিপ্লবী ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে সেগুলিকে পরস্পরের উপর ফিরে আসতেই হবে এবং নতুন এক সমন্বয়ে মিলিত হতেই হবে। তাকেই বলে সাম্যবাদ।

এইভাবে যে শক্তিগুলি সাম্যবাদের জন্ম দেয়, তাকে দুদিক থেকে দেখা যেতে পারে। পরিমাণগত দিক থেকে উৎপাদিকা শক্তিগুলি বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ককে

ছাড়িয়ে উঠেছে। ঐ শৃঙ্খলগুলিকে তারা বিদীর্ণ করবে। কিন্তু মানুষের চেতনার মধ্যে এই লড়াইকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সম্পর্কগুলির এই অকেজো হয়ে পড়াকে, বাস্তবের হাতে সেগুলির শুকিয়ে ওঠাকে ব্যক্তি মানুষ তার কাছে যা কিছু মূল্যবান তার মৃত্যু হিসাবে অনুভব করছে। এই লুপ্ত মূল্যগুলিকে চেতনার মধ্যে ফিরিয়ে আনার দাবি বর্তমানের প্রতি ঘৃণা ও নতুনের জন্য ভালোবাসা হিসাবে, বিপ্লবের গতিশীল শক্তি হিসাবে দেখা দেয়, যে মাটিতে আবেগকে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে, বিস্ফোরণের যাবতীয় তেজে সেই মাটি ফেটেই তা বেরিয়ে আসে। সমাজের গোটা কাঠামোটা তখন চুরমার হয়ে যায়। তাকেই বলে বিপ্লব।

সাত

ফ্রয়েড

বুর্জোয়া মনোবিদ্যা সম্পর্কে একটি আলোচনা

বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার একজন পথিকৃৎ হিসাবে ফ্রয়েডের নাম মানুষ নিশ্চয়ই করবে এবং তাঁকে সম্মান দেবে। কিন্তু সম্ভবতঃ কেপলারের মত তাঁকেও লোকে গণ্য করবে এমন একজন বিজ্ঞানী হিসাবে যিনি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতামূলক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন বটে, কিন্তু আদিম অর্ধ-যাদুধর্মী এক কাঠামোর মধ্যে ছাড়া অন্য কোনওভাবে সেই আবিষ্কারগুলির সংশ্লেষণ করতে পারেন নি। কেপলার তাঁর স্বর্গীয় সূর্য দেবতাকে নিয়ে পদার্থবিদ্যার ধর্মীয় যুগে বাস করতেন, ফ্রয়েড তাঁর যাবতীয় সততা সত্ত্বেও মনোবিদ্যার যাদুধর্মী যুগে বাস করেন।

"এখন আশা করা যেতে পারে যে, 'দুইটি স্বর্গীয় শক্তির' অন্যটি অর্থাৎ শাশ্বত কাম তার শক্তি প্রয়োগ করবে যাতে করে তারই সম পর্যায়ের মৃত্যুহীন প্রতিদ্বন্দ্বীর পাশাপাশি নিজেকেও সে টিকিয়ে রাখতে পারে।"

আমাদের সভ্যতা সম্পর্কে এই হল ফ্রয়েডের পূর্ব-অনুমান। বর্তমানের মনোবিদ্যাগত প্রবণতার এটা কিছু মন্দ প্রতীকীকরণ নয়, কিন্তু দেখা যাবে যে এটা পুরাণ-আশ্রয়ী প্রতীকীকরণ। তাঁর মনোবিদ্যার, অবশিষ্ট অংশটা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এর উপস্থাপনাটি সাধারণভাবে ধর্মাশ্রয়ী। তা হল নানা শক্তি ও মনুষ্য-ধর্মারোপনের (personification) এক মনোবিদ্যা। এক্ষেত্রে ফ্রয়েড কোন অনন্য-সাধারণ মনোবিজ্ঞানী নন। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের নিউটনের আবির্ভাব এখনও ঘটেনি। ফ্রয়েড অন্ততঃ খৃষ্টধর্ম বা ভাববাদী তত্ত্ববিদ্যার বস্তাপচা কৃত্রিমতাকে স্বীকার করতে রাজি হননি। বুর্জোয়া বিজ্ঞানের যে ফলপ্রসূ বস্তুগত ঐতিহ্যের উপর বুর্জোয়া বিজ্ঞান আজ তার নিজের কর্তৃত্বই আর বজায় রাখতে পারছে না ব'লে সেগুলিকে পরিত্যাগ করছে 'ফিউচার অফ অ্যান ইলিউশন ('Future of an Illusion') পুস্তকে ফ্রয়েড সেগুলিকে বজায় রেখেছেন। যে তত্ত্ববিদ্যামূলক মনোবিদ্যাকে, তার স্মৃতি, যুক্তি, চেষ্টাশক্তি (conation), প্রত্যক্ষ (perception) চিন্তা ও অনুভূতি সহ ফ্রয়েড চুরমার করতে সাহায্য করেছেন তা ছিল ফ্রয়েডবাদের থেকেও বেশি পুরাণধর্মী। এই মনোবিদ্যা, ফ্রয়েডবাদ যার শত্রু তা বিজ্ঞানের আরও পূর্ববর্তী যুগের অন্তর্গত। মননকে (mentation) তা বাগাড়ম্বরে নামিয়ে নিয়ে আসে, আর তারপর সেই বাগাড়ম্বরের সংগঠনকে বলা হয় চিন্তা। ফ্রয়েড অবশ্য সর্বদা প্রকৃত মনন নিয়েই আলোচনা করেছেন। কেবল

এই স্নায়ুবিদ্যাগত আচরণের অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে তিনি এমন এক ধরনের প্রকৃত সামগ্রীর পরিভাষায় প্রতীকায়িত করেছেন যা প্রাচীন কালের অলিম্পিয়ানিবাসী দেবতাদের মত জমকালো ও ব্যক্তিগত। মনের প্রহরী, অহং, অধিশাস্তা, অদস, ইদিপাস কমপ্লেক্স (Censor, the Ego, the Super-ego, the Id, the Oedipus complex) এবং বাধ (inhibition) হল নানা মনোদেবতা, গ্রীক অলিম্পাসে যেমন আবহাওয়ার দেবতারা বাস করতেন সেইরকম। শাশ্বত প্রাণশক্তি ও শাশ্বত মৃত্যু-শক্তির মধ্যে, প্রাণধর্মী ও মৃত্যুধর্মী সহজপ্রবৃত্তির মধ্যে, বাস্তবতা-সূত্র ও সুখ সূত্রের মধ্যকার সংগ্রামের ফ্রয়েড-বর্ণিত চিত্র হল চিন্তাশীল বর্বরজাতিদের সেই শাশ্বত দ্বৈতবাদ মাত্র যা খৃষ্টধর্ম একদিন জরথুস্ত্রবাদ থেকে গ্রহণ করেছিল এবং ফ্রয়েড এখন যা জোর করে মানব মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন। সেটা একটা প্রকৃত সংগ্রামকেই সূচিত করছে. কিন্তু একটা-পাশ্চাত্য বুর্জোয়া-পুরাণের পরিভাষায় তাকে সূচিত করা হচ্ছে।

জিউসের কাহিনীর প্রমাণ হিসাবে গ্রীকরা বজ্র ও বিদ্যুৎকে দেখাতে পারত। ওরমুজ্‌দ্‌ ও অহ্রিমানের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধের প্রমাণ হিসাবে যে অবিরাম যুদ্ধ জীবনকে দু' টুকরা করে ফেলছে সেই যুদ্ধের কথা পারসিকরা অবিশ্বাসীকে মনে করিয়ে দিতে পারে। ফ্রয়েডপন্থীরা তাদের জটিল পুরাণতত্ত্বের প্রমাণ হিসাবে স্বপ্ন, হিস্টিরিয়া, ও স্নায়ুরোগের লক্ষণ, আবেশিক বায়ু (obsessions), লিখতে বা বলতে গিয়ে ছোটখাটো ভুল করে ফেলা ইত্যাদি মানসগত (psychic) প্রক্রিয়াগুলিকে দেখিয়ে দেন। প্রতিটি প্রস্তরপতনকেই মাধ্যাকর্ষণের (gravity) রহস্যময় শক্তির প্রমাণ হিসাবে এবং তাপ ও শৈত্যের যাবতীয় প্রক্রিয়াকে এক রহস্যময় 'ক্যালরিকের' চলাচলের প্রমাণ হিসাবে আগেকার যুগের বিজ্ঞানীরা দাবি করতেন। অষ্টাদশ শতকের তাপ-বলবিদ্যার রহস্যময় 'ক্যালরিক' বা নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার 'মাধ্যাকর্ষণ' যে ভূমিকা পালন করেছিল ফ্রয়েডীয়তত্ত্বে 'কাম' (libido) সেই ভূমিকা পালন করে।

বেশ কিছু যুক্তি দিয়ে একথা বলা যায় যে, মনোবিদ্যা হল উপকথার ও আবেগগত প্রতীকায়নের একটা উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু সেই দাবি করার অর্থ হল একে বিজ্ঞানের এলাকা থেকে শিল্পের এলাকায় নিয়ে যাওয়া। বরং এই দাবি করাই ভালো যে পুরাণ-আশ্রয়ী মনোবিদ্যা কেবল উপন্যাসেই থাকুক, মনোবিদ্যা হয়ে উঠুক বিজ্ঞান। তা যদি হয়, তাহলে মনঃসমীক্ষকদের দায়িত্ব হল লঘু বাতাসে যে সব অভিজ্ঞতামূলক তথ্য তাঁরা আবিষ্কার করেছেন সেগুলি কোনও অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া, যিনি সেগুলিকে একটা কার্যকারণভিত্তিক পরিকল্পনায় গাঁথতে পারবেন,

কেপলারের পৃথক পৃথক ও বিধিবহির্ভূত গ্রহদের গতিসংক্রান্ত নিয়মগুলিকে নিউটন যেমন সম্পর্কিত করেছিলেন; আর না হয়ত, পুরাণধর্মী সামগ্রীর আশ্রয় না নিয়ে তাঁদের আবিষ্কারগুলির কার্যকারণতাকে তাঁদের সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হবে। ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা এই কাজটা করতে পারেননি। এইভাবে কার্যকারণ-ভিত্তিক ও বস্তুবাদী হওয়ার পরিবর্তে তাঁদের মনোবিদ্যা হয়ে পড়েছে ধর্মাশ্রয়ী ও ভাববাদী। তা সত্ত্বেও ফ্রয়েড একজন বস্তুবাদী এবং ধর্মের বিভ্রমাত্মক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সজাগ। কিন্তু তিনি একজন বুর্জোয়াও বটে। যে সব অনুক্ত অনুমান থেকে তিনি সুরু করেছেন; যে সব অনুমান সমস্ত বুর্জোয়া সংস্কৃতিতেই, ইউরেনাস যেমন আবিষ্কৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত আমাদের পরিচিত গ্রহগুলির কক্ষপথে একটা রহস্যজনক ব্যাঘাত হিসাবেই মাত্র মনে হত, সেইরকম একটা ব্যাঘাতজনক অথচ অদৃশ্য শক্তি হিসাবে দেখা দেয়, এই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী সেই সব অনুমানের মধ্য দিয়ে তাঁর মনোবিদ্যাকে প্রভাবিত করেছে। এই অনুক্ত অনুমানগুলি হল প্রথমতঃ এই যে, মানুষের চেতনা হল স্বজাতীয় (sui generis), মুখ্যতঃ এক সামাজিক সৃষ্টির পরিবর্তে বীজ থেকে ফুলের বিকাশের মত তা বিকশিত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির মধ্যে স্বাধীন ক্রিয়ার একটা উৎস আছে। তা হল 'স্বাধীন ইচ্ছা', 'ইচ্ছা' বা 'সহজপ্রবৃত্তি,' যেটা সামাজিক প্রভাবের দ্বারা যতখানি পরিমাণে তা বাধাপ্রাপ্ত নয় ততখানি পরিমাণেই মাত্র স্বাধীন। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে এই অনুমান দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং যেহেতু সেগুলি অনুক্ত সেই কারণেই তারা লুকানো চুম্বকের মত কাজ করে, ফ্রয়েডের গোটা মনোবিদ্যাকে বিকৃত করে তোলে এবং তাকে ইচ্ছা-পূরণের রঙে রঞ্জিত এক অবাস্তব ধরনের বিজ্ঞান করে তোলে।

ফ্রয়েডের এটা খুবই দুর্ভাগ্য যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মনোবিদ্যা বার বার বিভেদাত্মক মতবাদে (Schisms) বিভক্ত হয়ে গেছে। ইয়ুঙ ও অ্যাডলার হলেন সব থেকে বিশিষ্ট বিভেদপন্থী, (schismatics) কিন্তু প্রায় প্রতিটি মনঃসমীক্ষকই ভ্রূণাকারে গুরুবৈরী। এটা নিশ্চয়ই ফ্রয়েডের পক্ষে দুঃখজনক, যদিও সেটা তিনি শান্তভাবেই সহ্য করেছেন, তাঁর আবিষ্কারগুলি সমকালীন যে সব নীতিবাগীশতার যাবতীয় কায়েমী স্বার্থকে বিরোধিতা করেছিল তাদের অসংখ্য আঘাতকে তিনি সহ্য করেছেন। নতুন অভিজ্ঞতামূলক নীতির আবিষ্কারকদের শিষ্যরা কিন্তু তাঁদের গুরুকে বড় একটা গালি দেননি, যেমন ধরুন, ডারুইন নিউটন বা আইনস্টাইনের শিষ্যরা। গুরুর সূত্রায়ণগুলির সাধারণ চৌহদ্দির মধ্যে থেকে তাঁরা কাজ করেন, কেবল সেগুলির সমৃদ্ধি ঘটান বা তার রূপান্তর ঘটান; যে ভিত্তির উপর সেই কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে সেটাকে আক্রমণ করার কোনও তাগিদ সে ক্ষেত্রে কাজ করেনি।

এর জন্য পরোক্ষভাবে ফ্রয়েড নিজেই দায়ী। বিভেদ হল ধর্মের বিশিষ্ট লক্ষণ, এবং যে মানুষ ফ্রয়েডের মত ধর্মীয়ভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ব্যবহার করেন তাঁকে ধর্মগুরুর মতই ক্লেশ-সন্তাপ এবং সেই সঙ্গে তীব্র ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়। বিজ্ঞানকে ধর্মীয়ভাবে দেখা বলতে আমি 'সশ্রদ্ধ' দৃষ্টিতে দেখার কথা বলছি না। সমৃদ্ধ ও জটিলতাপূর্ণ বাস্তবকে বিজ্ঞানী অবশ্যই শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন ও নিজেকে অকিঞ্চিৎকর গণ্য করে থাকেন। বিজ্ঞানী যত বেশী বস্তুবাদী হন ও বাস্তবকে তাঁর এক স্বর্গীয় বন্ধুর নিছক প্রশাখা বা দ্যুতি বলে যত কম মনে করেন এই অনুভূতি ততই আরও বেশি তীব্র হয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ব্যাখ্যা করে এমন যে কোন প্রতীকীকরণের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াগুলির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা করা যায়,—এই বিশ্বাসকে আমি 'ধর্মীয়' দৃষ্টিভঙ্গি বলছি। এইভাবে উষ্ণতা প্রক্রিয়াকে 'ক্যালরিকের' সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। তথাপি, এই ধরনের কোনও রহস্যময় সামগ্রীর অস্তিত্ব নেই। একইভাবে ফ্রয়েড ধরে নিয়েছেন যে, প্রকৃত মানসগত প্রক্রিয়ার এক সুসংলগ্ন বিবৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন যে কোন উপকথাই একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প; প্রক্রিয়াটির অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলিকে কার্যকারণতার দিক থেকে সেটা প্রকাশ করুক বা নাই করুক। এই ধরনের ব্যাখ্যা অবশ্যই টেঁকসই নয়, কারণ সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের কার্যকারণগত পরিকল্পনার (scheme) সঙ্গে সেগুলি খাপ খায় না।

ধর্ম ঠিক এইভাবেই জগৎকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে, বজ্র ও বিদ্যুৎ দেবতারা সৃষ্টি করেন। জগতের অস্তিত্ব আছে, কারণ একজন ঈশ্বর তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। বিপর্যয় হল এক সর্বশক্তিমান দেবতার ইচ্ছা বা এক সর্বশক্তিমান দেবতার উপর এক অশুভ দেবতার জয়লাভ। আমাদের মৃত্যু হয়, কারণ অনেক কাল আগে আমরা পাপ করেছিলাম। তাছাড়া ধর্ম অতি-সরলভাবে ধরে নেয় যে, বজ্র ও বিদ্যুৎ যে আছে, জগৎ যে আছে, এবং সেখানে বিপর্যয় দেখা দেয়, এবং আমরা যে মারা যাই,—এই সব ঘটনা হল দেবতারা যে আছেন, ঈশ্বর যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন এবং আমরা যে অনেক কাল আগে পাপ করেছিলাম তারই প্রমাণ। ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বতত্ত্বগত ও উদ্দেশ্য সাধনবাদগত (Cosmological and Teleological) প্রমাণ বলতে ঈশ্বরতত্ত্ববিদরা যা বোঝান, এ হল সেই। কিন্তু এই ধরনের 'প্রমাণ' বিজ্ঞানের এলাকা থেকে অনেক দিন হল নির্বাসিত এবং ফ্রয়েডের মত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন একজন মানুষ যে তাতে মুগ্ধ হয়েছেন এটা খুব বিস্ময়ের ব্যাপার। বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে যে এই রকম এক সংকট উপস্থিত হয়েছে যখন মনোবিদ্যা এই ধরনের জিনিসকে আর এড়াতে পারছে না, এটা তারই চিহ্ন।

কিছু তথ্যকে যুক্ত করে কোনও উপকথা যে সেই তথ্যগুলির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা দিতে পারে, এই অনুমান করে নিলে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে কোনও তথ্য-সমষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী পেশ করা যেতে পারে। এইভাবে অসংখ্য ধর্মের অস্তিত্ব দেখা যায় যেগুলি মানুষের দুঃখ, তার নিষ্ঠুরতা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার কষ্ট, তার অসাম্য ও তার মৃত্যুর একই তথ্যকে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। ধর্ম তার অভিগমন পদ্ধতির সাহায্যে নানা ভিন্নমতের জন্ম দেয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী চার্চগুলি যে বিযুক্তি না ঘটিয়ে টিঁকে আছে তার কারণ এই যে, তাদের কালের সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যেই তাদের বস্তুগত ভিত্তি বর্তমান।

যে সব ব্যাখ্যা যতদূর সম্ভব ন্যূনতম প্রতীকীকরণের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির পারস্পরিক নির্ধারণকে এবং অবশিষ্ট বাস্তবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে প্রকাশ করে, বিজ্ঞান কেবলমাত্র সেগুলিকেই স্বীকার করতে পারে। এইভাবে একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প অপর একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প সম্পর্কে অসহিষ্ণু এবং তাকে হঠিয়ে দেয়।

বিভিন্ন ধর্মগুলি যেমন সমপরিমাণে ভালো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলি কিন্তু, তাদের কঠোর গঠনের কারণে, সমপরিমাণে ভালো নয়। একটিকে না হয় অপরটিকে হটে যেতে হবেই। পরীক্ষাটা খুবই সহজ। দুটি প্রকল্পের মধ্যে একটি যদি অপেক্ষাকৃত বেশি সার্বিকভাবে এবং অপেক্ষাকৃত কমপ্রতাকধর্মী ভাবে যে প্রক্রিয়াকে সে ব্যাখ্যা করছে তার নির্বন্ধ তার গঠনকে প্রকাশ করে, এবং বাস্তবের ইতোপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত গঠনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে প্রকাশ করে, তাহলে বাস্তব জীবনে ওই ধরনের প্রক্রিয়ার পুনরাবির্ভাবকে পূর্বেই প্রকাশ করার পক্ষে সেই প্রকল্পটি অধিকতর শক্তিশালী হাতিয়ার হবে। সেই কারণেই দুটি প্রকল্পের মধ্যে একটিকে স্থির করার জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রশ্নটি দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, নিউটনীয় তত্ত্বের তুলনায় আইনস্টাইনের তত্ত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলি (Crucial tests) হল আলোর গতিপথের বক্রতাপ্রাপ্তি, গ্রহদের কক্ষপথের ব্যাঘাত, আলফা কণার ভরের বৃদ্ধি এবং পশ্চাৎগতিসম্পন্ন নক্ষত্রগুলির বর্ণালীর স্থানপরিবর্তন (shifts)। কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট আর ক্যাথলিক তত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যকে কখনই একটা চূড়ান্ত পরীক্ষার সাহায্যে সপ্রমান করা যে সম্ভব নয়, তার সহজ কারণ এই যে, সেগুলি নির্ধারিত বাস্তবের গঠনের বহিঃস্থ বলে ধরে নেওয়া সামগ্রীগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে। এই দুটি তত্ত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ বিচারের দিন হবে বলে ধরে নেওয়া হয় ; অর্থাৎ, এ জীবনে হবে না। তত্ত্বগুলি স্পষ্টতঃই এমনভাবে সূত্রায়িত যে, যেমন ধরুন, রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যে

খৃষ্টের মৃত্যুর স্মরণে পার্বনশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের (Eucharist) পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ক্যাথলিক তত্ত্ব অনুযায়ী রুটিটা খৃষ্টের দেহে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ রুটির সমস্ত রাসায়নিক ও ভৌত গুণগুলি তাতে বজায় ছিল। একইভাবে প্রোটেস্ট্যাণ্ট তত্ত্ব আত্মার মুক্তিকে পরীক্ষা করাকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে এই কারণেই যে আত্মাকে পুরোপুরি অ-বস্তুগত বলা হয় এবং সেই কারণেই তা নির্বন্ধতার নাগালের বাইরে।

ধর্মীয় বা বৈজ্ঞানিক কোনও প্রকল্পেরই কোন অর্থ থাকে না যদি তা একটা চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্ম না দিতে পারে, যে পরীক্ষাটি অন্যান্য প্রকল্পের সঙ্গে তাকে সামাজিক দিক থেকে তুলনার যোগ্য করে তুলবে। চিন্তার যদি কোন মূল্য বা তাৎপর্য থাকতে হয় তাহলে বহির্বাস্তবের সঙ্গে তার পারস্পরিক ক্রিয়া ঘটতেই হবে। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবক্তারা যতক্ষণ ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, মানুষের প্রকৃতিদত্ত সাম্য বা অন্য কোনও 'অধিকারের' উপর ভিত্তি করে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবস্থার পক্ষ নিয়ে বিবাদবিতণ্ডা করেন ততক্ষণ তা ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্‌দের বিতণ্ডার মতই অর্থহীন। ন্যায় বিচার, সাম্য বা স্বাধীনতাকে পরিমাপ করার বা নির্ধারণ করার মত কোনও যন্ত্র এখনও কেউ আবিষ্কার করেনি। কেবলমাত্র মূর্ত সমাজের কাঠামোর ব্যাপারেই মার্ক্সবাদী আগ্রহী হতে পারেন, এবং এই ভিত্তিতে ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট অধ্যায়ে সংগঠনের একটি উন্নততর রূপ হিসাবে সমাজতন্ত্রকে তিনি তুলে ধরবেন, যেহেতু বস্তুগত উৎপাদনের উপায়গুলিকে তার দ্বারা আরও বেশি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এর দ্বারা প্রয়োগের চূড়ান্ত পরীক্ষা সম্ভবপর হয়—সাম্যবাদ কি পুঁজিবাদের থেকে আরও বেশি উৎপাদনক্ষম? এইভাবে অর্থনীতি বিজ্ঞানসম্মত থেকে যায়, কারণ তা বাস্তবের ক্ষেত্রে থাকে, এবং যেসব সামগ্রীকে পরিমাণগতভাবে নির্ধারণ করা যায় না সেইরকম সামগ্রী নিয়ে তা ব্যবহার করে না। এই কারণের জন্য, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যতটা তত্ত্বগত তত রকমের সমাজতন্ত্রের জন্ম কিন্তু দেয়নি। বাস্তবকে আরও বেশি করে ভেদ করে এমন এক প্রকল্পের সাহায্যেই মাত্র তার বিরোধিতা করা যায়। একটা পদ্ধতিগত নীতির প্রতি, যেমন 'শক্তির নিত্যতার' (conservation of energy) নীতির প্রতি সাম্যবাদীদের 'লৌহকঠিন অনমনীয় অতিনিশ্চয়তা' বিজ্ঞানীর 'কঠোর' ও সার্বিক আনুগত্যের অনুরূপ; যতক্ষণ না চূড়ান্ত পরীক্ষা করার যোগ্য নতুন কোন প্রকল্প সেটার সম্প্রসারণ বা ঈষৎ পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখিয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ তা বর্তমান থাকে।

কোনও বৈজ্ঞানিক 'মতগোষ্ঠীকে' যখন আমরা ভিন্ন একটা মতের দ্বারা ছিন্নভিন্ন

হতে দেখি, বা তীব্র নির্যাতনে ব্যস্ত হতে দেখি তখনই অনুমান করতে পারা যায় যে তার বিজ্ঞানের মধ্যে কিছুটা পরিমাণ ধর্মীয় মনোভাব প্রবেশ করেছে। বিজ্ঞান এ থেকে পুরোপুরি মুক্ত কখনই হয়নি, কিন্তু মনঃসমীক্ষণকে তা টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

অ্যাডলার, ফ্রয়েড ও ইয়ুঙ একই মানসিক প্রক্রিয়াগুলির আলোচনা করেছেন। সেগুলি হল : মানসগত প্রক্রিয়াগুলি উদ্দীপন (innervation) দিয়ে গঠিত, যার কতকগুলি সম্বন্ধে আমাদের, বিষয়ী হিসাবে, একটা বিশেষ সুবিধাভোগী (বিষয়ীগত) মতামত আছে। এই উদ্দীপনের কতকগুলি, ক্ষুদ্রতম এবং জীবজগতের বিবর্তনের দিক থেকে (phylogonetically) অধুনাতম গোষ্ঠীটি, একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছে যাকে প্রায়ই চেতনা, অহং বা বিষয়ী বলা হয়। এই গোষ্ঠীটি অন্যান্যগুলির তুলনায় আরও বেশি স্বয়ং-নির্ধারিত বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু সবগুলিই পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং এক ধরনের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সমন্বিত (hierarchic)-প্রক্রিয়া গড়ে তোলে। যেগুলি চেতনার অংশ গড়ে তোলে না সেগুলিকে বলা হয় অচেতন। জন্ম মুহূর্তেই উদ্দীপন-সক্ষম নিউরোনগুলি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উদ্দীপকের ফলে উদ্দীপনের কয়েকটি বিশেষ ধরনের প্যাটার্নকে প্রকাশ করে যার সঙ্গে বিশিষ্ট ধরনের দেহকোষগত আচরণ জড়িত। এই প্যাটার্নগুলি 'সহজপ্রবৃত্তি' নামে পরিচিত। কিন্তু এই প্যাটার্নগুলি দেখা দেওয়ার ফলে যে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হয় তা এক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই প্যাটার্নগুলিরই ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করে। এই প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া যেতে পারে স্মৃতি (memory), কিন্তু তা চেতনার বৈশিষ্ট্য নয়। কোনও একটি নির্দিষ্ট কালিক বিন্দুতে সেই কারণে সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাটির একটি ঈষৎ ভিন্ন ধরনের অনুরণন (resonance) থাকে, বা পূর্ববর্তী কোনও কালের তদানীন্তন প্যাটার্নের সামগ্রিকতাজনিত আচরণের ফলে প্যাটার্নের সামগ্রিকতায় ঈষৎ ভিন্ন ধরন দেখা যায়। ফলে কাল যত অতিবাহিত হতে থাকে বাস্তবের প্রতি আচরণ-প্রতিক্রিয়ার প্রসার ও জটিলতাও ততই বাড়তে থাকবে, এবং সম্ভাব্য উদ্দীপন সমষ্টির গোষ্ঠীগুলির ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগও ততই বাড়তে থাকবে। সেইকারণেই আমরা চলতি কথায় বলে থাকি যে জীবনের পথে মানুষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করে; অথবা আর একটু বেশি করণকৌশলগত ভাষায় বলি যে, তার সহজ প্রবৃত্তিগুলি পরিস্থিতির দ্বারা রূপান্তরিত বা সাপেক্ষীভূত হয়েছে। এই ধরনের উক্তিতে কিছুটা পরিমাণে পৌরাণিক কাহিনী মিশে আছে; সম্ভবতঃ বর্তমানে তা এড়ানোও যাবে না। বিশেষতঃ 'চেতনা' নামে যে অধিকতর স্বয়ংশাসিত গোষ্ঠীটি আছে, অন্য সমস্ত অপেক্ষাকৃত কম স্বয়ংশাসিত গোষ্ঠীগুলির

ব্যাখ্যা যার ভাষাতেই প্রকাশিত হতে হয়, তা স্বভাবতঃই সব কিছুকে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রকাশ করতে চাইবে এবং বর্ণনাকে একটা বিশেষ ধরনের মোচড় দেবে। বিজ্ঞান নিজেই একটা চেতনার ফল।

পরীক্ষা থেকে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্দীপনগুলি জীবজগতের বিবর্তনের দিক থেকে সব থেকে হাল আমলের, এবং নিউরোন-গোষ্ঠীগুলি যত পুরাতন আচরণের দিক থেকে তারা তত কম রূপান্তর-যোগ্য; অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'শিক্ষালাভে' তারা তত কম সক্ষম। সুতরাং সেগুলিকে বর্ণনা করার সময় যিনি যেমন পৌরাণিককাহিনীমূলক ভাষা গ্রহণ করেন সেই অনুযায়ী তাদের আরও বেশি শিশুসুলভ, আদিম, পশুসুলভ, সুপ্রাচীন বা স্বয়ংক্রিয় বলে বর্ণনা করে থাকেন।

উদ্দীপন যত সরলই হোক না কেন, তাদের প্রত্যেকটিতে সমগ্র নিউরোন ব্যবস্থাটি প্রকৃতই সংশ্লিষ্ট। পিয়ানোতে একটা কর্ড বাজালে যে তারগুলিকে আমরা আঘাত করছি না সেগুলিও আঘাতপ্রাপ্ত তারগুলির সঙ্গে সমপরিমাণেই সংশ্লিষ্ট। কারণ, কর্ডটি ভালো করে-সুরবাঁধা স্বরগ্রামের (well-tempered scale) অংশ হওয়ার কারণে কর্ড এবং পিয়ানোর কাঠ, ঘরের বাতাস এবং আমাদের কানও সেই কর্ডকে গড়ে তোলে। যদিও চেতনা তার নিজের পরিভাষা অনুযায়ী মানসগত প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে তাসত্ত্বেও সমস্ত সচেতন প্রক্রিয়াতেই ব্যবস্থাটির অবশিষ্ট অংশের উদ্দীপনগুলিও সংশ্লিষ্ট এবং তাদের সহজাত প্রতিক্রিয়াগুলি, রূপান্তরিত বা অরূপান্তরিত, সচেতন প্রক্রিয়া সহ সমস্ত আচরণকে তার বিশিষ্ট প্যাটার্নটির 'ভিত্তি' (ground) যোগায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে চেতনা-সহ সমস্ত আচরণকে অচেতন রূপান্তরিত করে; অর্থাৎ অচেতন উদ্দীপন এবং অভিজ্ঞতা হল চেতনারই একটা অংশ।

স্বভাবতঃই অচেতনের দ্বারা চেতনার এই রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা আমাদের চেতনার কাছে খুবই আগ্রহের ব্যাপার। এটা বুঝতে হলে স্নায়ু-ব্যবস্থার (nervous system) যাবতীয় অংশের সহজাত প্রতিক্রিয়াগুলির এবং তাদের সুসামঞ্জস্যের (harmony) নিয়মগুলি আমাদের সঠিকভাবে অবশ্যই জানতে হবে। কখন কখন সচেতন উদ্দীপন প্যাটার্নের ক্ষণিক অস্থায়িত্বের কারণে (যেমন জরুরি বা অসুবিধাজনক বা ঘুমন্ত অবস্থায়), জীবজগতের বিবর্তনের দিক থেকে অধিকতর পুরাতন নিউরোনগুলি আচরণের স্বরটিকে মুখ্যতঃ নির্ধারিত করে এবং আমরা দেখেছি যে এইগুলি অপেক্ষাকৃত নতুন গোষ্ঠিগুলির থেকে শিক্ষাগ্রহণে অপেক্ষাকৃত কম তৎপর। তখন আমরা সেই আচরণ দেখতে পাই যার পূর্ববর্তী এবং

অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন, অর্থাৎ তথাকথিত শিশুসুলভ প্রত্যাবৃত্তি ঘটেছে। জীবনের অভিজ্ঞতার কিছুটা অংশ তা থেকে বর্জন করা হয়েছে। এই আচরণকে আমরা সহজপ্রবৃত্তিগত বলতেও পারি।

ফ্রয়েড এই বিশৃঙ্খলাগুলির আলোচনা করেছেন এবং সেগুলি সম্পর্কে আগ্রহজনক কিছু অভিজ্ঞতামূলক আবিষ্কার করেছেন। এগুলি আমরা যতটা সুপরিচিত (common) বলে মনে করি তার থেকে তা যে কত বেশি সর্বজনীন তা তিনি দেখিয়েছেন এবং সেগুলিকে অনুসন্ধান করার জন্য এক করণকৌশল বিশদভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর সমস্ত আবিষ্কারগুলি বিশদতা ও দক্ষতার সঙ্গে উদ্ভাসিত এক পুরাণকাহিনী বা কাহিনীগুচ্ছে বিধৃত করা হয়েছে। এর আংশিক কারণ এই যে ফ্রয়েড তাঁর নিজের মতবাদকেই গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেননি। এটা তিনি উপলব্ধি করেননি যে, চেতনাই যেহেতু মনঃসমীক্ষণকে সূত্রায়িত করে সেই কারণে চেতনার দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত অচেতন প্রক্রিয়াই চেতনার মত একই শারীরবিদ্যাগত ভিত্তিবিশিষ্ট কার্যকারণভিত্তিক প্রক্রিয়া হিসাবে এবং শেষ পর্যন্ত তারই সঙ্গে সমসত্ত্ব-বিশিষ্ট হয়ে প্রতীয়মান না হওয়াই সম্ভব ; বরং তা চেতনার পরিপাটি সুবিন্যস্ত জগতে জোর করে ঢুকে পড়া দুষ্টমতি দানবের মতই মনে হওয়া সম্ভব। ঠিক যেমন বজ্র ও বিদ্যুতের মত কার্যকারণভিত্তিক প্রক্রিয়াগুলিকে আদিম মানুষের পরিচিত জগতে জোর করে ঢুকে পড়াকে দেবতাদের বিধিবহির্ভূত কার্যকলাপ বলে আরোপ করা হত, সেইরকম সচেতন জগতে ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী অচেতন 'প্রভাব-গুলিকে' ফ্রয়েড বিকৃতি, বাধ, প্রত্যাবৃত্তি, আবেশিক বায়ু, অদস, মনের প্রহরী, সুখ-সূত্র, প্রাণ-শক্তি, কাম, মৃত্যু-প্রবৃত্তি, বাস্তবতা-সূত্র, কমপ্লেক্স, বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি কটু নামে অভিহিত করেছেন ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্বের শারীরবিদ্যাগত বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্টার্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। যাবতীয় উদ্দীপন প্যাটার্ন অভিজ্ঞতার দ্বারা রূপান্তরিত (বাধ) এক সহজাত প্রক্রিয়া (সহজ প্রবৃত্তি) দিয়ে গঠিত। সুতরাং সমস্ত উদ্দীপন প্যাটার্নের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে চেতন ও অচেতন উপাদান বর্তমান থাকে: সেগুলি বিভিন্নভাবে যুক্ত থাকে বটে কিন্তু সবগুলি মিলে একটিই বর্তনী (circuit) সৃষ্টি করে আচরণের মধ্যে যা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্বের এই অংশের জন্য চেতনার পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। আচরণের যাবতীয় অচেতন উপাদানগুলিকে তিনি ব্যাঘাত, বিকৃতি, ব্যতিচার (perturbations, distortions or interferences) হিসাবে বিবেচনা করেছেন, ঠিক যেমন সঙ্গীতের 'তারা' অংশটি (treble part) উদারা অংশটিকে (bass part) কোন কোন আদিম অ-চেতনা বিকৃতি হিসাবে গণ্য

করতে পারত। ফ্রয়েডের মনোবিদ্যার মতই এক পুরাণাশ্রয়ী ও সুসংলগ্ন মনোবিদ্যা 'অচেতনের' দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা যেতে পারত যার মধ্যে 'সহজপ্রবৃত্তিগুলির' পরিবর্তে 'অভিজ্ঞতাগুলি' এখন সহজাত প্রতিক্রিয়ার স্থায়িত্ব ও সরল জীবনকে বিকৃতকারী ও বাধপ্রদানকারী উৎসাহী বন্দী দানবের ভূমিকা গ্রহণ করত। এবং প্রকৃতপক্ষে, সভ্যতা ও মানুষের সম্বন্ধে ফ্রয়েড যখন সামগ্রিকভাবে আলোচনা করেছেন তখন তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিকেই সরে গিয়েছেন। অভিজ্ঞতা বা চেতনাই (সংস্কৃতি) তখন সহজ প্রবৃত্তির (অচেতনের) রুদ্ধগতি বা বিকৃতি ঘটাচ্ছে। সুতরাং স্বভাবতঃই ফ্রয়েডের মতবাদের মধ্যে একটা দ্বৈতবাদ থেকে গেছে যার সমাধান করা যায় না।

কিন্তু সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন সামগ্রী হিসাবে চেতনা ও অচেতনা দুই-ই অবশ্য বিমূর্তন। যে উদ্দীপনগুলি আচরণের অংশ তাদের সবগুলিতেই এদের বিভিন্ন অনুপাত সেই গোষ্ঠীটিকে গড়ে তোলে যাকে আমরা সেই সময়ের চেতনা বা অহং বলে থাকি। আর সেগুলি পৃথক নয়, অচেতন উদ্দীপনের সাহায্যে চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার বিষয়বস্তু লাভ করে। অচেতন উদ্দীপনের অবদানগুলিকে আমরা সচেতনভাবে কেবলমাত্র আবেগোদ্দীপক হিসাবে জানি। আবেগোদ্দীপকরহিত চিন্তা হল অচেতন, এটা শুধু স্মৃতিসহায়কগত ভাবে রূপান্তরিত গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্তরগত নিউরোন (mnemically modified cortical neurones), কিন্তু সেই মুহূর্তটিতে আবেগাদ্দীপকগতভাবে দীপ্যমান নয়, এবং সেই কারণে অচেতনের ক্রিয়াবাহী বর্তনীর (live circuit) অংশ নয়। সেটা কেবলমাত্র একটা অচেতন স্মৃতি। একইভাবে অচেতন উদ্দীপন বা স্মৃতিবিহীন আবেগোদ্দীপক আদৌ কোন আবেগোদ্দীপকই নয়, সেটা কেবল একটা সহজপ্রবৃত্তিগত প্রতিবর্ত ক্রিয়া, অভিজ্ঞতার দ্বারা অরূপান্তরিত একটা প্রবণতা শুধু। চেতনা আর অচেতনা পরস্পর অসম্পৃক্ত বিপরীত নয়। কিন্তু কোনও মুহূর্তের আচরণ-গঠনকারী উদ্দীপনের যে কোন ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে আমরা কিছুটা পরিমাণ উচ্চ মাত্রার স্মৃতিসহায়ক রূপান্তর যোগ্যতা (mnemic modifiability) পাই, আর বাকিগুলিতে পাই উচ্চ মাত্রার সহজাত পূর্বানুকূলতা (innate predisposition), আর এদের অনুপাতটা পরিবর্তনশীল হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে, কোনও বর্তনীকে সক্রিয়কারী একটা তড়িৎকোষের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর মত, আর কোনও নক্সাপর্দায় প্যাটার্ন গড়ে তোলা সুতাগুলিকে যেমন করে আমরা পৃথক করতে পারি সেই রকম ভাবে কেবলমাত্র বিমূর্তনের সাহায্যেই আমরা চেতনা নামক কমপ্লেক্সটিকে পৃথক করতে পারি। একই সুতা কাপড়টাকে ভেদ করে বিপরীত

দিকে যায় এবং সেখানে উল্টা প্যাটার্ন অচেতনকে তৈরী করে এবং প্রত্যেক প্যাটার্নই অপরটিকে নির্ধারিত করে।

ফ্রয়েড তাঁর পূর্বসূরী শার্কো, জানে, মর্টন প্রিন্স, ও ব্রয়েলের' এর কাজের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর নিজের আবিষ্কারগুলিতে নিজের চেতনা থেকে আহরিত সূত্রায়নগুলি আরোপ করেছেন, কিন্তু পদার্থবিদ্যার বা রসায়নের প্রকল্পে যে কঠোর কার্যকারণতার প্রয়োজন হয় তা এতে দেননি। ফলে ফ্রয়েডের পরিভাষা অচেতনার দ্বারা বিকৃতি প্রাপ্তির কারণে চেতনা যে সব কটু নাম চয়ন করেছিল, বা সচেতন উদ্দীপনের মধ্যে নিহিত অভিজ্ঞতার দ্বারা অচেতনা তার রূপান্তরের জন্য যেসব করুণ অভিযোগ করে সেগুলির থেকে বেশি কিছু নয়। মোটের উপর আমাদের সহানুভূতি চেতনার অনুকূলেই থাকবে, কারণ চেতনা সগুলব্ধ অভিজ্ঞতাকে সূচিত করে এবং সগুলব্ধ চেতনাই হল সমৃদ্ধতম। কিন্তু বাস্তব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শুধু বর্তমানের নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে আমরা বাঁচতে পারি না। তা যদি করি তাহলে তাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে আমরা সক্ষম হব না; বর্তমানের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ব। বর্তমানকে এর থেকে আরও বেশি সম্যকভাবে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, বর্তমানের মধ্যে যে অতীত অন্তর্ভুক্ত তাকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। তার অর্থ এই নয় যে অতীতকে অতীত হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, কারণ বর্তমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। অব্যবহিত পূর্ববর্তী অতীতের সঙ্গে সম্পর্কে প্রতিটি বর্তমানই হল প্রকৃতপক্ষে সেটাই; সেটা হল অতিরিক্ত অভিজ্ঞতার ছাপের দ্বারা রূপান্তরিত ওই অব্যবহিত পূর্ববর্তী অতীত; আর সেই বর্তমানটি নিজেই অতীত হয়ে ওঠে যখন এক নতুন বর্তমানের মধ্যে তা সংশ্লেষিত হয়। কথাগুলি শুনতে হয়ত অধিবিদ্যামূলক মনে হতে পারে, তা সত্তেও মানবদেহের মধ্যে এটা একটা 'স্থূল' ও বস্তুগত শারীরবিদ্যামূলক (physiological) ভিত্তি লাভ করেছে বলে আমরা দেখতে পাই। দৃষ্টিসংক্রান্ত থ্যালামসের (optic thalamus) নিম্নবর্তী যাবতীয় যন্ত্রাংশই পূর্বপুরুষগত অতীতের উত্তরাধিকারলব্ধ অভিজ্ঞতাকে সূচিত করে। প্রতিটি বর্তমান যখন অতীত হয়ে ওঠে তখন তাকে সঞ্চিত করার যন্ত্র হল গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum), আর ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ (sensory perception) হল সেই প্রক্রিয়া যার দ্বারা অতীত, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে, বর্তমান হয়ে ওঠে। এই বলপূর্বক প্রবেশ (ingression) ইচ্ছার (will) জন্ম দেয়, ভবিষ্যতের জন্ম দেয়।

এইভাবে, চেতনাকে যদিও আমরা অধুনাতম ও সমৃদ্ধতম বলে গ্রহণ করি, অচেতনাকে কিন্তু আমরা বর্জন করতে পারি না, চেতনার পূজা এই কাজ করার দিকে

সহজেই আমাদের নিয়ে যেতে পারে। যারা কেবল মাত্র চেতনাকেই গ্রহণ করে তারা তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার জালে জড়িয়ে পড়ে, এবং সমৃদ্ধতর চেতনার দিকে কখনই অগ্রসর হতে পারে না ; ঠিক যেমন বর্তমানের মধ্যে যে অতীত ইতিহাসরূপে রয়েছে যারা সেটিকে অবহেলা করে, তারা সমৃদ্ধতার ভবিষ্যৎকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয় না. ইতিহাসকে তারা কেবল বন্ধ্যা বর্তমানের পরিভাষায় লিপিবদ্ধ করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শিক্ষা হল এই যে ভবিষ্যৎ বর্তমানের মধ্যে বিধৃত নয়, অতীত যুক্ত বর্তমানের মধ্যে তা বিধৃত।

শুধুমাত্র অতীতকে আমরা আরও কম স্বীকার করে নিতে পারি। সেটি অপরটির থেকেও খারাপ ; তা হল জীর্ণ জিনিসে প্রত্যাবর্তন, তা হল শিশুসুলভ প্রত্যাবৃত্তি। এই পথ মানুষকে তখনই অবিরাম নাড়া দেয় যখন, আজকের মত, যে কর্তব্য তার সামনে রয়েছে তা পালন করতে তার চেতনা ব্যর্থ হচ্ছে বলে মনে হয় ; কিন্তু সেটা হল পরাজয়ের পথ। অচেতন স্তরের অবশ্যই নিজস্ব জ্ঞান আছে, কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের মোহরাঙ্কিত বহুযুগব্যাপী বিবর্তনের ঘনীভূত অভিজ্ঞতা তার মধ্যে বিধৃত। অচেতন উদ্দীপনের দেহকোষগত প্রজ্ঞার ভিত্তির উপর আমাদের জীবন গড়ে উঠেছে। তা সত্ত্বেও বাস্তবের মধ্যে জীবনের সন্নিবেশের (insertion) সূচিমুখ হল বর্তমান, এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা, আর এই নতুন অভিজ্ঞতা অ-চেতনার নাগালের বাইরে। এটা হল চেতনা।

ফ্রয়েডবাদ একপক্ষের কাহিনীকে বর্জন করে অপর পক্ষের কাহিনী স্বীকার করতে পারে না। দুটিকেই তা বিচার না ক'রে স্বীকার করে, আর সেইজন্য মীমাংসার অতীত এক দ্বৈতবাদের মধ্যে তা নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। অচেতনের কুবুদ্ধি-সম্পন্ন কমপ্লেক্স-দানবগুলি চেতনাকে কি করে বিকৃত ও আবিষ্ট করে তা দেখানোর পর ফ্রয়েড অপর পক্ষের দিকে চলে যান এবং অচেতন যেভাবে নিজেকে চিত্রিত করতে চাইত, সেইভাবে অচেতনকে চিত্রিত করেন। সংস্কৃতির বাধগুলির হাতে সহজপ্রবৃত্তিগুলি নিপীড়িত হচ্ছে, বর্তমানের হাতে এবং চেতনার হাতে শহীদ হচ্ছে বলে আমাদের তিনি দেখালেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে বিজ্ঞানীর নিরপেক্ষ হওয়া উচিত ; না হলে এই দুই বিপরীতকে, অতীত ও বর্তমানকে, নতুন ও পুরাতনকে কিছুতেই তিনি সংশ্লেষিত করতে পারবেন না। তত্ত্ববিদ্যার বন্ধ্যা ত্রয়ীরাজ্যকেই (trichotony) মাত্র ফ্রয়েড তুলে ধরলেন : (১) শিশুসুলভ প্রত্যাবৃত্তি (বা অতীতকে পূজা করা) ; (২) রক্ষণশীলতা (বা বর্তমানকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা) ; দ্বৈতবাদ (বর্তমান ও অতীতকে শাশ্বত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রত্যয়)। অতীত কিভাবে বর্তমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, এটা যে মানুষ দেখতে পায় সেই মানুষই কেবল ভবিষ্যতের দিকে

অগ্রসর হতে পারে। ভবিষ্যৎ হল 'স্বর্গ ও নরকের মিলনের' সন্তান। হয়ে ওঠার (becoming) প্রাথমিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত, জীবের মধ্যে সক্রিয় আচরণ হিসাবে প্রকাশিত, যার মধ্যে অচেতন ও সচেতন উদ্দীপনগুলি হল উদ্দীপন হার্মনির উদারা আর তারা, যে হার্মনির বিষয়বস্তুর মধ্যে আমরা সহজপ্রবৃত্তি, চিন্তা, অনুভূতি ও জ্ঞানকে পৃথক পৃথক করে চিহ্নিত করি।

হার্মনির এই উপাদানগুলি ফ্রয়েড যখনই মনঃসমীক্ষণের উপকথামূলক ও আবেগগত প্রতীক দিয়ে সজ্জিত করলেন, তখনই তিনি ভিন্নমত ডেকে আনলেন। ইয়ুঙ এবং অ্যাডলার যে প্রতীকগুলি আবিষ্কার করেছেন সেগুলি একই প্রক্রিয়ার অন্ততঃ সমান ভালো ব্যাখ্যা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাৎপর্যের দিক থেকে সেগুলি পরস্পরের প্রতীকগুলির এবং ফ্রয়েডের প্রতীকগুলির পুরাপুরি বিপরীত। অ্যাড-লারের উপকথায় যৌন সহজপ্রবৃত্তি' বড় একটা দেখাই দেয়নি; তাহলেও তাঁর 'আত্মসংরক্ষণের সহজপ্রবৃত্তি' ('instinct of self preservation') ফ্রয়েডের 'কামের' মতই সব কিছুকেই বেশ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করে। যেহেতু পৃথক পৃথক সামগ্রী—যেমন আত্মসংরক্ষণের সহজপ্রবৃত্তি বা মনের প্রহরী—দিয়ে কোন কোন সহজাত শারীরবিদ্যাগত প্রতিক্রিয়ার উপকথামূলক বর্ণনা করা হচ্ছে, সেই কারণে অ্যাডলার ও ফ্রয়েডের মধ্যে বিচার করার মত একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। পুরাণকাহিনী নিয়ে তাঁরা বাদবিতণ্ডা করেছেন যদিও পুরাণকাহিনীগুলি বাস্তব প্রক্রিয়ারই উল্লেখ করছে। জিউসের মস্তক থেকে আথেনির জন্মসংক্রান্ত বিভিন্ন কাহিনীর সংগতিহীনতা নিয়ে গ্রীকরাও একইভাবে বাদবিতণ্ডা করতে পারত। প্রকৃতই যেটা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছিলেন তা হল অভিজ্ঞতার দ্বারা আচরণের রূপান্তর বা আরও চিত্রধর্মী ভাষায় বললে—প্রজ্ঞার জন্ম নিয়ে। জিউস এবং আথেনি দুইই যেহেতু নিছক প্রতীকধর্মী কাহিনী, তাদের নিয়ে, এই ধরনের বাদবিতণ্ডা নিছক সময়ের অপব্যবহার। অ্যাডলার, ইয়ুঙ ও ফ্রয়েড ঠিক একইভাবে তাঁদের অনেক সময় নষ্ট করেছেন।

স্বল্পতর অভিজ্ঞতামূলক আবিষ্কার করলেও ইয়ুঙই সম্ভবতঃ এঁদের সকলের মধ্যে তত্ত্বগত দিক থেকে সব থেকে বেশি বিজ্ঞানধর্মী; কারণ ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্নিহিত দ্বৈতবাদকে তিনি ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু সেই দ্বৈতবাদকে তিনি কখনই এড়াতে পারেন নি। বরং সেটাকেই তিনি তাঁর তত্ত্বের ভিত্তি করেছিলেন।

মনোবিদ্যাকে এতক্ষণ আমরা জীবের আচরণের দিক থেকে আলোচনা করেছি

এবং পরিবেশকে একটা সাধারণ উদ্দীপক ছাড়া অন্য দিক থেকে তাকে দেখতে আমরা অবহেলা করেছি। আমাদের আলোচনাকে জীবদেহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখে মানসগত প্রক্রিয়াকে শুধুমাত্র উদ্দীপনের কিছু প্যাটার্ন হিসাবে আমরা দেখেছি। আমাদের নিজেদের মধ্যে এই উদ্দীপনের কয়েকটিই হল চেতনা। সামগ্রিকভাবে তারা একটি দেহের আচরণের অংশ এবং এই আচরণের অংশটিকে প্রকাশ্যভাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে বা অন্যের মধ্যে ক্রিয়া (action) হিসাবে দেখতে পাই। আচরণের ক্রিয়ার (act of behaviour) মধ্যে মূলগত উদ্দীপন প্যাটার্নগুলি রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। এইভাবে একটি সরল উত্তরাধিকারলব্ধ চরণ (phrase) হিসাবে মানুষের জীবনের মূল সুরটি সুরু হয়; অভিজ্ঞতা তার উপর নানা রকমের প্রকরণ (variation গড়ে তোলে, এবং তার সমৃদ্ধি ও সূক্ষ্মতাকে অবিরাম বাড়িয়ে তোলে। আর বাস্তবের প্রকৃতিই হল এই যে প্রত্যেকটি নতুন বর্তমান পূর্ববর্তী অতীতকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এইভাবে তার জটিলতাকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে তোলে।

কিন্তু সমস্ত আচরণই হল দেহ ও বহির্জগতের উদ্দীপকের মধ্যাকার, অথবা দেহের একটি অংশ ও অপর অংশের মধ্যাকার পারস্পরিক ক্রিয়া। জীব কখনও একা একা আচরণ করে না, সর্বদাই একটা 'অন্য পক্ষ' থাকে; সেটা হল পরিবেশ, যা জীবের আচরণের একটি পক্ষ। তাছাড়া পরিবেশেরও একটা ইতিহাস থাকে, কারণ তা কালের অধীন। এইভাবে পরিবেশ কখনই একই থাকে না এবং জীবের সঙ্গে তার প্রতিটি লেনাদেনাই সূক্ষ্মভাবে ভিন্নতর, কারণ পূর্বতন লেনাদেনার পর থেকে তা আরও বেশি করে ইতিহাসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ জীবের আচরণ হল একটা (বিবাদীসুরবিন্দু counterpoint), যার মধ্যে জীব একটি অংশ সরবরাহ করে, আর পরিবেশ অপর অংশটি। বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটির সুরধর্মিতা (melody) আমরা পৃথকভাবে বিবেচনা করতে পারি; কিন্তু আচরণ প্রকৃতপক্ষে কোনও সুর বা মেলডি নয়, তা একটা হার্মনি। এইভাবে মানসের হার্মনি জিনিসটাই হল বাস্তবের মধ্যে দেহের অস্তিত্বজনিত হার্মনির একটা প্রতিফলন। চেতনার তারার সুর হল পরিবেশের মেলডির একটা প্রতিফলন; অচেতনের উদারার সুর হল জীবের মেলডির এক প্রতিফলন। পদার্থবিদ্যার মৌলিক সূত্র এই যে প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমমাত্রিক ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। এইভাবে আচরণের প্রতিটি ক্রিয়ার পর, যাতে জীব ও ও পরিবেশ পারস্পরিক ক্রিয়া করে, পরিবেশ জীবকে প্রভাবিত করে এবং জীবও পরিবেশকে প্রভাবিত করে; প্রত্যেকটিরই পরিণতিপ্রাপ্ত অবস্থান ভিন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই ইতিহাস দেখা দেয়। কারণ পরিবেশ নিজেই হল পারস্পরিকভাবে অপরের উপর ক্রিয়াশীল সামগ্রীর সমষ্টি মাত্র। কোন একটি

মুহূর্তে জীবের ক্রিয়া ও পর মুহূর্তে তার ক্রিয়ার মধ্যবর্তী কালে পরিবেশ পরিবর্তিত হয়ে যায়; তার কারণ শুধু এই যে, পরিবেশ যে উপাদান দিয়ে গঠিত সেগুলি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করেছে এবং পরস্পরকে পরিবর্তিত করেছে।

এদিকে যাবতীয় পরিচিত জীবের মধ্যে মানব জীবই হল তার মেলডির দিক থেকে সব থেকে বেশি বিস্তারিত (elaborate), এবং বাস্তবের সঙ্গে আদানপ্রদানের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে সব থেকে বেশি সুবেদী (sensitive)। আচরণ থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে জীবই সব থেকে বেশি শিক্ষালাভ করে। মানব জীবের মত অন্যকিছুই এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় না। একইভাবে, সামাজিক পরিবেশও কোনও মানুষের ক্রিয়াগুলির মধ্যবর্তীকালে সব থেকে বেশি দ্রুত পরিবর্তিত হয়, যেহেতু যে সব জীব দিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত তারা মুখ্যতঃ মানুষ। এই দ্বন্দ্বমূলক পরিবর্তনের আলোচনাই হল ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মনোবিদ্যা; কিন্তু সমষ্টিগত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে তা হল সমাজবিদ্যা বা ইতিহাস, এবং তার কার্যকারণমূলক বিবৃতিতে পরিবেশের যে সমস্ত অংশের সঙ্গে মানুষ পারস্পরিক ক্রিয়া করে তার সমস্তগুলিকেই, এমনকি স্থির নক্ষত্রগুলিকেও, তার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু যেহেতু যেসব স্বল্পস্থায়ী কাল নিয়ে সাধারণতঃ আলোচনা করা হয় সেই সময়ের মধ্যে মহাজাগতিক অবস্থাগুলি এমন কিছু গুরুতরভাবে পরিবর্তিত হয় না, সেই জন্য সেগুলিকে গণ্য না করলেও চলে। মানবজাতি সম্পর্কে সেইরকম কোন আলোচনায় যেখানে বিভিন্ন হিমযুগগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে সব ক্ষেত্রে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। ইতিহাসের দিক থেকে অবশ্য মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সাধারণভাবে আলোচ্য কালের মধ্যে পরিবেশের মধ্যকার যে বস্তুগত উপাদানগুলি দ্রুত পরিবর্তিত হয় সেইগুলি; যেমন যন্ত্রাদি, যানবাহন, নগরাদি এবং সংক্ষেপে সামাজিক উৎপাদন থেকে যেসব সম্পর্কগুলি উদ্ভূত হয় সেইগুলি। কারণ জীবের মধ্যে যেসব পরিবর্তন দেখা দেবে সেগুলি তার পরিবেশের এই সব পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে অপরিহার্যভাবে সম্পর্কিত হবে। জীব সচেতনভাবে বা নিজের ইচ্ছায় এই সম্পর্কগুলির মধ্যে প্রবেশ করে না। সেগুলি পূর্বতন এবং তার চেতনা ও ইচ্ছাকে নির্ধারিত করে। প্রকৃতপক্ষে, সমাজবিদ্যার পটভূমি ব্যতিরেকে মনোবিদ্যার পর্যালোচনা অসম্ভব। সে কাজ কেউ যদি করে তাহলে হয় মানব মানসের পরিবর্তনের মধ্যকার কার্যকারণগত যোগসূত্রটির সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, আর না হয়ত মানব মানসকে অপরিবর্তনশীল বলে গ্রহণ করতে হয় এবং সমকালীন মানসের পর্যালোচনা থেকে আবিষ্কৃত নিয়মগুলি চিরকালের জন্য সত্য বলে মনে হয়।

ঘটনা এই যে, মনোবিদ্যার কোনও আধুনিক ধারাই সামাজিক সম্পর্কগুলিকে

মুখ্য ব'লে, যে চেতনার তারা জন্ম দিচ্ছে তাকে সাপেক্ষীভূত করছে বলে, পর্যালোচনা করেনি। মূর্ত সমাজের এবং তার অ-মানসগত ভিত্তির পর্যালোচনা কোনটিই করেনা। মনোবিদ্যার কোনও ধারাই যে মানসের পর্যালোচনা সেটি করছে তার পরিবেশের প্রতি তার মূলগত দৃষ্টিভঙ্গীটাকে সূত্রান্বিত করা পর্যন্ত এখনও গিয়ে পৌছায়নি ; অথচ পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম পারস্পরিক ক্রিয়াই হল মানসগত জীবনের নিয়ম।

ফ্রয়েড তাঁর মনোবিদ্যাগত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয়েছেন বুর্জোয়া ভাববাদীর অঙ্গীকারগুলি নিয়ে, যে বুর্জোয়া ভাববাদীর কাছে যে অপরিবর্তনশীল পশ্চাৎপটের সামনে ভাবগুলি তাদের ভূমিকা পালন করছে সেই পশ্চাৎপটটি ছাড়া বাস্তবের কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এটা ঠিক যে এই ভাবগুলি এখন অনেকটা আগেকার দিনের দার্শনিকদের 'নিয়ন্ত্রণকারী অতিরাগের' মত এবং সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'সহজপ্রবৃত্তি' অথবা 'কাম', কিন্তু গল্পটা সেই একই উপকথাধর্মী নাটক যার মধ্যে বাধ, উদ্গতি (sublimation) কামজশক্তিলাভ, আত্মকাম, রূপান্তরণ ও অভিক্রান্তি (cathexis, narcissism, transformation, displacement) ইত্যাদির 'অলৌকিক ঘটনা' ঘটাচ্ছে মনের প্রহরী, অহং, অধিশাস্তা ও অদসের মত ভালো বা মন্দ পরীরা। এমন কি নরখাদক-প্রবৃত্তি এবং অজাচার-প্রবৃত্তিও রয়েছে, যদিও এইসব প্রকরণগুলি কি করে উদ্ভূত হল এবং বংশানুক্রমিক হয়ে উঠল তা সিদ্ধান্ত করতে জীববিজ্ঞানীদের মাথা গুলিয়ে যায়। কার্যকারণতার কোনও অস্তিত্বই দেখা যায় না।

ফ্রয়েড এক সুখসূত্র কল্পনা করেছেন যা বাস্তবের কারাগারের চৌহদ্দির মধ্যে নিজের সুখের জন্য স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করছে। এইটুকু কার্যকারণতার চৌহদ্দির বাইরে আমাদের যাওয়া চলবে না, একথা ফ্রয়েড স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু তাদের সদা-সংকোচনশীল সীমানার মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা আছে বলে মনে হয়। এ এক আশ্চর্য উপকথা। প্রবলপ্রতাপ বাস্তবের নিয়মগুলির হাতে পীড়নের ফলে সহজপ্রবৃত্তিগুলি বুর্জোয়া বিপ্লবীদের মত নিজেদের তৃপ্তিসাধনের জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে এই ধরনের ধারণার কি বিজ্ঞানের জগতে কোনও স্থান আছে ?

যাবতীয় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর মত এডিংটন, রাসেল এবং ওয়েলসের মতই ফ্রয়েড তাঁর এই বিশ্বাস হারাতে পারেন না যে স্বাধীনতা নামে একটা আলাদা প্রকোষ্ঠ আছে যা বৈজ্ঞানিক কার্যকারণতার কঠিন পাথরের মধ্যে রহস্যজনকভাবে বর্তমান। বৈজ্ঞানিক চিন্তা স্বল্প-স্বস্তিদায়ক এই প্রকোষ্ঠটির আয়তনকে অবিরাম সংকুচিত করে চলেছে (অনুমান করা হয়), কিন্তু তা সত্ত্বেও তা বর্তমান।

বিশেষতঃ, এই চিন্তাবিদরা মনে করেন, যে মানুষ যত বেশি সংস্কৃতি, চেতনা এবং সামাজিক সংগঠনের থেকে মুক্ত তত বেশি সে স্বাধীন, বন্ধনমুক্ত। রাসেল, এডিংটন, ফ্রয়েড এবং ওয়েল্‌স্‌ এই অনুমানের ব্যাপারে সমধর্মী। এই অনুমানকে যুক্তি পরম্পরায় সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেলে (যা তাঁরা করেন না) তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, প্রকৃত স্বাধীনতা একমাত্র অচেতন পশুদেরই আছে।

কিন্তু যা সত্য তা এই যে, জগৎটা বাস্তবের একটা কারাগার নয় যার মধ্যে কোনও অলৌকিক কারণে মানুষকে সুখের এক মধুময় প্রকোষ্ঠ দেওয়া হয়েছে। মানুষ বাস্তবের একটা অংশ, এর সঙ্গে সর্বদা তার সম্পর্ক রয়েছে, এবং চেতনার অগ্রগতি কার্যকারণতা সম্পর্কে তার জ্ঞানকে যে পরিমাণে বাড়িয়ে তোলে সেই পরিমাণেই তা তার স্বাধীনতাকেও বাড়িয়ে তোলে। একইভাবে, সভ্যতা তার স্বাধীনতাকে বাড়িয়ে তোলে, যেহেতু তা নিজেকে সমেত বাস্তবের উপর তার কার্যকারণগত নিয়ন্ত্রণকে বাড়িয়ে তোলে। এই শেষেরটির ব্যাপারে, যন্ত্রের দ্বারা মানুষের পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণের তুলনায় মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমরা সব থেকে কম অগ্রসর হয়েছি। এবং ঠিক এই কারণেই যে মনোবিদ্যা, যা কি করে আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তা দেখিয়ে দেয়, সর্বদাই কার্যকারণতাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। স্বাধীনতা সম্পর্কে বিজ্ঞান মানুষকে কিছু বলছে বলে প্রতীয়মান হয় না। বরং, তা কেবল এমন সব লৌহকঠিন নিয়মই আবিষ্কার করছে বলে প্রতীয়মান হয় যেগুলির অস্তিত্ব ও অনমনীয়তা সে আন্দাজ করে নেয়নি। কিন্তু খাঁচায় আবদ্ধ একটা পশু খাঁচার মধ্যে নিজে রয়েছে বলে উপলব্ধি করে না বলেই কি সে স্বাধীন? সে যখন উপলব্ধি করবে যে তালাবন্ধ একটা খাঁচা তার গতিবিধিকে পুরাপুরি বাধা দিচ্ছে এবং স্বাধীন হতে হলে তাকে **আবশ্যিক ভাবে** দরজার তালাটিকে খুলতেই হবে তখনই কি মাত্র সে স্বাধীন হবে না?

এই কঠিন ভিত্তির উপরেই বুর্জোয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছে যে পূর্ণ স্বাধীনতা পূর্ণ ব্যক্তিগত নৈরাজ্য দিয়ে গঠিত, এবং মানুষ **স্বাভাবিকভাবেই** সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই রুশোবাদ যাবতীয় বুর্জোয়া চিন্তাকে বিকৃত করছে বলে দেখা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ স্বাধীন সহজপ্রবৃত্তিগুলি সংস্কৃতির দাসে পরিণত,—সভ্যতাকে এছাড়া অন্য কিছু বলে ফ্রয়েড দেখতে পাচ্ছেন না।

সৎ বুর্জোয়া সেইকারণে সর্বদাই হয় নিরাশাবাদী, না হয় ধার্মিক। সামাজিক ভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে কিছু সচেতন সামাজিক সংগঠন মানুষের থাকতেই হবে (পুলিস, বিচারক, কারখানা, শিক্ষা) এবং এই সব কিছু তার স্বাধীনতার এত রকমের সীমা বলে যে তার মনে হয় তার কারণ এই নয় যে সংগঠনের **অসম্পূর্ণতা** রয়েছে

কমিউনিস্টরা সেই সমালোচনা করে থাকে। তার কারণ এই যে সংগঠনের অস্তিত্ব আদৌ রয়েছে। বুর্জোয়ার কাছে সেই জন্য মনে হয় সভ্যতা তার পূর্বানুমানের দ্বারাই অভিশপ্ত এবং এই জীবনে আর স্বাধীনতালাভের কোনও আশা নেই। যাবতীয় সংগঠন, যাবতীয় চেতনা, যাবতীয় চিন্তাই পরিণামে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর কাছে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বাভাবিক মানুষের কলুষিত হওয়া, বাধপ্রাপ্ত হওয়া বা অবদমন বলে মনে হয়। কিন্তু এই স্বাভাবিক মানুষ হল এক নরাকৃতি বানর, কারণ সমাজ ছাড়া মানুষ হল পশু।

যে জিনিসটা স্বাধীন নয় তার বাধপ্রাপ্ত হওয়া বা অবদমনের কথা কি আমরা বলতে পারি? আর সহজপ্রবৃত্তিগুলি কি স্বাধীন, নাকি সেগুলি, পতঙ্গদের ক্ষেত্রে যেমন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই, অন্ধ যান্ত্রিক দাসত্ব, ব্যক্তিগত শিক্ষার প্রতি বধির, প্রজাতির মন্থর পূর্বপুরুষগত অভিজ্ঞতাতেই মাত্র কর্ণপাত করে? তাহলে সমাজ তার 'বাধ' ও 'অবদমনের' সাহায্যে চেতনার জন্ম দিয়ে, সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে দাসত্বের পথে নয়, বরং স্বাধীনতার পথেই পরিচালিত করছে। দাসত্বপ্রাপ্ত সহজপ্রবৃত্তিকে যে জিনিসটা মুক্ত করছে তাকে 'বাধ' বা 'অবদমন' বলা, ফ্রয়েড যেমন বলেছেন, হল পক্ষপাতদুষ্ট।

প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানসের বিবর্তনের মধ্যে সহজপ্রবৃত্তিগুলি পরস্পরের সঙ্গে লড়াইয়ের নাটক। ফলে সংস্কৃতির পীড়নের সৃষ্টি হচ্ছে, এছাড়া ফ্রয়েড অন্য কিছু দেখতে পান না। সংস্কৃতির পরিবেশের মধ্যকার যৌথ মাত্রায় এই নাটকের প্রক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছু তিনি দেখতে পান না: তিনি বলছেন, 'এখন আমার মনে হচ্ছে যে সংস্কৃতির বিবর্তনের অর্থ আমাদের কাছে আর ধাঁধাঁ নয়। প্রাণশক্তি ও মৃত্যুর মধ্যকার, জীবনমুখী সহজপ্রবৃত্তি আর ধ্বংসমুখী সহজপ্রবৃত্তির মধ্যকার সংগ্রাম মানব প্রজাতির মধ্যে যেভাবে নিজেকে উদ্ঘাটিত করে, সংস্কৃতি আমাদের কাছে সেই সংগ্রামকে উপস্থাপিত করতে বাধ্য।' অর্থাৎ তাঁর কাছে সংস্কৃতি হল স্বয়ংশাসিত ভাবে মানসগত এবং অভ্যন্তরীণ কার্যকারণতাহীন, যেহেতু তার কোন বহিঃস্থ যোগসূত্র নেই। বস্তুগত পরিবেশকে অগ্রাহ্য করা হল।

অন্য একটি অনুচ্ছেদে সমাজের সংগঠনগুলিকে তিনি পিতার মধ্য দিয়ে সমস্ত ব্যক্তির পরস্পরের সঙ্গে একাত্মীকরণের উপর আরোপ করেছেন, এবং এইভাবে সামাজিক সংবদ্ধতা ও নেতৃত্ব দুটিরই ব্যাখ্যা করেছেন। এবং আরও বলেছেন (আমাদের বর্তমান অসন্তোষের ব্যাখ্যা ক'রে): 'যেখানে সংবদ্ধতার সামাজিক শক্তিগুলি মুখ্যতঃ কোনও গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের পরস্পরের সঙ্গে একাত্মীকরণ দ্বারা গঠিত, অথচ গোষ্ঠী গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যে তাৎপর্য তাঁদের উপর পড়বে

তা অর্জন করতে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা অক্ষম হন, তখন এই বিপদটা সব থেকে বেশি ভয়াবহ হয়ে ওঠে।' এইখানে বুর্জোয়া ভাববাদ, হিটলারের আবির্ভাবের অনেক আগেই, অনিচ্ছাকৃতভাবে বর্বর ফ্যাসিবাদ, ফ্যুরেরবাদ ও নিগমবদ্ধ রাষ্ট্রের (corporate state) সনদ তৈরি করে রেখেছে। ভবিষ্যৎ থেকে পিছিয়ে এসে ফ্যাসিবাদ মুক্তির উদ্দেশ্যে এক অসভ্য অতীত যুগে ফিরে যেতে বলে। আশ্চর্য এক নির্মম পরিহাস এই যে ফ্রয়েডই হলেন, যে ফ্যাসিবাদ তাঁকে বর্জন করেছিল, তাঁর পুস্তকের বহ্ন্যুৎসব করেছিল এবং তাঁর কাছে ঘৃণ্য বলে মনে হয়েছিল, সেই ফ্যাসিবাদী দর্শনেরই ধ্বজাধারী। অথচ যাবতীয় বুর্জোয়া সংস্কৃতির এটাই হল পরিহাস যে যেহেতু তা একটা দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য সে যা বাসনা করে তার বিপরীত জিনিসটাকেই গড়ে তোলে। সে চায় স্বাধীনতা ও স্বকীয় প্রকাশ। কিন্তু যেহেতু সে বিশ্বাস করে যে সামাজিক সংগঠনের উচ্ছেদের মধ্যেই স্বাধীনতাকে পাওয়া যায়, সেই কারণে আধুনিক জগতের সমস্ত স্বৈরাচার ও অন্ধ বিকাশরোধী প্রয়োজনগুলিরই সে জন্ম দেয়। সভ্যতাকে তার সহজপ্রবৃত্তিগত বিকৃতিগুলির হাত থেকে আরোগ্য করার প্রয়াসে ফ্রয়েডবাদ নাৎসিবাদের দিকের পথটিকে দেখিয়ে দেয়।

স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে নাৎসিবাদের যে মনোবিদ্যাগত কার্যপ্রণালীকে তার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে এবং ধিক্কার দিয়েছে, ফ্রয়েড কি সেই নাৎসিবাদেরই মিত্র? এক অর্থে বলতে গেলে, হাঁ। নতুন বাস্তবের সামনে বুর্জোয়া চেতনা যতই ভেঙে পড়তে থাকে, ততই তা নিজের ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ওঠে এবং এই ব্যর্থতাবোধই হল এক বিযুক্তিমূলক (disintegrating) শক্তি। বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের পচনশীলতাকে প্রকাশ করাটা ফ্রয়েডের ভূমিকার একটা অংশ। কিন্তু একেবারে 'অনপেক্ষভাবে আশাহীন' কোনও পরিস্থিতি নেই এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতি ফ্যাসিবাদী মতাদর্শের মত বর্বর ছদ্ম-ধর্মীয় নির্মিতির কর্মপ্রণালীর সাহায্যে এই সব অবমাননাকর অবস্থিতি থেকে আত্মপক্ষ সমর্থন করে। কোনও একটা পরিস্থিতিতে চেতনা যখন নিজের অপর্যাপ্ততা উদঘাটিত করে তখন লোকে হয় বিস্তৃততর কোনও চেতনার দিকে অগ্রসর হতে পারে, যা এই সংকটসৃষ্টিকারী নতুন পরিস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করবে, অথবা ব্যক্তির বা জাতির শৈশবাবস্থায় অনুরূপ কোনও সমস্যার যে সমাধান পূর্বে সে করেছিল সেখানে ফিরে যেতে পারে। এই হল স্নায়ুরোগের (neurosis) কর্মপ্রণালী। কিন্তু এটা কোনও সমাধান নয়, কারণ পুরাতন পরিস্থিতিটা একই পরিস্থিতি নয়, এবং যে মন তার সম্মুখীন হয় সেটিও পরিবর্তিত হয়েছে। লোকে সেইজন্য যেটা পায় তা হল কেবলমাত্র একটা মিথ্যা এবং ব্যাধিজনিত শিশুধর্ম, যা বিভ্রম ও অলীককল্পনায় পূর্ণ। ফ্রয়েডবাদ এটা দেখিয়ে

দিতে পারে, কিন্তু তার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির অভাবে, বিস্তৃততর চেতনায় পৌঁছানোর পথ সে দেখাতে পারে না। সেইজন্য, শেষ পর্যন্ত, সেটা রোগ নিরাময়ের কোনও কৌশল হয় না, সেটা হয় কেবলমাত্র রোগনির্ণয়। মনঃসমীক্ষক যদি নিজে কোনও অধিকতর ভালো সমাধান দেখাতে না পারেন তাহলে স্নায়ুরোগী যে সমাধানটি করেছিল তার প্রত্যাবৃত্তিমূলক প্রকৃতিকে বৃথাই তিনি উদ্‌ঘাটিত করেন। আর ফ্রয়েড সেটা পারেননি। সত্যের সাহায্যেই আমরা আমাদের ভুল দূর করতে পারি, এবং দেওয়ার মত কোনও নতুন সত্য ফ্রয়েডের ছিল না ; ছিল কেবল এক রূপকথার গল্প যা বুর্জোয়া সভ্যতার ভাঙনকে তার নিজের পুরাণকাহিনীমূলক পরিভাষায় যেভাবে দেখেছে সেটাকেই নথিবদ্ধ করেছে।

ফ্রয়েডের পুরাণকাহিনীর সমালোচনার জবাবে প্রায়ই জোর দিয়ে বলা হয়েছে ফ্রয়েডবাদ একটা রোগ নিরাময়ের কৌশল, তা বিজ্ঞান নয়। এই ধরনের সমর্থকরা স্বীকার করেন যে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মধ্যে কাম, মনের প্রহরী, ইদিপাস কমপ্লেক্স ও বাধের মত আবেগগতভাবে আকণ্ঠপূর্ণ ধারণাগুলির কোন স্থান নেই। কিন্তু (এঁরা যুক্তি দেখান) স্নায়ুরোগ বা নিউরোসিস একটা আবেগগত সংকট, এবং স্নায়ুরোগীকে কেবলমাত্র আবেগগত দিক থেকেই আরোগ্য করা যায়। সাপেক্ষ প্রতিবর্তের কথা তার কাছে বলে লাভ নেই। তার আবেগগুলিকে নাড়া দিতে হবে, এবং এটা মনঃসমীক্ষণের পুরাণকাহিনীকে সমর্থন করে, যার দ্বারা সত্যগুলি উপকথামূলকভাবে, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে, তার কাছে হাজির করা হয়।

কিন্তু ফ্রয়েডবাদ যেহেতু বিজ্ঞান নয়, ঠিক সেই কারণেই তা নিরাময়ের কৌশল হিসাবে ব্যর্থ হয়। ধরে নেওয়া গেল যে স্নায়ুরোগীকে আবেগগতভাবেই নাড়া দিতে হবে। স্বতন্ত্র-মনঃসমীক্ষকরা কি তাহলে প্রকৃতই এমনই গোঁয়ার যে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে আবেগের প্রচণ্ড, সৃজনশীল শক্তিকে, সমাজের গতিধর্মিতাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে তাঁরা পরিচালিত করতে পারেন এবং ফ্রয়েডবাদের মত এই রকম বিশুষ্ক ধারণার সাহায্যে তা পারেন ? আবেগ, তার সমস্ত সুস্পষ্ট বর্ণিমতায়, হল অন্ধ অনুভূতিহীন সহজ প্রবৃত্তির উপর যুগব্যাপী সংস্কৃতির সৃষ্টি। যাবতীয় শিল্প, যাবতীয় শিক্ষা, যাবতীয় দৈনন্দিন সামাজিক অভিজ্ঞতা মানব জিনরূপের হৃদয় থেকে তাকে নিষ্কাশিত করে, এবং তার অসংখ্য বিচিত্র প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে ও আকার দেয়। ব্যক্তির মধ্যকার এই শক্তিকে সামগ্রিকভাবে সমাজই একমাত্র পারে প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত করতে। একজন মনঃসমীক্ষক তাকে আকার দিতে পারেন একথা কল্পনা করার অর্থ হল একজন মানুষ চিৎকার করে লণ্ডন শহরের সব বাড়িগুলিকে চুরমার করে ফেলতে পারেন, এইকথা বিশ্বাস করা। এক ব্যগ্র,

মাঝবয়সী ও কেশবিরল চিকিৎসকের কাছে 'কামের সঞ্চালনের' [Transfernce of libido) সাহায্যে আবেগের প্রবল সামাজিক শক্তির মুখে লাগাম পরানো যায় একথা বিশ্বাস করার মত ব্যক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে এমন বিবেচনাহীন ভ্রান্ত বিচার, কি বৈজ্ঞানিক কার্যকারণতায় প্রোথিত মূল কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা কখনও করতে পারে ? সেই যে ভিক্টোরীয় যুগের নায়িকা যিনি এক সৎ নারীর প্রেম দিয়ে পাপীকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, তাঁর অন্ততঃ ব্যক্তিগত রূপলাবণ্য এবং সীমাহীন সুযোগ ছিল।

কোনও জীবের সহজাত প্রতিক্রিয়াগুলি, তথাকথিত সহজপ্রবৃত্তিগুলি নিজেরা হল অচেতন, যান্ত্রিক এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা অ-প্রভাবিত। মনোবিদ্যা সেইজন্য সেগুলি সম্পর্কে আগ্রহী নয়, কারণ সেগুলি শারীরবিদ্যার উপাদান সামগ্রী। চেতনা বা অচেতনার পর্যালোচনায় মনোবিদ্যা যে উপাদানগুলিকে মাত্র পেতে পারে তা হল সেই সমস্ত মানসগত বিষয়বস্তু যা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিক্রিয়ার রূপান্তরণ থেকে সৃষ্ট। এই উপাদানটিই পরিবর্তিত হয়, বিকশিত হয়, সেটাই বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে মানবিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। আর অপারিবর্তনশীল সহজপ্রবৃত্তিগত ভিত্তিকে কারণ হিসাবে মনোবিদ্যার উচিত অগ্রাহ্য করা এবং তা করেও থাকে। ভেদ্যই (variable) তার আলোচ্য সামগ্রী, যা যুগে যুগেই কেবল বদলায় না, যা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভিন্ন এবং একই ব্যক্তির মধ্যে প্রহরে প্রহরে ভিন্ন।

প্রতিবর্তগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা, পারিবেশের উপর ক্রিয়ার দ্বারা সাপেক্ষীভূত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে পরিবেশ গঠিত হয় সমাজ দিয়ে, আর ক্রিয়া গঠিত হয় শিক্ষা, দৈনন্দিন কাজ, দৈনন্দিন জীবন, যা কিছু মানুষ দেখে, খায়, শোনে, নাড়াচাড়া করে, যাতে করে যাতায়াত করে, যার সঙ্গে সহযোগিতা করে, যাকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, বা যার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়—এক কথায় সামাজিক সম্পর্কগুলির গোটা কাঠামোটা দিয়ে সেটা তৈরি হয়। বিকাশমান সহজপ্রবৃত্তিধর্মী জীবের মধ্যে এগুলি মানসের জন্ম দেয়, চেতনাকে তার বিষয়বস্তু এবং অচেতনাকে তার প্রবণতা দান করে, আর মানুষকে মানুষ যা তাই করে তোলে। চেতনা হল সামাজিক অভি-যোজনের দেহযন্ত্র (organ), কিন্তু সমাজ চেতনা দিয়ে গঠিত নয়।

একথা সত্য যে প্রতিটি পরিবেশের সঙ্গে জীবের সংস্পর্শ জীবকেই কেবল প্রভাবিত করে না, পরিবেশকেও তা প্রভাবিত করে। কিন্তু কোনও একটি মানসের পর্যালোচনা করতে হলে, স্বতন্ত্রব্যক্তি সম্পর্কিত মনোবিদ্যার যা কাজ, আমরা একদিকে এক নগ্ন জনিরূপ (genotype) দেখতে পাই যা মূক, অজ্ঞ ও ঐতিহ্যরহিত, আর অপর দিকে তার পরিবেশের স্রষ্টা, কেবলমাত্র লক্ষ লক্ষ অন্যান্য স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেই

নয়, সামাজিক সংগঠনগুলিতে, ধর্মে, বিজ্ঞানে, আইনে ও ভাষায় লক্ষ লক্ষ মানব-কর্মের অভিজ্ঞতার মশলা দিয়ে গেঁথে তোলা সূত্রায়নকেও দেখতে পাই। ফলে এই বিপুল পরিমাণ চেতনার উপর জীবের ক্রিয়াটি জীবের উপর তার প্রতিক্রিয়ার তুলনায় খুবই কম। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল সেই ক্ষেত্রগুলি যেখানে, তার নিজের অস্থায়িত্বেরই কারণে, তাকে সজোরে এক নতুন অবস্থানে পাঠানোর পক্ষে সামান্যতম স্পর্শটুকুই ইতোমধ্যেই যথেষ্ট। এই ধরনের স্পর্শ মার্ক্স প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কোন বলবিদ্যাকে সূত্রায়িত করার মত একটা বিজ্ঞানসম্মত মনোবিদ্যাকে সূত্রায়িত করতে হলে অন্তর্নিহিত কার্যকারণগত নিয়মগুলির তুলনায় নয়ন-ভুলানো দিকটার কোনও গুরুত্ব নেই ; সাধারণ বা বিশেষ দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই তা কাযকর। অস্থায়িত্বের কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা ক্রিকেট বল সূর্যকে চুরমার করতে পারে। এই ঘটনা থেকে ক্রিকেট বল সূর্যের থেকেও বেশি বল (forces) প্রয়োগ করে একথা কল্পনা করার পক্ষে কোনও যুক্তি আমাদের নেই। বলবিদ্যার মত মনোবিদ্যার ক্ষেত্রেও কোন বস্তুর উপর জগতের প্রভাবের তুলনায় মহা-জাগতিক পরিবেশের উপর সেই বস্তুর যে প্রতিক্রিয়া, তাকে গণ্য না করলেও চলে।

এইভাবে সমাজবিদ্যা থেকেই মনোবিদ্যাকে নিষ্কাশিত করতে হবে, বিপরীত দিক থেকে নয়। কারণ সমাজবিদ্যা যদি বিজ্ঞানভিত্তিক হয় (আর বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজবিদ্যার যে একটি মাত্র মতগোষ্ঠী আছে সেটি প্রতিষ্ঠা করেন মার্ক্স), তাহলে তা সামাজিক সম্পর্কের ডায়লেকটিক থেকে উদ্ভূত যে সচেতন সূত্রায়নগুলি এবং বস্তুগত পুষ্টিগুলি বিকাশমান শিশু মানসের পরিবেশের কাজ করে, সেগুলিকে ইতোমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ হল সেই সামাজিক সম্পর্ক যার মধ্যে জীব তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে প্রবেশ করে। সামাজিক পরিবেশ মানবজীবের কার্যকলাপ দ্বারা গঠিত হওয়া সত্ত্বেও, এবং কাল ও স্থান বস্তুকণার সম্পর্কগুলির সমষ্টি হওয়া সত্ত্বেও একটি বস্তুকণা (particle) যেমন কাল ও স্থানের দাস, একক জীবও সেইরকম পরিবেশের দাস। মনোবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার আগে সমাজবিদ্যাকে আমাদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, ঠিক যেমন একক বস্তুকণা নিয়ে সন্তোষজনক ভাবে আলোচনা করার আগে কাল ও স্থানের নিয়মগুলিকে আমাদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। তার অর্থ এই নয় যে মনোবিদ্যা আর সমাজবিদ্যা একই জিনিস। মানবজাতির কাছে মনোবিদ্যার এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রয়েছে, কিন্তু অধিকতর সাধারণ নিয়মাবলীর পটভূমিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই মাত্র সেটার পর্যালোচনা করা যেতে পারে, ঠিক যেমন পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী ছাড়া জীববিদ্যা অসম্ভব। সমাজবিদ্যা মনোবিদ্যার ভিত্তিভূমি।

ফ্রয়েড এটা দেখতে পাননি। তাঁর কাছে যাবতীয় মানসিক প্রক্রিয়া হল সহজপ্রবৃত্তির নিছক পারস্পরিক ক্রিয়া ও পারস্পরিক বিকৃতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক সংগঠন যার একটা প্রক্ষেপ (projection), অথচ সহজপ্রবৃত্তির তৈরি এই পরিবেশই সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে পীড়ন করে ও তার বাধ সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক বিকাশের জটিল ও সমৃদ্ধ চলনকে কার্যকারণগতভাবে ব্যাখ্যা করতে ফ্রয়েড অক্ষম। কারণ, কোন মানুষ যদি নিজের জুতোর ফিতে ধরে টেনে নিজেকে মাটি থেকে তুলতে চেষ্টা করে, তাহলে যেমন হয় সেইরকম এক অবস্থান তিনি গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, তার শিল্প, তার বিজ্ঞান ও তার নানা প্রতিষ্ঠানগুলি ফ্রয়েডের কাছে পরিবর্তনহীন বাস্তবের মধ্যে মানুষের সহজপ্রবৃত্তিগত আলোড়নের নিছক একটা প্রক্ষেপ মাত্র; অথচ এই সহজপ্রবৃত্তিগুলি এবং বাস্তব যদিও একই থাকে, এই প্রক্ষেপ অবিরাম পরিবর্তিত হয়। সামাজিক সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত হয় কেন? মানসগুলি যুগে যুগে পরিবর্তিত হয় কেন? যেসব আধুনিক মনোবিজ্ঞানী জনিকণের পরিবর্তনহীন সহজপ্রবৃত্তিগুলির উপর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মত ফ্রয়েডও মনোবিদ্যার কাছে যে বিষয়টি একমাত্র আগ্রহের, সেটিকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। সেই বিষয়টি হল মনোবিদ্যা যা দিয়ে গঠিত সেইটি, মানসিক 'প্রকাশিত লক্ষণের' (phenotype) অবিরাম প্রকরণ (variation) ও বিকাশ (development)। প্লাতোর গুহাস্থিত মানুষের মত ছায়া দেখে বাইরে কি ঘটছে তা নির্ণয় করার চেষ্টা করছেন মনঃসমীক্ষকরা। মানসের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত ক'রে বহির্বাস্তবের স্রোতের দ্বারা সৃষ্ট চলনগুলি দেখে তাঁরা রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং সেগুলিকে ধৃত ও নিপীড়িত সহজপ্রবৃত্তির বিকৃতি ব'লে, অথবা সহজপ্রবৃত্তি থেকে যে রহস্যজনক 'বলগুলির' (forces) সৃষ্টি হয়, তার হস্তক্ষেপ বলে ভুল করেন। একটা জায়গার চারপাশে ছায়াগুলি একটা বৃত্তাকার বিকল্প (detour) সৃষ্টি করে দেখে তাঁরা সেটাকে মানসের একটা শাশ্বত নিয়ম, ইদিপাস কমপ্লেক্স বলে ধরে নেন। পরিবেশের মধ্যে এমন একটা বাধা সৃষ্টি হয়েছে যে ছায়াগুলিকে তার চারদিকে ঘুরতে হচ্ছে এবং বাধাটিকে দূর করলে কমপ্লেক্সটাও যে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এটা তাঁদের খেয়াল হয় না।

মনোবিদ্যাকে যেহেতু তাঁরা সমাজবিদ্যার দিক থেকে দেখতে পারেন না, সেই কারণে কার্যকারণগত দিক থেকেও সেটাকে দেখতে পারেন না। ফলে বুর্জোয়া মনোবিদ্যাকে অতিক্রম করে কোন মনোবিদ্যা ফ্রয়েডবাদ আয়ত্ব করতে পারে না। 'সভ্যসমাজে স্বতন্ত্রব্যক্তির' দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন না। আদিম মানুষকে নিয়েই তাঁরা পর্যালোচনা করুন বা আত্মার সাধারণ

নিয়মগুলিই প্রতিষ্ঠিত করুন, সেটা সর্বদাই অন্যান্য বুর্জোয়া মানসের পর্যালোচক এক বুর্জোয়া মানসের থেকে সূত্রায়িত ধারণার সাহায্যে গঠিত এবং সেইজন্য সহজপ্রবৃত্তিগুলি সর্বদাই এক নিষ্ঠুর সংস্কৃতির হাতে অবদমিত হয়ে পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত চমৎকার ও স্বাধীন পশুদের ভূমিকা পালন করে। একথা সত্য যে আজ উৎপাদন সম্পর্কগুলির ব্যবস্থা মানুষের চমৎকার ক্ষমতাগুলিকে পঙ্গু করে তুলছে। কিন্তু এই বাস্তবকে প্রতিফলিত করার পক্ষে 'অবদমনের হাতে বন্দী' কামের ফ্রয়েডীয় ধারণা যথেষ্ট মাত্রায় পর্যাপ্ত পুরাণকাহিনী নয়। অতীতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গত পরিস্থিতির এ এক বিবর্ণ বিষয়ীগত প্রতিফলন। এর থেকে 'আদি পাপের' পুরাতন বুর্জোয়া প্রতীক অপেক্ষাকৃত ভালো। পরিবেশকে যিনি গণ্য করেননি বা তার পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত নন, সেই ফ্রয়েডের কাছে মানস, যা তার পরিবেশেরই এক সৃষ্টি, এমন এক প্রাণী হয়ে ওঠে যাকে রহস্যময় স্বয়ংসৃষ্ট সব সামগ্রী এক অসুখী বুর্জোয়া মানস হয়ে উঠতে বাধ্য করে। ব্যাপারটা এইরকম : একজন লোক যেন দেখলেন প্রবল হাওয়ায় গাছের সারি চারদিকে হেলে পড়ছে। বিকাশ এবং পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কটি পর্যালোচনা না করে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে গাছগুলির মধ্যে এক রহস্যময় কমপ্লেক্স মাটির দিকে আকর্ষণকারী মৃত্যুধর্মী সহজপ্রবৃত্তির কারণে সেগুলিকে নুইয়ে দিচ্ছে, আর শাশ্বত প্রাণশক্তি তাদের খাড়া হয়ে লাফিয়ে উঠতে আদেশ দিচ্ছে। ফ্রয়েডের ভ্রান্তিটা আরও বেশি খারাপ এই কারণে যে মনোবিদ্যার সাহায্যে পর্যালোচিত মানস হল সমগ্র গাছটির থেকে আরও বেশি করে পরিবেশগত সর্তগুলিরই পরিণতি। মানস হল সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে অভিযোজনের যন্ত্র। সুতরাং মনোবিদ্যার পক্ষে সামাজিক সর্তগুলিকে নির্ধারণকারী নিয়মগুলি মৌলিক।

এইভাবে ফ্রয়েডবাদ, যাবতীয় 'স্বতন্ত্র ব্যক্তি সংক্রান্ত' মনোবিদ্যার মত, সব থেকে প্রাথমিক বিজ্ঞানের বাঞ্ছনীয় অথচ অবিদ্যমান সামগ্রীর (desideratum) সামনে, কার্যকারণতার সামনে ভেঙে পড়ে। একটা নিরাময় কৌশল হিসাবে উদ্ভূত হলেও এটা অবিমিশ্র নিরাশাবাদের এক তত্ত্ব হয়ে ওঠে। আমাদের পরিবেশের নিয়মগুলি যদি আমরা না জানি তাহলে নিজেদের আমরা জানতে পারি না। আর নিজেদের যদি আমরা না জানতে পারি তাহলে আমরা কখনই স্বাধীন হতে পারি না। আমরা যদি তিক্ততায় পূর্ণ হই, আর এই তিক্ততা হল অপরিহার্য এক সহজপ্রকৃতিগত সংঘর্ষ, তাহলে আমাদের হৃদয় কখনই মধুরত্ব লাভ করতে পারে না। আমাদের চেতনার কোনও গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি আমাদের পরিবেশের কাছে ঋণী না হয়, তাহলে তাকে পরিবর্তিত করার কোনও মূল্য নেই। হোরেস

বলেছিলেন, 'নির্বাসিত ব্যক্তি নতুন আকাশ দেখে, কিন্তু হৃদয় তার একই থাকে।' —বর্তমান কালের বিধেয়গুলিকে যদি আমরা চূড়ান্ত মনে করি এবং বর্তমান যদি পূর্ণ হয় হতাশা ও স্নায়ুরোগে, মন্দাবাজার ও যুদ্ধে, তাহলে সেগুলিকে অতিক্রম করে এক সফল পরিণতিতে আমরা কিছুতেই পৌঁছাতে পারি না। বড় জোর, স্নায়ুরোগীর মত একটা শিশুসুলভ স্তরে এক পূর্বতন সফল সমাধানে—সামন্ততন্ত্রে, বর্বর গোষ্ঠী-নেতৃত্বে, একমতাবলম্বিতায় (unanisme), ফ্যাসিবাদে ফিরে যেতে পারি মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে, ইয়ুঙ পুরাতন বর্বর পুরাণকাহিনীগুলিকে আমাদের সাহায্যে আসার জন্য প্রার্থনা ক'রে এই প্রত্যাবৃত্তিকেই আমাদের একমাত্র মুক্তি বলে আহ্বান জানিয়েছেন। ফ্রয়েডের অন্ততঃ এই পলায়নী পথকে অস্বীকার করার মত সাহস আছে, এবং সেইজন্য ক্ষয়িষ্ণু ক্লাসিকাল সভ্যতার রোমান স্টয়িকদের মত সুকঠোর পথটিই তিনি অনুসরণ করেছেন এবং বিষের পাত্র নিঃশেষে পান করেছেন।

দেবতাদের শেষ রক্তাক্ত যুদ্ধের এই আপাতঃমার্জিত ধারণা প্রকৃতপক্ষে বর্বর, এবং হিন্দু আত্মসমর্পন (resignation) ও নিরামিষভোজীর পবিত্রতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। নিজের সীমাবদ্ধতার প্রতি এই আত্মসমর্পনের ভবিষ্যদ্বক্তা হলেন স্পেঙ্গলার :

'একমাত্র স্বপ্নচারীরাই বিশ্বাস করে যে উদ্ধারের একটা পথ আছে। এই যুগে আমরা জন্মেছি এবং পূর্বনির্ধারিত পরিণতির দিকে সাহসের সঙ্গে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। অন্য কোনও পথ নেই। আমাদের কর্তব্য হল শেষ পর্যন্ত লড়াই করা, যদিও আশা নেই, উদ্ধার নেই।'

ফ্রয়েডও তাঁর 'দা ফিউচার অফ অ্যান ইলিউশ্যন' এবং 'গ্রুপ সাইকোলজি' পুস্তকে সংস্কৃতির পক্ষে সামান্য আশাই দেখতে পেয়েছেন। অথচ তা সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের থেকে তিনি এই দিক থেকে বেশি আশাবাদী যে, সমাজ ধ্বংসের পথে গড়িয়ে চললেও সমগ্র সমাজ যে কাজ করতে পারে না স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে মনঃসমীক্ষক সে কাজ পারেন এবং আধুনিক পরিস্থিতির দ্বারা সৃষ্ট স্নায়ুরোগীকে আরোগ্য করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন। ব্যক্তির সমষ্টি যে কাজ পারেন না, সেই সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তি সেই কাজ পারেন, এই পরস্পরবিরোধী বিশ্বাস এই সব বুর্জোয়া নিরাশাবাদীদের বৈশিষ্ট্য, এবং ফলে এদের নিরাশাবাদকেও সম্পূর্ণ নিষ্ঠাপূর্ণ বলে মনে করা শক্ত।

ফ্রয়েডের প্রাক্তন ছাত্র, ব্যক্তিবিষয়ক মনোবিদ্যার প্রবক্তা অ্যাডলারের তত্ত্বে পরিবেশ ও ব্যক্তির সম্পর্ক সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়। অ্যাডলার কি বলছেন শোনা যাক :

'এই সভ্যতায়, যেখানে একজন মানুষ অপরের শত্রু—কারণ আমাদের সমগ্র শিল্পভিত্তিক ব্যবস্থা সেইটাই বোঝায়—সেখানে নীতিভ্রষ্টতা দুরারোগ্য, কারণ নীতিভ্রষ্টতা আর অপরাধ হল আমাদের শিল্পায়িত সভ্যতায় পরিচিত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের উপজাত।'

বলা হবে যে অ্যাডলার নিশ্চয়ই বুর্জোয়া খাঁচা থেকে পলায়ন করতে পেরেছেন। পরিবেশ, বুর্জোয়া পুঁজিবাদই যে আমাদের বর্তমান অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে এবং সহজপ্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে জীবের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম যে বুর্জোয়া পুঁজিবাদের জন্ম দেয়নি, একথা তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। একথা ঠিক যে এখানে তিনি শিল্পায়নের (যন্ত্রের করণকৌশল) সঙ্গে যে পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতা তার উদ্ভব ঘটিয়েছে অথচ তা থেকে পৃথক করার যোগ্য, সেই পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতাকে গুলিয়ে ফেলেছেন উৎপাদিকা শক্তিগুলির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে তিনি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। তা-সত্ত্বেও অন্ততঃ (জোর দিয়েই একথা বলা হবে) ব্যাপারটার মূলটি তাঁর তত্ত্বের মধ্যেই রয়েছে। তাঁর লেখার উদ্ধৃত অংশটুকু থেকে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক এই 'দুরারোগ্য' নীতিভ্রষ্টতার কি প্রতিষেধকের কথা তিনি বলছেন।—'এই নীতিভ্রষ্টতাকে সীমিত করার এবং দূর করার জন্য আরোগ্যমূলক শিক্ষাবিজ্ঞানের curative pedagogy) একটি অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

এই হল ব্যক্তিবিষয়ক মনোবিদ্যার (Individual psychology) যুক্তি! মানুষের নীতিভ্রষ্টতা, তার স্নায়ুরোগ, তার অসন্তোষ, তার হতাশা এসবকে সঠিকভাবেই পরিবেশজনিত—পুঁজিবাদী সামাজিক-সম্পর্কজনিত বলে দেখা হয়েছে। সেটাকে আরোগ্য করার জন্য অবশ্য তার পরিবেশকে পরিবর্তিত করার দরকার নেই, কারণ ইতিহাস চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও সমস্ত বুর্জোয়া অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যায় পরিবেশকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। মানুষকে বরং নিজের জুতোর ফিতে ধরে নিজেকে মাটি থেকে তুলতে হবে; পুঁজিবাদের চরম ভাঙনের ভূমিকম্পকে আরোগ্য করার জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানমূলক বড়ি সেবন করতে হবে। এই বড়ির আবার নানা রূপ : অ্যাডলারের কাছে তা হল আরোগ্যমূলক শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ। ফ্রয়েডের কাছে তা হল রোগীদের, তারা যদি বেশ সচ্ছল হয়, চিকিৎসার জন্য এক মনঃসমীক্ষকের কাছে যেতে হবে। ইয়ুঙ উপলব্ধি করেছেন যে সেটা গরীব শ্রেণীর পক্ষে অসম্ভব, সেইজন্য আদিরূপাত্মক নায়ককে (archetypal hero) দৈত্যাকৃতি এক মাছের গিলে ফেলার সেই পুরাতন পুরাণকাহিনীকে 'অচেতনার মনোবিদ্যা' আমাদের আবার প্রচলিত করতেই হবে। সমাজ যখন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগছে এই

সব চিকিৎসকরা তখন তার রোগ-শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন! মার্ক্সবাদীদের সমালোচনায় মাঝে মাঝে যে একটা তাচ্ছিল্যের সুর দেখা যায় তাতে কি অবাক হওয়ার কিছু আছে ?

মনঃসমীক্ষণের বিরোধিতার জন্য মার্ক্সবাদীকে প্রায়ই ভৎসনা করা হয়েছে। একথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে মনঃসমীক্ষণের প্রতিষ্ঠাতার নাকি কোনও বুর্জোয়া বিভ্রম ছিল না, তিনি একেবারে নির্ভেজাল বস্তুবাদী। কিন্তু তিনি তা নন। ফ্রয়েড এখনও এই কেন্দ্রগত বুর্জোয়া বিভ্রমের দ্বারা আচ্ছন্ন যে যে পরিবর্তনহীন সমাজ ব্যক্তির পায়ে বেড়ি পরিয়েছে, এবং যার বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্যে তার সহজপ্রবৃত্তিগুলি মানসের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র প্রক্রিয়াগুলিকে বিকশিত করার জন্য স্বাধীনভাবে চেষ্টা করে, ব্যক্তি সেই পরিবর্তনহীন সমাজের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছে। এই বিভ্রমের কারণে ফ্রয়েড মনে করেন যে সমাজ নিজেই হতাশাগ্রস্ত হতে বাধ্য, অথচ এও মনে করেন যে একজন ব্যক্তি অপরকে আরোগ্য করতে পারে। এটা তিনি কিছুতেই দেখতে পান না যে, মানুষের যেমন নিজেকে উপর দিকে তোলার জন্য নিজের বাইরে একটা আলম্ব (fulcrum) থাকা প্রয়োজন, সেইরকম যে পরিবেশ ব্যক্তির চেতনাকে সৃষ্টি করেছে সেই পরিবেশকে পরিবর্তিত করার জন্য ব্যক্তিকে পরিবেশের উপর অবশ্যই ক্রিয়া করতে হবে। মানুষের মনের গভীর ও অধুনাতন স্তরগুলির মধ্যকার অমিলকে ফ্রয়েড প্রতীকধর্মীভাবে সূচিত করেছেন। এইজন্য তাঁর কাছে আমরা খুবই ঋণী; কিন্তু তিনি আমাদের আরোগ্য করতে পারেন না, কারণ আমাদের তিনি এই প্রাথমিক সত্যটুকুই শিক্ষা দিতে পারলেন না যে আমাদের নিজেদের পরিবর্তিত করতে হলে জগৎটাকেই আমাদের পরিবর্তিত করতে হবে।

প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে যাবতীয় সহজপ্রবৃত্তির বিদ্রোহই হল ফ্রয়েডের কাছে সব কিছু এবং সেটাই তাঁর সমস্ত দৃষ্টিপথকে বাধা দিয়েছে, যে কারণে তিনি যাবতীয় মনোবিদ্যা, শিল্প, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইতিহাসকে এই বিদ্রোহের পরিভাষায় লিখেছেন। মার্ক্সবাদীদের কাছে সহজপ্রবৃত্তির এই বিদ্রোহ অনেক সংকেতের মধ্যে একটি সঙ্কেত মাত্র। সেই সঙ্কেত হল এই যে, ভেঙে পড়া দেউড়ির ওপাশে এক নতুন পরিবেশ বাস্তবরূপ লাভ করছে এবং মানুষের বিক্ষুব্ধ আত্মার মধ্যেও এক বিস্তৃততর চেতনা ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

আট

স্বাধীনতা

॥ বুর্জোয়া বিভ্রম সম্পর্কে একটি আলোচনা ॥

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে মন্তব্য করে এচ. জি. ওয়েলস যে বেতারভাষণ দিয়েছিলেন অনেকেই তা শুনে থাকবেন। সেখানে তিনি এই রাষ্ট্রটিকে বলেছেন, 'এক বিরাট পরীক্ষানিরীক্ষা যা তার অর্ধেক প্রতিশ্রুতি মাত্র পালন করেছে' এটা এখনও 'মানসিক স্বাধীনতাহীন এক দেশ।' বার্টাণ্ড রাসেলের অনেক প্রবন্ধ আছে যেখানে স্বাধীনতার (liberty) গুরুত্ব, স্বাধীনতা ভোগ করাই যে মানুষের সর্বোচ্চ ও সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, এসব কথা এই দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। ফিশার দাবি করেছেন যে বিগত দুই বা তিন শতকের ইউরোপের ইতিহাস শুধু মাত্র স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। শিল্পী, বিজ্ঞানী, এবং দার্শনিকরাও অবিরাম এবং নানা ভাবে স্বাধীনতার এই রকম প্রশংসা করেছেন এবং মানুষের তা ভোগ করার অধিকারকে প্রবল পরাক্রমে সমর্থন করেছেন।

আমিও এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। যে সব সাধারণীকৃত সামগ্রী সহজেই আমাদের মুখে আসে—যেমন ন্যায়বিচার, সৌন্দর্য, সত্য—তার মধ্যে স্বাধীনতাই আমার কাছে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীনতা (freedom) নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এই সব লোকেরা—শিল্পী, যাঁরা শব্দ সম্পর্কে যত্নবান, বিজ্ঞানী, যাঁরা শব্দ দ্বারা সূচিত সামগ্রী (entity) সম্পর্কে অনুসন্ধানী, দার্শনিক, যাঁরা শব্দ বা সামগ্রীর মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে সবিশেষ সজাগ—এঁরা কেউই স্বাধীনতা বলতে যে কি তাঁরা বোঝাচ্ছেন কখনই সুস্পষ্টভাবে তার সংজ্ঞা দেন না। তাঁরা যেন ধার নিয়েছেন যে এটা একটা সুস্পষ্ট প্রত্যয় যার সংজ্ঞা সম্পর্কে সকলেই একমত হবেন।

অথচ কে না জানে যে স্বাধীনতা এমন একটা প্রত্যয় যার প্রকৃতি নিয়ে মানুষ যত বিবাদ করেছে এমন আর কোন কিছু নিয়েই তত বিবাদ করেনি? অদৃষ্ট, কর্ম, অবাধ-ইচ্ছা, ময়রা (Moira), বিশ্বাস বা কর্মের দ্বারা মোক্ষলাভ, নির্বন্ধতাবাদ, ভাগ্য, কিসমৎ, বিধেয়মূলক নির্দেশ, পর্যাপ্ত করুণা, উপলক্ষ্যবাদ, বিধিলিপি, শাস্তি ও দায়িত্ব [predestination, Karma, Free-will, Moira, salvation by faith or works, determinism, Fate, Kismet, the categorical imperative, sufficient grace, occasionalism, Divine Providence,

punishment and responsibility] সম্পর্কে ঐতিহাসিক মতভেদগুলি সবই মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্পর্কে। স্বাধীনতা সম্পর্কে গ্রীক, রোমান, বৌদ্ধ, মুসলিম, ক্যাথলিক, জ্যানসেনপন্থী, ক্যালভিনপন্থী প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা। তা হলে এই সব বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা কেন ধরে নেন যে স্বাধীনতা একটা সুস্পষ্ট প্রত্যয়, এঁদের সব শ্রোতারাই কি তা একই রকম মনে করেন এবং সেইজন্য তার সংজ্ঞা দেওয়ার প্রয়োজন নেই? যেমন ধরুন রাসেল। সংখ্যার একটা প্রকৃত সন্তোষজনক সংজ্ঞার সন্ধানে সারাজীবন তিনি ব্যয় করেছেন এবং এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন কি না তা নিয়ে এখনও মতভেদ আছে। স্বাধীনতা বলতে তিনি কি বোঝাচ্ছেন এ বিষয়ে তাঁর রচনায় আমি কোনও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেখতে পাইনি। অথচ স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় তার থেকে সংখ্যা বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে বহুতর লোক যে একমত হবেন এইটাই বেশির ভাগ মানুষ ধরে নেন।

শব্দগুলির এই অনির্দিষ্ট ব্যবহারের এই অর্থই মাত্র হতে পারে যে হয় তাঁরা বিশ্বাস করেন যে শব্দটির অর্থ ইতিহাসে অপরিবর্তনীয়, অথবা শব্দটিকে তাঁরা সমকালীন বুর্জোয়া অর্থে ব্যবহার করেন। যদি তাঁরা বিশ্বাস করেন যে অর্থটি অপরিবর্তনীয় (invariant) তাহলে লোকে যে স্বাধীনতা নিয়ে বার বার এত বিতর্ক করেছে সেটাই আশ্চর্য। এমন প্রচণ্ড ভুল এই সব বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয়ই করতে পারেন না। স্বাধীনতা বলতে তাঁরা নিশ্চয়ই এমন কিছু বুঝিয়েছেন যা তাঁদের অবস্থায় যাঁরা আছেন তাঁরা অনুভব করেছেন। অর্থাৎ স্বাধীনতা বলতে তাঁরা নিশ্চয়ই এই কথা বুঝিয়েছেন যে সেই সময় তাঁরা যেসব বিধিনিষেধ সহ্য করছেন তার থেকে বেশি কোনও বিধিনিষেধ (restrictions) আরোপিত নেই। এটা পরিষ্কার যে এই অক্সফোর্ড ডনেরা বা সফলকাম লেখকরা যেমন ধরুন ফ্যাসিবাদের বিধিনিষেধ চান না। সেটা স্বাধীনতা নয়। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বর্তমানে তাঁরা মোটামুটি স্বাধীন।

স্বাধীনতার এই প্রত্যয় কিন্তু ভাসাভাসা, কারণ তাঁদের দেশবাসী সকলেই এক অবস্থায় নেই। মনে করা যাক, ক একজন ভালো শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী, উপার্জন স্বচ্ছল, সহৃদয় বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নেই, ইচ্ছা থাকলেও নিজস্ব নৌকা কেনার ক্ষমতা নেই বটে, তবে শীতকালীন খেলাধুলা দেখতে যেতে পারেন। এটাকে তিনি স্বাধীনতা (কম বেশি) মনে করেন। নৌকা কেনার ইচ্ছা তাঁর অপূর্ণই রয়ে গেছে. তা সত্ত্বেও তিনি সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ বা বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কলম ধরতে পারেন। আপাততঃ ধরে নেওয়া যাক, যে ক স্বাধীন। একটু পরেই এই বিবৃতিটি আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করব এবং দেখাব যে সেটি

আংশিক সত্য। কিন্তু আপাততঃ ধরে নেওয়া যাক যে ক স্বাধীনতা ভোগ করছেন।

খ কি স্বাধীন? খ হলেন হাউণ্ডস্‌ডিচের একজন গরীব দোকান-কর্মচারী; তাঁদের ইউনিয়ন নেই। রোজই তাঁকে কাজ করতে হয়। শিল্প, দর্শন বা বিজ্ঞানের কিছুই তিনি জানেন না। গোটা কতক উদ্ভট সংস্কার ছাড়া কোনও সংস্কৃতি তাঁর নেই। স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সে-সব তিনি পেয়েছেন। জাতির শ্রেষ্ঠ হল ইংরেজ, রাজার প্রজা ও প্রজাদের প্রতি তাঁর সস্নেহ করুণা, ঈশ্বর, শয়তান, নরক ও পাপের প্রকৃত অস্তিত্ব এবং বিবাহ দ্বারা সিদ্ধ না হলে যৌন সংগম করাটা খারাপ কাজ—এই সব তিনি বিশ্বাস করেন। দুনিয়া সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান নিউজ অব দা ওয়ার্লড পত্রিকা থেকে পাওয়া। অন্য দিন কাগজ পড়ার সময় তাঁর থাকে না। মৃত্যুর পর তিনি (বরাত ভালো থাকলে) অনন্ত শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করবেন একথা তিনি বিশ্বাস করেন। বর্তমানে অবশ্য তাঁর সব থেকে বড় আতঙ্ক হল কোনও ছোটখাটো ব্যাপারে মালিক যদি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হন তাহলেই তাঁর চাকরিটি যাবে।

খ-এর সমস্যা স্পষ্টতঃই স্বাধীনতা চর্চার মত অবসরের অভাব। গ'এর এসব সমস্যা নেই। তিনি একজন মাঝবয়সী বেকার মানুষ। সারা দিনই তিনি স্বাধীন। রাস্তায়, পার্কে, মিউজিয়ামে যেখানে খুশি যাওয়ার স্বাধীনতা তাঁর আছে। যে কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তা করার স্বাধীনতা তাঁর আছে—আইনস্টাইনের তত্ত্ব, শ্রেণী সম্বন্ধে ফ্রেজের (Frege) সংজ্ঞা বা আদি পাপ থেকে মুক্ত-গর্ভসঞ্চার তত্ত্ব (doctrine of the Immaculate Conception)। পরিতাপের কথা এসব কিছুই তিনি করেন না। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করেন। স্ত্রী তাঁকে বলেন অপদার্থ। ছেলেদের সঙ্গে তিনি কলহ করেন, সঙ্গতি-পরীক্ষার (Means Test) নিয়ম অনুযায়ী তাঁর খাজনা তাদের মেটাতে হয়। পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে তিনি কলহ করেন, কারণ তিনি যে আনন্দভোগ করতে পারেন না তাঁরা তা পারেন। সৌভাগ্যক্রমে নিজের অস্তিত্বটুকু মুছে ফেলার স্বাধীনতা তাঁর আছে, এবং যে কোন বিকালবেলা যখন তাঁর স্ত্রী বাড়ি থাকবেন না এবং গ্যাসমিটারে যথেষ্ট পয়সা দেওয়া থাকবে তখন সেটাই তিনি করবেন।

ক স্বাধীন। খ এবং গ কি স্বাধীন? ধরে নিলাম যে ক বলবেন: না, খ ও গ স্বাধীন নয়। ক যদি জোর দিয়ে বলেন যে খ ও গ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেন, আমরা বেশির ভাগ লোকই তাহলে আর সংজ্ঞা না দিয়ে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে ক-এর ধারণা সম্পর্কে কি ভাবতে হবে তা বুঝতে পারি। কিন্তু কোনও ওয়েলস, ফর্স্টার

বা রাসেল নিঃসন্দেহে আমাদেরই মত প্রবলভাবে এ বিষয়ে একমত হবেন যে এটা স্বাধীনতা নয়, এ হল পরিবেশের হীন দাসত্ব। তিনি বলবেন খ ও গ কে স্বাধীন করতে হলে তাদের ক'এর স্তরে, ধরা যাক অক্সফোর্ড ডনের স্তরে, অবশ্যই উন্নীত করতে হবে আমাদের। অক্সফোর্ড ডনের মত খ ও গ-এর অবসর ও মোটামুটি রোজগার থাকতে হবে, যাতে করে জগতের ভালো ভালো জিনিস ও ভালো ভালো ধ্যানধ্যারণাগুলিকে উপভোগ করা যায়।

কিন্তু এটা সম্ভবপর করা যাবে কি করে ? এখন আমাদের যা রয়েছে তা হল বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক। একথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, এই সম্পর্কগুলির গতিশীল উদ্দেশ্য (dynamic motive) হল ব্যক্তিগত মুনাফা। এক্ষেত্রে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও মার্ক্সবাদীরা একমত। তাছাড়া, কাযকারণতার যদি কোনও অর্থ থাকে এবং যাবতীয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলিকে যদি জলাঞ্জলি দিতে না হয়, তাহলে বর্তমান অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি এবং খ ও গ-এর স্বাধীনতাহীনতা কার্য-কারণগতভাবে পরস্পর সম্পর্কিত হতেই হবে।

তাহলে আমরা একদিকে পাচ্ছি বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি এবং অপরদিকে কার্য ও কারণ হিসাবে পরস্পর সম্পর্কিত এই বিভিন্ন মাত্রার স্বাধীনতাহীনতা—ক, খ ও গ। এই পর্যন্ত এদের যে কোন একটি কারণ হতে পারে, যেহেতু আমরা এখনও স্থির করিনি মানসিক অবস্থা সামাজিক সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন না বিপরীতটা। কিন্তু যেই প্রশ্ন তুলব ক্রিয়া (action) কিভাবে সমস্যাটির সমাধান করবে, তখনই দেখতে পাব কোনটা মুখ্য (primary)। বক্তৃতা ও চিত্রশালার সাহায্যে খকে দর্শন বোঝাবার বা বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পকলা দেখবার সুযোগ দিয়ে কোনও লাভ নেই। কাজ-কর্ম সুরু করার আগে সে-সব সম্পর্কে রুচি গড়ে তোলার মত কোনও সময় তার নেই, বা কাজকর্ম করতে সুরু করার পর সেই রুচি তৃপ্ত করার মত সময় তার নেই। আবার গ'এর-ও বুর্জোয়া সংস্কৃতিসম্ভার উপভোগ করার স্বাধীনতা নেই যতক্ষণ তার অর্থনৈতিক অবস্থান তার সমগ্র অস্তিত্বকে মেঘাচ্ছন্ন করে রাখছে। অর্থাৎ, পরিবেশ চেতনাকে বন্দী করে রাখছে, বিপরীতটা নয়। খ ও গ আলোকপ্রাপ্ত নয় বলেই যে তারা শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তা নয় ; শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেই তাদের আলোকপ্রাপ্তি ঘটেনি। এবং রাসেল, যিনি 'আলস্যের প্রশংসায়' (In Praise of Idleness) কলম ধরেছেন, সঠিকভাবেই প্রশংসা করেছেন, যেহেতু তিনি আলস্যভোগী সেই কারণেই তিনি চালাক-চতুর (clever), চালাক-চতুর হওয়ার কারণেই যে তিনি আলস্যভোগী ও বুর্জোয়া, তা নয়।

এইবার আমরা পরিস্থিতির কারণ ও পরিণতি দেখতে পেলাম। এটা আমরা

দেখলাম যে এই স্বাধীনতা বা স্বাধীনতাহীনতা বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করছে না, বরং এটাই দেখলাম যে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কও একইভাবে এই দুই বিপরীতের সৃষ্টি করে, অলস বুর্জোয়ার স্বাধীনতা এবং সর্বহারা শ্রমিকের স্বাধীনতাহীনতা। এটা সুস্পষ্ট যে এই পরিণতিকে, যদি তা অবাঞ্ছনীয় হয়, কারণটির পরিবর্তন ঘটিয়ে তবেই মাত্র পরিবর্তিত করা যায়।

অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীর সামনে এখন সেইরকম আর একটি সমস্যা দেখা দিল যেরকম দেখা গিয়েছিল যখন যে স্বাধীনতাকে তিনি সমকালীন বলে গণ্য করেন সেই স্বাধীনতাকে ভোগ করছেন, তার সংজ্ঞা আরও সুস্পষ্টভাবে তাঁকে দিতে হয়েছিল। বন্দীত্ব ও স্বাধীনতা, দুর্দশা ও সুখ, এই দুই অবস্থা চিরকাল বজায় থাক, এটাই কি তিনি চান? যে কারণের জন্য শ্রমিকদের স্বাধীনতাহীনতা, সেই একই কারণ দ্বারা পুষ্ট স্বাধীনতা কি তিনি উপভোগ করতে পারেন? কারণ, যদি তা না হয়, তাঁকে তাহলে আরও এগিয়ে যেতে হবে এবং বলতে হবে, 'বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলিকে পরিবর্তিত করতেই হবে।' পরিবর্তিত সেগুলি হবেও, আর সেটা যে ঘটবে তার কারণও এই যে, সেগুলি আরও বেশি বেশি করে এই স্বাধীনতাহীনতারই জন্ম দিচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিজীবীকে আজ অবশ্যই এটা স্থির করতে হবে যে, যে সামাজিক শক্তিগুলি পরিবর্তন চাইছে, তাঁর ইচ্ছাও তার অংশ হবে, না বৃথাই সেগুলির বিরোধিতা করবে।

কিন্তু বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত করা যাবে কিভাবে? কেবলমাত্র ইচ্ছার শক্তিতেই ত হবে না: কারণ আমরা দেখছি যে সামাজিক সম্পর্কই মনকে গড়ে, বিপরীতটা হয় না। বস্তু হল গুণাত্মক মতাদর্শের পরিমানগত ভিত্তি। সেই বস্তুকেই পরিবর্তিত করতে হবে। কেবলমাত্র তর্ক করা আর বোঝাতে পারাটাই যথেষ্ট নয়। কাজ করতেই হবে। পরিবেশকে পাল্টাতেই হবে।

কিভাবে সেটা হবে, বিজ্ঞান তার পথ দেখিয়েছে। চিন্তনের সাহায্যপুষ্ট ক্রিয়ার দ্বারা, বাস্তবের ভৌত নিয়মগুলির সদ্ব্যবহার দ্বারা আমাদের চাহিদাগুলি আমরা সর্বদা পূরণ করি, কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা নয়, সেগুলি সত্তালাভ করুক কেবল এই ইচ্ছা করার দ্বারাই নয়। আমরা পাহাড় টলাই। কেবল আকাঙ্ক্ষার গতিতেই সেটা কিন্তু হয় না; সেটা এই জন্যই পারি যে গতিবিদ্যা, উদকবিদ্যা এবং বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর (Kinetics, hydraulics and electrical engineering) কঠোরভাবে নির্ধারিত নিয়মগুলিকে আমরা বুঝি এবং সেগুলির দ্বারা আমাদের কর্মকে পথনির্দেশ করতে পারি। বাস্তবের নিয়মগুলিকে মেনে চলেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি—অর্থাৎ, আমাদের ইচ্ছাকে পূর্ণ করি। এই সব

নিয়মগুলি পালন করা সহজ ; সেগুলি আবিষ্কার করাটাই শক্ত, আর সেটাই হল বিজ্ঞানের কাজ।

অর্থাৎ, স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেওয়ার কাজটা আরও শক্ত হয়ে গেল। এমন কি স্বাধীনতার একটা সমকালীন সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করাও অত সোজা নয়। বুদ্ধিজীবীকে ইতোমধ্যে যে কেবল বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি পরিবর্তিত করার সিদ্ধান্তই নিতে হবে তাই নয়, সমাজের গতির নিয়মগুলিও এখন তাকে খুঁজে বার করতেই হবে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলিকে একটা কার্যকারণগত ছকে খাপ খাওয়াতে হবে। স্বাধীন হতে চাওয়াটাই যথেষ্ট নয়, জানাও আবশ্যক।

সামাজিক সম্পর্কগুলির গতিবিষয়ক নিয়মের বিজ্ঞানাভিত্তিক বিশ্লেষণ মাত্র একটিই রয়েছে, তা হল মার্ক্সবাদী বিশ্লেষণ। সামাজিক সত্তার বস্তুগত স্তরে পুঁজির, বস্তুর, সামগ্রীর (stuff) পরিমাণগত চলন কিভাবে, ভৌত দিক থেকে, সমাজের কার্যকারণগত ভবিষ্যৎ-নির্দেশক (predictive) ভিত্তি গড়ে তোলে, এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্য দিয়ে মন, ইচ্ছা ও মতাদর্শের গুণগত পরিবর্তনে তা পর্যবসিত হয়, এটা বুঝতে হলে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীকে মার্ক্স, এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিন ও বুখারিনের রচনার সঙ্গে পরিচয় গড়ার কথা বলার প্রয়োজন। ধরা যাক সেই পরিচয় তিনি এখন গড়ে তুলেছেন এবং স্বাধীনতার দুঃসাধ্য সন্ধানপ্রয়াসে আবার ফিরে এসেছেন।

সমাজের কার্যকারণগত প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যয় এখন তাঁকে এইটা উপলব্ধি করতে সক্ষম করবে যে যন্ত্ররূপে বস্তুকে দিয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করানোর কাজটা যেমন বাস্তবের দ্বারা কঠোরভাবে সাপেক্ষীভূত, সামাজক সম্পর্কগুলিকে দিয়ে স্বাধীনতা সৃষ্টি করানোর কাজটাও বাস্তবের দ্বারা সেইরকম কঠোরভাবেই সাপেক্ষীভূত। যাবতীয় বস্তু—যন্ত্রপাতি, পুঁজি, মানুষ—এবং সমাজে এগুলি যেসব সম্পর্ক প্রকাশ করে তা—কেবল কার্যকারণের নিয়ম অনুসারেই চলতে পারে। এর সঙ্গে যেটা প্রথমেই জড়িত তা হল এই যে, পুরাতন সম্পর্কগুলিকে ভেঙে ফেলতেই হবে, ঠিক যেমন সম্পূর্ণ নতুন করে কোনও বাড়িকে তৈরি করতে হলে পুরাতন বাড়িটাকে ভেঙে ফেলতে হয়, এবং উৎক্রান্তিটাও, টেনে তোলা এবং গেঁথে বসানোর কাজটাও, কয়েকটি নিয়ম অনুসারেই হয়। প্রথমেই ভিৎটা টেনে তুলতে পারি না, বা দেওয়াল গড়ার আগেই ছাদ করতে পারি না।

মানুষ এবং পুঁজি, যন্ত্রপাতি ও বস্তুসামগ্রীর, সামাজিক সম্পর্কগুলির যা মধ্যস্থতা করে, মধ্যকার যাবতীয় সংযোগসূত্রের পরিবর্তন এই উৎক্রান্তি পর্যায়ের সঙ্গে জড়িত। এগুলি আর স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে—বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে—সংযুক্ত

থাকলে চলবে না, সমাজের সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে সেগুলি সংযুক্ত হতে হবে। এই পরিবর্তন কেবলমাত্র মালিকানার পরিবর্তন নয়; কারণ এর সঙ্গে এটাও জড়িত যে কাজ না করে কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি মালিকানা থেকে মুনাফা করতে পারবে না। বাজারের সামগ্রীগুলি বাজারে পাক খেয়ে যেতে—মুনাফার চলন—বাধ্য থাকবে না, সেগুলি উপযোগের কাজে লাগবে—উপযোগের (use) চলন। তাছাড়া, এর সঙ্গে এটাও জড়িত, যে ব্যক্তিগত মুনাফার সম্পর্কগুলির উপর নির্ভরশীল যাবতীয় দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে—আইন, গির্জা, আমলাতন্ত্র, বিচার-ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, পুলিস, শিক্ষা—অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে, এবং নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। বুর্জোয়ারা একাজ করতে অক্ষম; কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলির—ব্যক্তিগত সম্পত্তি (সচ্ছল আয়), আইন, বিশ্ববিদ্যালয়, সিভিল সার্ভিস, বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থান ইত্যাদির মাধ্যমেই তারা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে। এই সম্পর্কগুলিকে, যেগুলির উপর তাদের স্বাধীনতা এবং শ্রমিকদের স্বাধীনতাহীনতা নির্ভর করে বলে আমরা আগে দেখেছি, তারা ধ্বংস করবে এই আশা করার অর্থ হল বন্দীত্ব বরণ করতে তাদের বলা। এটা তারা করবে না, যেহেতু সমস্ত মানুষই যা চায় তা হল স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীনতাহীনদের কাছে, সর্বহারাদের কাছে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত। যেদিন তারা স্বাধীনতার সন্ধানে যাবে সেদিনই তারা বিদ্রোহ করবে। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে গিয়ে বুর্জোয়াকে স্বভাবতঃই অ-বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিরোধিতা করতে হবে; তারাও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। ঘটনাক্রমে এই সংগ্রামের পরিণতি যা হবে তা এই কারণেই হবে যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি যতই অগ্রসর হয় ততই যে শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার অধিকারী সেই শ্রেণী ক্রমেই আরও সংকুচিত হয়ে পড়ে। শেষ অবধি এক দিন আসে যখন বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, পেটি-বুর্জোয়া, কেরানী, ও কৃষক সকলেই উপলব্ধি করে যে তারাও শেষ পর্যন্ত স্বাধীন নয়। এবং তারা দেখতে পায় যে সর্বহারার লড়াই তাদেরও লড়াই।

সর্বহারার কাছে যা স্বাধীনতা—যেসব বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্ক তাদের বন্দী করে রেখেছে সেগুলির বিলোপসাধন—তা স্বভাবতঃই বুর্জোয়ার কাছে বাধ্যবাধকতা ও বিধিনিষেধ, ঠিক যেমন পুরাতন বুর্জোয়া স্বাধীনতা শ্রমিকের জন্য স্বাধীনতাহীনতার জন্ম দিয়েছিল। স্বাধীনতার এই দুই ধারণার মধ্যে সমঝোতা অসম্ভব। সর্বহারা যদি একবার ক্ষমতায় আসে, তাহলে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমস্ত প্রচেষ্টার অর্থ হবে সর্বহারার স্বাধীনতার উপর আক্রমণ, এবং সেইজন্যই মানুষ তাদের স্বাধীনতার উপর সমস্ত রকমের আক্রমণকে যে রকম তীব্রভাবে প্রতিহত করে, সেগুলিও সেইভাবে প্রতিহত হবে। সর্বহারার একনায়কত্বের এই হল

অর্থ ; এবং যে বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রের বিবর্তনের পথে বুর্জোয়ার স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য তারা যে সেন্সর প্রথা, মতাদর্শগত রুক্ষতা এবং অন্যান্য সমস্ত কায়দা-কৌশলের বিকাশ ঘটিয়েছিল, সর্বহারার একনায়কত্বে সেগুলিও যে কেন বর্তমান থাকে তার কারণও এই।

অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্থক্য অবশ্য আছে। বুর্জোয়ার স্বাধীনতা এবং সর্বহারার স্বাধীনতাহীনতা-সৃষ্টিকারী বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি তাদের অস্তিত্বের জন্য স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাহীনতা দুয়েরই অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। শ্রমিকের শ্রম বিনা বুর্জোয়া তার আলস্য উপভোগ করতে পারে না ; আবার বুর্জোয়ার বলপ্রয়োগকারী পথনির্দেশ ও নেতৃত্ব বিনা শ্রমিকও বুর্জোয়া সম্পর্কের মধ্যে থাকতে পারে না। এইভাবে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতা বহুর স্বাধীনতাহীনতার উপর গড়ে ওঠে। দুটি সম্প্রদায় চিরকালের বিরোধী। কিন্তু বুর্জোয়াকে অধিকারচ্যুত করার পর, সম্পত্তিচ্যুত এবং সেইকারণে স্বাধীনতাহীন বুর্জোয়া, আর উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত এবং সেইকারণে স্বাধীন সর্বহারার মধ্যকার বিরোধিতা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কারণ উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকরা সেই উপায়গুলির শ্রমিকও হওয়ায় ফলে, অধিকারচ্যুত কোনও শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রয়োজন আর তাদের থাকে না। সেইকারণে উৎক্রান্তি যখন সম্পূর্ণ হয় এবং বুর্জোয়া শ্রেণী হয় অঙ্গীভূত হয়ে যায়, না হয় নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন আর স্বাধীনতাহীন, বশীভূত (compelled) কোনও শ্রেণী থাকে না। উৎক্রান্তির পরে শ্রেণীহীন সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের 'মিলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া' ('withering away') বলতে এই কথাই বোঝায়। আজকের রাশিয়াতে সেটাই ঘটছে।

সোজা করে বলতে গেলে, এ হল সেই কার্যকারণ প্রক্রিয়া যার দ্বারা সামান্য একটুখানি স্বাধীনতার বিপরীত মেরু হিসাবে প্রচুর পরিমাণ স্বাধীনতার সৃষ্টি না ক'রে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক নতুন সামাজিক সম্পর্কে পরিবর্তিত হতে পাবে। আমরা ইচ্ছা করেই এটা সরলভাবে হাজির করেছি। মার্ক্সের মত করে বিস্তৃত আলোচনা করলে এই প্রক্রিয়ার তরল পরস্পরভেদী (fluid interpenetrating) প্রকৃতি আরও স্পষ্ট হবে ; স্পষ্ট হয়ে উঠবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি কিভাবে নিজেই সেটা ডেকে আনে, দেখা যাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি স্থিরভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বরং অবিরাম আরও বেশি বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠতে থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের জন্ম দেয়। মানুষ চিরকাল এটা সহ্য করে যাবে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতর নগদমূল্যের সম্পর্ক ডেকে আনে যাতে মানুষের মন ঘৃণায় ভরে যায় এবং একদিন তা গোটা ব্যবস্থাটার প্রতিই ঘৃণা হয়ে উঠবে। আর

এই সব দৌরাত্মকে, বিদ্রোহের কারণকে পুঁজিবাদ যতই জিইয়ে রাখে, ততই তা সর্বহারাদের ঐক্যবদ্ধ ক'রে তাকে যোগায় বিদ্রোহ সাধনের উপায়। তারা আরও বেশি সচেতন ও সংগঠিত হয়, যাতে বিদ্রোহের সময় যখন উপস্থিত হয় তখন বুর্জোয়া সম্পত্তির প্রশাসনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়ার মত সংহতি ও কার্যনির্বাহী যোগ্যতা দুই-ই তাদের থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্ক এটাও প্রকাশ করে দেয় যে তাদের স্বাধীনতাটাও প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, বুর্জোয়া স্বাধীনতা যারা ভোগ করছে তারাও অনেকটা শ্রমিকদের স্বাধীনতাহীনতার মতই বন্দীদশা ভোগ করে। আর এইভাবে সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়ারা নিজেদের দেখতে পায় না। তাদের নিজেদের মধ্যেই নানা ভাগ; প্রথমে অল্প কয়েকটি, পরে সেই সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিপ্লব তখনই ঘটে যখন সর্বহারা শ্রেণী বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দ্বারা সহযোগিতা করার মত যথেষ্ট সংগঠিত হয়, তাদের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতাহীনতার দ্বারা নিষ্পিষ্ট হয়ে যে কোনও মূল্যে এক নতুন দুনিয়ার দাবি করতে পারে; এবং যখন, অপর দিক থেকে, পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বগুলির পরিণতি হিসাবে বুর্জোয়ারা নিজেরাই তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

অতএব, আরও গভীরে গিয়ে বুর্জোয়া স্বাধীনতার যথার্থ প্রকৃতিটা আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাক। আচ্ছা বলুন ত পাঠক মহাশয়, এচ. জি. ওয়েলস, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, ই. এম. ফরস্টার, আপনি এবং আমি কি সত্যই স্বাধীন? এমন কি মানসিক স্বাধীনতাও কি আমরা ভোগ করি? কারণ সেটা যদি আমরা ভোগ না করি তাহলে দৈহিক স্বাধীনতাও আমরা নিশ্চয়ই ভোগ করি না।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল একজন দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন এবং চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে চিন্তাগুলি বস্তুর বিশেষ বিন্যাস (arrangement) মাত্র, যদিও বস্তুকে তিনি মন-সামগ্রী (mind-stuff) বলেছেন। এ বিষয়ে তিনি একমত যে প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়ার (psychism) সঙ্গে একটি স্নায়ু-ক্রিয়ার (neurism) সাযুজ্য থাকে, এবং জীবন একটা বিশেষ রাসায়নিক প্রতিভাস, ঠিক যেমন চিন্তা হল একটা বিশেষ জৈব প্রতিভাস (biological phenomenon)। প্রকৃত্যাপুর (entelechies) এবং বিশুদ্ধ স্মৃতির আজগুবি তত্ত্বের ফাঁদে তিনি পড়েননি।

তাহলে স্বাধীনতার প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এই বিধেয়গুলিকে (categories) প্রয়োগ করা থেকে তিনি কেন বিরত থাকছেন? অন্তত্র সব ক্ষেত্রেই ত' তা

ব্যবহার হচ্ছে। মানুষ যে সম্পূর্ণ স্বাধীন একথা তাহলে কোন্ অর্থে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন? স্বাধীনতা শব্দটির কোন্ অর্থ তিনি গ্রহণ করছেন? প্রাণ-শক্তি, প্রকৃত্যাপুর বা আদি কারণ (Life Force, entelechy, or the first cause) ইত্যাদির রূপে ঈশ্বরকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিয়ে আসার ভাববাদী গোঁজামিলকে তিনি সঠিকভাবেই হাতসাফাই বলে ধরেছেন। কিন্তু তাঁর স্বাধীনতা এক ধরনের ঈশ্বর; সেটা এমন একটা জিনিস যা তিনি বিশ্বাস থেকে গ্রহণ করেছেন; বিশ্বের ব্যাপারে যেভাবে হোক সেটা হস্তক্ষেপ করছে এবং কার্যকারণের (causality) সঙ্গে সেটা সংস্রবহীন। রাসেলের স্বাধীনতা এবং তাঁর দর্শন দুই ভিন্ন জগতের সামগ্রী। ঈশ্বরতত্ত্বের (theology) সঙ্গে বিজ্ঞানের মোকাবিলা করিয়ে তিনি দেখেছেন যে ঈশ্বরতত্ত্ব একটা বর্বর যুগের স্মৃতির অবশেষ। কিন্তু শেষ সমন্বয়ের কাজটি তিনি করেননি। একটি উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, যার স্বচ্ছল উপার্জন আছে, রীতিমত বুদ্ধিসুদ্ধি ও অবসর আছে তিনি প্রকৃত স্বাধীন, এই বিশ্বাস সম্পর্কে বিজ্ঞানের মতামত কিন্তু তিনি চাননি।

প্রশ্ন এই নয় যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা একটা রহস্যময় ভাবে বর্তমান কি না। কারণ সমস্যাটা যদি তাই হত, তাহলে সব মানুষেরই স্বাধীন ইচ্ছা হয় থাকত, নয় থাকত না, এবং সেই কারণে সব মানুষেরই স্বাধীনতা হয় থাকত, নয়ত থাকত না। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা থাক লেই যদি স্বাধানতা থাকা হয়, এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছেও, তাহলে ফ্যাসবাদী বা সর্বহারাপন্থী যে কোনও সরকারের আমলেই আমরা বুর্জোয়া সরকারের অধীনে যেমন স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করতে পারি সেই ভাবেই ইচ্ছা করতে পারি, কিন্তু সকলেই একথা স্বীকার করবেন যে স্বাধীনতার বিভিন্ন মাত্রা আছে। স্বাধীনতাব এই তারতম্য তাহলে কি জন্য হয়?

স্বাধীনতা তাহলে যদিও স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তা সত্ত্বেও ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কি বোঝায় সেটা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে স্বাধীনতা কি তা বুঝতে সেটা আমাদের সাহায্য করবে। স্বাধীন ইচ্ছা বলতে এই বোঝায় যে, যে উদ্দেশ্য মানুষের কর্মকে চালনা করে সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মানুষ সচেতন। পূর্বগামী উদ্দেশ্য (antecedent motive) সম্বন্ধে এই সচেতনতা বিনা স্বাধীন ইচ্ছা বলতে কিছু নেই। আমাকে যখন কেউ ঘুসি মারতে আসে আমি তখন হাতটা তুলি। ঘুসিটা আমার কর্মকে চালিত করে; যাই হোক না কেন, আমি যে ঘুসিটা প্রতিহত করতে চাই সে সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম, আমি ঐরকম কাজ করতে ইচ্ছা করেছিলাম। আমার ইচ্ছাটা স্বাধীন ছিল; ওটা হল আমার ইচ্ছাকৃত কর্ম। একটা হেতু তার ছিল; কিন্তু একটা স্বাধীন ইচ্ছন ক্রিয়া (free volition) যে

রয়েছে সে সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। এবং হেতুটির সম্পর্কে, ঘুসিটার সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম।

ঘুমের ভিতর পায়ের চেটোতে প্ল্যাণ্টার প্রতিবর্ত (Plantar reflex) সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই ধরনের কাজকে আমরা ইচ্ছানিরপেক্ষ (involuntary) বলি। বাইরের উদ্দীপকের কারণে যেমন প্রতিহত করার অঙ্গসঞ্চালন দেখা দিয়েছিল, সেইরকম পা'টাও বেঁকে গেল। যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় কাজটাকে আমরা স্বাধীনতাহীন, ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বলে বিবেচনা করি। কোনও সচেতন উদ্দেশ্য তার পিছনে ছিল না। আমাদের কর্মের হেতু সম্পর্কেও আমরা সচেতন ছিলাম না। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে স্বাধীন ইচ্ছা ততটাই আছে যতটা আমরা আমাদের মনের মধ্যে একটা পূর্বগামী উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন। এটিকেই কর্মের অব্যবহিত হেতু বলে মনে করা হয় এই উদ্দেশ্য, বা ইচ্ছাকৃত কর্ম, নিজেই স্বাধীন এবং বলপ্রযুক্ত যদি না হয় আমরাও তাহলে সেক্ষেত্রে যে পূর্বগামী উদ্দেশ্য তাকে সৃষ্টি করেছিল তার সম্বন্ধে অবশ্যই সচেতন হব। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছা কার্যকারণতার বিপরীত নয়; বরং, বিপরীতভাবে এটা কার্যকারণতারই এক বিশেষ ও পরবর্তী দিক (aspect), তা হল কার্যকারণতা সম্বন্ধে সচেতনতা। সেই কারণে মানুষ তার বাইরের সমস্ত কিছু ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবেই একটা কার্যকারণগত চৌহদ্দির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়; কারণ সে নিজের মধ্যেই কার্যকারণতা সম্বন্ধে সচেতন। অন্যথায়, মানুষ যদি স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে কেবলমাত্র কার্যকারণহীনতা উপলব্ধি ক'রে, ধরে নিত যে অন্য সব জিনিস কার্যকারণতা দ্বারাই যুক্ত, আর সে তাই করেও থাকে, তাহলে সেটা একটা রহস্যজনক ব্যাপার হয়ে পড়ত। অবশ্য সে যদি কেবল এইটুকু ধরে নেয় যে, সে যেসব নিয়ম মেনে চলে অন্যান্য বস্তুও সেই একই নিয়ম মেনে চলে, তাহলে বাস্তবের একটা চিন্তনবিষয়ক চৌহদ্দিকাঠামো (cognitive framework) হিসাবে কার্যকারণতার উৎপত্তি ও সাফল্যকে ব্যাখ্যা করা যায়।

অর্থাৎ কার্যকারণতা আর স্বাধীনতা পরস্পরের এক একটি দিক (aspects)। স্বাধীনতা হল প্রয়োজন সম্পর্কে চেতনা। সামগ্রিকভাবে বিশ্ব সম্পূর্ণ স্বাধীন; কারণ যা স্বাধীন নয়, তা তার বহিঃস্থ অন্য কোনও বস্তুর দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু সমস্ত জিনিসই, সংজ্ঞা অনুসারে, বিশ্বের মধ্যে ধৃত; সুতরাং বিশ্ব নিজে ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারা নির্ধারিত নয়। কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি স্বতন্ত্র জিনিস অন্য জিনিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কারণ বিশ্ব বস্তুগত। বিশ্বের সংজ্ঞাতে এই বস্তুত্ব 'প্রদত্ত' 'given' নয়, কিন্তু বিজ্ঞান যখন জগৎকে সক্রিয়ভাবে এবং ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করে তখন ঠিক সেইটাই সে প্রতিষ্ঠিত করে।

অর্থাৎ, একমাত্র অনপেক্ষ সত্যের মত, একমাত্র অনপেক্ষ (absolute) স্বাধীনতা হল বিশ্ব স্বয়ং। কিন্তু বিশ্বের অংশগুলির বিভিন্ন মাত্রার স্বাধীনতা আছে, সেটা থাকে তাদের আত্মনির্ধারণের মাত্রা অনুযায়ী। আত্মনির্ধারণের ক্ষেত্রে হেতুগুলি জিনিসটির অভ্যন্তরে থাকে; এইভাবে, স্বাধীন ইচ্ছার সংবেদনের (sensation) ক্ষেত্রে, ব্যক্তির সচেতন চিন্তাই হল কোনও কর্মের পূর্বগামী হেতু (antecedent cause), এবং যেহেতু কর্মটিও সেই ব্যক্তিরই কর্ম, সেইজন্য আমরা স্বাধীনতার কথা বলি, কারণ আত্মনির্ধারণ সেখানে বর্তমান।

স্বাধীন ইচ্ছার স্বাধীনতা একমাত্র আপেক্ষিকই হতে পারে। অধিকতর সাম্প্রতিক কালে উদ্ভূত বিধেয়গুলির বৈশিষ্ট্যই হল এই যে সেগুলি অধিকতর স্বাধীনতা ধারণ করে। যে বস্তু দিয়ে মানুষ গঠিত তা বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত বস্তুর সঙ্গে স্থান-কালিক সম্পর্কে রয়েছে এবং স্থানে ও কালে তার অবস্থান অতি সামান্য মাত্রায় মাত্র আত্মনির্ধারিত। মানুষের প্রত্যক্ষ অবশ্য বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে স্বল্পতর মাত্রায় সম্পর্কিত; এটা অধিকতর অসম্পৃক্ত ধরনের একটা প্রত্যক্ষ যা অল্প যে দেখতে পায় সেটা মানুষের অব্যবহিত নৈকট্যে নয়, বা যাতে তার আগ্রহ নেই সেই ক্ষেত্রে নয়; এবং এটা স্মৃতির দ্বারা, অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ হেতুর দ্বারা খুব বেশি করে আকার পায়। এতএব এটা প্রাণহীন বস্তুর স্থান-কালিক সম্পর্কগুলির তুলনায় অধিকতর স্বাধীন, অধিকতর আত্ম-নির্ধারিত। মানুষের চেতনা আরও অনেক বেশি আত্ম-নির্ধারিত, বিশেষতঃ সচেতন ইচ্ছনের মত তার পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে।

মানুষ নিয়তই মনে করে যে সে যতটা স্বাধীন তার থেকেও সে বুঝি বেশি স্বাধীন। ফ্রয়েডীয় গবেষণা সম্প্রতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে সত্তার স্তরের ঘটনাগুলি—অর্থাৎ অচেতন শারীরবৃত্তগত ঘটনাগুলি—এমন সব ব্যাঘাতের সৃষ্টি করতে পারে যেগুলি সচেতন ক্রিয়াগুলিকে হরণ করে নেয়। সেইরকম পরিস্থিতিতে কোনও ব্যক্তি তার কর্মের উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে সচেতন না হতে পারে, যদিও সে বিশ্বাস করে যে সে সচেতন। সেই কারণে সে স্বাধীনতাহীন, কারণ তার ইচ্ছার নির্ধারণ তার চেতনার বহিঃস্থ ঘটনাবলী থেকে উদ্ভূত হয়। স্নায়ুরোগী বা নিউরোটিক হল এর উদাহরণ। নিউরোটিক ব্যক্তি স্বাধীনতাহীন। আত্মনির্ধারণ ক্ষমতা অর্জন করার দ্বারা, অর্থাৎ যেসব উদ্দেশ্যগুলি পূর্বে অচেতন ছিল সেগুলিকে সচেতন করার দ্বারা সে স্বাধীনতা অর্জন করে। এইভাবে সে হয়ে ওঠে তার আত্মার পরিচালক। যেসব বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে এই জ্ঞান আয়ত্ত হয় তার যৌক্তিকতা নিয়ে, বা ফ্রয়েডীয় প্রতীকতত্ত্বকে আমরা স্নায়ুরোগতত্ত্বগত (neurological) অর্থ আরোপ করব তা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করছি না। ফ্রয়েডীয় আরোগ্য-

পদ্ধতির এই মূলগত অঙ্গীকারের সঙ্গে আমি একমত যে, চেতনার বিস্তৃতির সাহায্যে বা অন্য কথায় বলতে গেলে জ্ঞানের বৃদ্ধির দ্বারা, মানুষ সর্বদা অধিকতর স্বাধীনতা, অধিকতর আত্ম-নির্ধারণ আয়ত্ত করে। নিজের মনের ক্ষেত্রে মানুষ তার মনের কার্যকারণতা সম্পর্কে এবং তার ক্রিয়ার আবশ্যকীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান আয়ত্ত করার দ্বারা অধিকতর স্বাধীনতা লাভ করে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে স্বাধীনতা হল নির্বন্ধতার (determinism) একটা বিশেষ রূপ, যাকে বলে সেটির সম্পর্কে সচেতনতা।

কিন্তু মানুষ তার মনের কার্যকারণতাকে বোঝার জন্য কেবল বসে বসে নিজের মন সম্বন্ধে শুধু চিন্তা করতে পারে না। তার দেহ এবং সেইভাবে তার মনও বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে নিয়ত বিপাকগত metabolic) সম্পর্কে সম্পর্কিত। ফলে, কোন কার্যকারণগত মানসিক পরম্পরাকে, তার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উদ্দেশ্যে, অনুধাবন করতে চাই, তখন বহির্জগতের ঘটনাবলীর সঙ্গে তা অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংমিশ্রিত বলে দেখতে পাই। প্রাথমিক স্তরে আমরা দেখি যে বহির্জগতে এবং অভ্যন্তরীণ জগতেও স্বাধীনতার সন্ধান আমাদের করতে হবে। কেবল আমাদের নিজেদের নিয়মগুলি সম্পর্কেই নয়, বহির্জগতের নিয়মগুলির সম্পর্কেও আমাদের সচেতন হতেই হবে। মানুষ সর্বদাই উপলব্ধি করছে যে স্বাধীন ইচ্ছা বলতে যাই বোঝাক না কেন সেটা কেবল মাত্র ইচ্ছা নয়, সেটা বলতে কর্মও বোঝায়, যা স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, আমি একটা প্লাষ্টারের ছাঁচের মধ্যে যেন এমনভাবে নিমজ্জিত যে চোখের পাতাটাও ফেলতে পারি না। তা সত্ত্বেও, আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি কি তাহলে সম্পূর্ণ স্বাধীন? তখন একমাত্র চরম ভাববাদী দার্শনিকেরাই বলতে পারেন যে আমি স্বাধীন। অতএব সুনিশ্চিত করার পক্ষে স্বাধীন ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, আমাদের কর্মগুলিও বিধিনিষেধ-মুক্ত হওয়া চাই। এদিকে প্রত্যেকেই এটা উপলব্ধি করে যে বহিস্থ পরিবেশ আমাদের স্বাধীনতাকে অবিরাম বিধিনিষেধ যুক্ত করছে এবং এটাও উপলব্ধি করে যে স্বাধীন ইচ্ছাকে স্বাধীনতা বলে না, যদি না তা যা ইচ্ছা করে তাই করতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যথার্থ স্বাধীন হতে হলে আমরা যা কিছু করতে স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করি সেটা করতে আমরা সক্ষমও বটে।

কিন্তু এই স্বাধীনতাও আমাদের সেই নির্বন্ধতাতেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কারণ, আমরা দেখতে পাই, এবং এক্ষেত্রেও কোনও দার্শনিকই কখনও দ্বিমত হননি, যে পরিবেশ হল সম্পূর্ণভাবে নির্বন্ধতামূলক। অর্থাৎ, যা কিছু গতি বা প্রতিভাস আমরা দেখি, সর্বদাই তার একটা হেতু থাকে, যেটা নিজে আবার অন্য কোনও

হেতুর জন্যই ঘটছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর একই পরিস্থিতিতে, একই কারণ সর্বদা একই ফল সুনিশ্চিত করছে। এখন এই কঠোর নির্বন্ধতা সম্পর্কে একটা উপলব্ধিই স্বাধীনতার জন্ম দেয়। কারণ বিশ্বের কার্যকারণতাকে যত বেশি বেশি করে আমরা বুঝতে পারি তত বেশি বেশি করেই আমরা স্বাধীনভাবে যেটা ইচ্ছা করি সেটা করতে সক্ষম হই। জলের কার্যকারণতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানই জাহাজ তৈরি করতে এবং সমুদ্র পাড়ি দিতে আমাদের সক্ষম করে। বায়ুর নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আমাদের উড়তে সক্ষম করে, বস্তুসামগ্রীর অমোঘ আচরণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানই আমাদের বাড়ি ও সেতু তৈরী করতে সক্ষম করে, গ্রহদের প্রয়োজনীয় গতিবিধি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানই আমাদের এমনভাবে দিনপঞ্জিকা তৈরী করতে সক্ষম করে যাতে করে আমরা ঠিক সেই সময়েই বীজ বুনি, সমুদ্র যাত্রা করি এবং পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করি, যে সময়টা আমরা যা করতে ইচ্ছা করি সেটা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশি অনুকূল এইভাবে, বহির্জগতেও, নির্বন্ধতা স্বাধীনতার জন্ম দিচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতা বলতে বোঝাচ্ছে প্রয়োজনের একটা বিশেষ রূপ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিষয়ীগত মানসিক প্রতিভাসের কার্যকারণতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা, আর সেই সঙ্গে বহির্জগতের প্রতিভাসের কার্যকারণতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতার সাহায্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। আর আমরা এতে বিস্মিত হই না যে বিষয়গুলির আচরণের বৈশিষ্ট্যটিও—কার্যকারণতাও—চেতনার একটা বৈশিষ্ট্য; কারণ চেতনা নিজের একটা বিষয়ের—দেহের—একটা দিক aspect) মাত্র। এই দ্বৈত উপলব্ধি যতই আমাদের বেশি হয় ততই আমরা বেশি স্বাধীন হই—স্বাধীন ইচ্ছা আর স্বাধীন কর্ম এই দুই-ই তত বেশি আমাদের অধিকারে আসে। স্বাধীন ইচ্ছা বনাম নির্বন্ধতা—এরা পরস্পর অসম্পৃক্ত দুটি জিনিস নয়, বিপরীতভাবে এরা পরস্পরকে সাহায্য করে।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পশুরা মানুষের থেকে বেশি স্বাধীন। তারা আকস্মিক আবেগের দ্বারা তাড়িত, কোন কাজ কেন করছে জানে না, প্রকৃতির আপতিক ঘটনা অন্যান্য পশু, ভৌগলিক দুর্ঘটনা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের অধীন। প্রয়োজনের দাস তারা এবং সেটা এই কারণেই যে সেটার বিষয়ে তারা অচেতন।

তার অর্থ এই নয় যে তাদের কোনও স্বাধীনতা নেই, কারণ একটি মাত্রার স্বাধীনতা থাকে। তাদের পরিবেশের কার্যকারণতা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের থাকে, যেটা বোঝা যায় তাদের স্থান, কাল ও বস্তুর ব্যবহার থেকে—পাখির উড়ে

খাওয়া, খরগোসের লাফ, পিঁপড়ের বাসা। কিছুটা অভ্যন্তরীণ আত্ম-নির্ধারণও তাদের থাকে যেটা তাদের আচরণ থেকে বোঝা যায়। কিন্তু মানুষের তুলনায় তারা স্বাধীনতাহীন।

রাসেল ও ফরস্টারের মত চিন্তাবিদদের ধারণা যে যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। তাদের এই প্রত্যয়ের মধ্যে এই পূর্ব-অনুমানই অন্তর্নিহিত যে পশুরাই হল একমাত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রাণী। নিঃসঙ্গ মাংসাশী প্রাণীকে কিছু করতে কেউ কোন বাধা দেয় না। এটা অবশ্য একটা পুরাতন হেত্বাভাস [fallacy]। এর বিখ্যাত প্রবক্তা হলেন রুশো। মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত। প্রতিষ্ঠান দ্বারা কলুষিত পূর্ণাঙ্গ-শুভবুদ্ধিসম্পন্ন (good) মানুষ সম্পর্কে এক স্বর্ণযুগের এই রূপকথা বুর্জোয়াদের মনে সর্বদাই বর্তমান। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে মানুষ যে কেবলমাত্র সু নয়, তাই নয়; সে কু-ও নয়। সে আদৌ মানুষই নয়; সু-ও নয়, কু-ও নয়; সে এক অচেতন বর্বর।

স্বাধীনতা সম্পর্কে রাসেলের ধারণা হল পশুত্বের অ-দার্শনিকসুলভ ধারণা। নারকোভার স্কুল (Narkover School) মোটের উপর রাসেলের স্বাধীনতার মন্দ উদাহরণ নয়। বাধানিষেধহীন, নিঃসঙ্গ ও কেবলমাত্র স্বীয় সহজপ্রবৃত্তির কাছে দায়ী মানুষই হল রাসেলের স্বাধীন মানুষ। অর্থাৎ পশু থেকে মানুষের কষ্টকর অগ্রগতির কোনওউপকারিতা নেই বলা হল মানুষের যা কিছুকাজ, তার পরিশ্রম, তার যাবতীয় বিপ্লব, সবকিছুই স্বাধীনতা থেকে অনেক তফাতে। একথা যদি সত্য হয় এবং মানুষ যদি বিশ্বাস করে, যেমন আমরা অনেকে করি, রাসেল করেন, যে মানুষের যাবতীয় প্রচেষ্টার মূলগত লক্ষ্য হল স্বাধীনতা, তাহলে সভ্যতাকে পরিত্যাগ করতে হয় এবং আমাদের জঙ্গলে ফিরে যেতে হয়। আমি একজনকমিউনিস্ট, কারণ আমি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। রাসেল ওয়েলস ও ফরস্টারকে আমি সমালোচনা করি, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে তাঁরা স্বাধীনতাহীনতার ধ্বজাধারী।

কিন্তু তাহলে লোকে বলবেন এটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত ব্যক্তিরা যাঁরা চিন্তার, কর্মের ও নৈতিকতার স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করছেন, কি করে তাঁরা স্বাধীনতাহীনতার ধ্বজাধারী হতে পারেন? বেশ, আমাদের বিশ্লেষণটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক, তাহলেই বোঝা যাবে কেন একথা বলছি।

সমাজ একটা সৃষ্টি যার দ্বারা মানুষ পশুর থেকে বেশি পরিমাণ স্বাধীনতা আয়ত্ত করেছে। পশুর থেকে মানুষকে যা গুণগত দিক থেকে বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে পৃথকীভূত করে (differentiates) তা হল এই স্বাধীনতা এবং একমাত্র স্বাধীনতাই। সমাজের

মূলগত বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক উৎপাদন। যে জিনিস মানুষ চায় তা ব্যক্তি মানুষ একা তৈরী করতে পারে না। একা সে স্বাধীনতাহীন। সেই কারণে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারাই সে স্বাধীনতা আয়ত্ত করে। বিজ্ঞান, যার দ্বারা সে বহির্বাস্তব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তা সামাজিক। শিল্প, যার দ্বারা সে তার অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তা হল সামাজিক। অর্থনৈতিক উৎপাদন, যার দ্বারা সে বহির্বাস্তবকে তার নিজের অনুভূতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়, তা হল সামাজিক এবং তার অন্তর্বর্তী স্থানগুলি (interstices) বিজ্ঞান ও শিল্পের জন্য দিয়ে থাকে। সুতরাং মানুষকে যা স্বাধীনতা দেয় তা হল অর্থনৈতিক উৎপাদন। অর্থনৈতিক উৎপাদনের কারণেই মানুষ স্বাধীন, আর পশুরা স্বাধীন নয়। এই ঘটনা থেকেই এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে অর্থনৈতিক উৎপাদন হল কৃষি, অশ্বকে বশ করা, রাস্তা তৈরি গাড়ি তৈরি, আলো, তাপ ও অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিঙের সাহায্যে মানুষের ইচ্ছার সঙ্গে মানিয়ে পরিবেশকে নিজের কাজে ব্যবহার করা; মানুষ যা ইচ্ছা করে সেটা করতে তা মানুষকে সক্ষম করে; এবং সে যা ইচ্ছা করে অন্যান্যদের সাহায্যেই একমাত্র সেটা করতে পারে। রাস্তাঘাট, খাদ্য সরবরাহ, যন্ত্রপাতি, গৃহ ও পোষাক বিনা তার অবস্থা হত সেই প্লাস্টারের ছাঁচে ঘেরা মানুষের মত যে যা খুশি ইচ্ছা করতে সক্ষম, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীন মানুষ নয়, বরং বন্দী। কিন্তু এমন কি তার স্বাধীন ইচ্ছাও এর উপর নির্ভর করে। কারণ ভাষা, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিবর্তনের দ্বারা চেতনা বিকশিত হয়, এবং এগুলি সবই অর্থনৈতিক উৎপাদন থেকে জাত। সুতরাং মানুষের কর্মের স্বাধীনতা তার বস্তুগত স্তরের উপর, তার অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উৎপাদন যত উন্নত হয়, সভ্যতাও তত স্বাধীন হয়।

কিন্তু তর্ক তোলা হবে যে, অর্থনৈতিক উৎপাদন হল সেই জিনিস যা সমাজের সমস্ত 'বিধিনিষেধের' সঙ্গে জড়িত। দৈনন্দিন কাজ, তত্ত্বাবধায়কের অধীনে শ্রমবিভাজন, চুক্তি ও পুঁজির যাবতীয় নিয়মাবলী, সমাজের যাবতীয় নিয়মকানুন এই অর্থনৈতিক উৎপাদনের কাজ থেকেই দেখা দেয়। সেটা এই কারণেই যে, আমরা যা আগেই দেখেছি, স্বাধীনতা হল কার্যকারণতা সম্পর্কে সচেতনতা। আর অর্থনৈতিক উৎপাদনের দ্বারা, যা মানুষকে কর্মের মধ্য দিয়ে তার ইচ্ছাকে ফলবান করাকে সম্ভব করে তোলে, মানুষ তা অর্জন করার আবশ্যকীয় (necessary) উপায় সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। যে পাথরকে সরাতে মানুষের ইচ্ছা হয় সেটাকে নড়াতে লিভারকে যে অবশ্যই একটা বিশেষ দৈর্ঘ্যের হ'তে হবে এটা একটা পরিণতি (consequence), অন্যটি হল এই যে লিভারটাকে চালাতে হলে বিশেষ কিছু সংখ্যক

মানুষকে বিশেষ একটা ভাবে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। আধুনিক জীবনের জটিল যন্ত্রপাতি আর সেই সঙ্গে তার যাবতীয় বিস্তারিত সামাজিক সম্পর্ক-গুলিতে পৌঁছানো কেবল একটা বিকাশের ব্যাপার মাত্র।

অর্থাৎ, সমাজের যাবতীয় 'বিধিনিষেধ' 'বাধ্যবাধকতা', 'বাধ' এবং 'দায়দায়িত্ব-গুলি' ('constraints', 'obligations', 'inhibitions' and 'duties') হল সেই সব উপায় যার সাহায্যে স্বাধীনতা মানুষের হস্তগত হয়। সুতরাং স্বাধীনতা হল প্রয়োজন সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা স্বাধীনতা শুধু মাত্র প্রয়োজন নয়, কারণ সমস্ত বাস্তবই প্রয়োজন (necessity) দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। স্বাধীনতা হল প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা। বহির্বাস্তবের মধ্যকার, আমার নিজের মধ্যকার, এবং বহির্বাস্তব ও মানুষের সত্তার মধ্যে মধ্যস্থতা করে যে সামাজিক সম্পর্কগুলি তাদের মধ্যকার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা। পশু হল নিছক প্রয়োজনের দাস, মানুষ হল সমাজের মধ্যে সচেতন ও আত্ম-নির্ধারিত। অবশ্য অন্য-নিরপেক্ষভাবে তা নয় তবে তা পশুর থেকে বেশি।

সুতরাং দেখা গেল যে, কর্মের স্বাধীনতা, আমরা যা ইচ্ছা করি সেটা করার স্বাধীনতা, স্বাধীনতার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশটা প্রয়োজন সম্পর্কে সামাজিক চেতনার দ্বারা সুনিশ্চিত হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা সৃষ্ট হচ্ছে। চিরন্তন সজাগতা নয়, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন চিরন্তন কাজ।

কিন্তু স্বাধীনতার অন্য অংশটির সঙ্গে, ইচ্ছা করার স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কটা কি রকম? মানুষ যা ইচ্ছা করে সেটা করার স্বাধীনতা অর্থনৈতিক উৎপাদন মানুষকে দিচ্ছে, কিন্তু সে যেটা ইচ্ছা করছে সেটা ইচ্ছা করার স্বাধীনতা কি তার আছে?

আমরা দেখেছি যে, বহির্বাস্তবের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করার দ্বারাই মাত্র মানুষ যা ইচ্ছা করে সেটা করার স্বাধীনতা সে লাভ করে। একইভাবে এটাও সত্য যে, অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করার দ্বারাই মাত্র সে কি করবে সেটা ইচ্ছা করার স্বাধীনতা সে লাভ করে। তাছাড়া, এই দুটি পরস্পর-বিরোধী নয়। বরং আমরা এখনই দেখতে পাব যে সে দুটি একই। চেতনা হল অর্থনৈতিক উৎপাদনের একটা বিশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপের ফল।

মনে করা যাক একজন এই পরিতাপজনক পরীক্ষণটি করল। নয় মাস বয়সে বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে লোকালয় থেকে অনেক দূরে এক ছাগমাতার হাতে সঁপে দেওয়া হল যাতে তাঁকে লালন পালন করে পূর্ণবয়স্ক করে তোলা হয়। ধরা যাক, চল্লিশ বছর পরে লোকে গিয়ে প্রথম বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করল। তখন

লোকে কি তাঁর হাতে 'অ্যানালিসিস অব মাইণ্ড' এবং 'অ্যানালিসিস অব ম্যাটার' দেখতে পাবে? 'এমন কি সংখ্যাকে সব থেকে সেরা শ্রেণী বলে তিনি যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন সেই সংজ্ঞা কি তিনি দিতে পারবেন? না। তাঁর বর্তমান অবস্থার বিপরীতে, তাঁর আচরণ তখন হবে অযৌক্তিক ও অভব্য, দুইই।

অতএব মনে হবে যে রাসেল, তাঁকে আমরা যেমন চিনি ও মূল্য দিই, যেন মুখ্যতঃ একটা সামাজিক উৎপন্ন। রাসেল যে পশু নয়, তিনি যে একজন দার্শনিক, তার কারণ এই যে কেবল মাত্র আদবকায়দাই নয়, তাঁকে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং সেইজন্য বহুযুগব্যাপী প্রচেষ্টার সামাজিক জ্ঞানের এলাকায় তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। ভাষা তাঁর মস্তিষ্ককে নানা ধ্যানধারণা দিয়ে পূর্ণ করেছে, কোনটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে তা দেখিয়েছে, তাঁকে যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে, অন্য সমস্ত মানুষের জ্ঞান তাঁর হাতের সামনে তুলে ধরেছে এবং সমাজের প্রাথমিক শোভনতাগুলি—নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা—আবেগোদ্দীপকগত ভাবে তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে। যাবতীয় উপকারী সামাজিক বস্তুর সৃষ্টির মতই, রাসেলের চেতনাও একটা সৃষ্টি। রাসেলের এই চেতনাই হল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবে রাসেল; তাঁর মধ্যকার সেইটিকেই আমরা মূল্য দিই। নরাকৃতি বানরের থেকে এইটাই তাঁর পার্থক্য। সমাজ তাঁকে সৃষ্ট করেছে, যেমন ধরুন টুপি তৈরি করে।

বলা বাহুল্য যে ফল বিচারে রাসেলের 'স্বাভাবিক ক্ষমতাগুলিই' (বা আরও নিয়মমাফিকভাবে বলতে গেলে, তাঁর জনিরূপটাই) গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার অর্থ কেবল এইটুকু বলা যে, উপাদান সৃষ্টবস্তুকে সাপেক্ষীভূত করে। সমাজের ভালোভাবেই জানা আছে যে শুয়োরের কান থেকে রেশমের ব্যাগ তৈরি হয় না, বা বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে, বিকলমস্তিষ্ক মানুষ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তৈরি হয় না। কিন্তু সমাজের এটাও জানা আছে যে আকরিক লৌহ থেকে টিলা, সেতু, জাহাজ বা মাইক্রোমিটার তৈরি করা যায় এবং সেই নমনীয় বস্তু, মানুষের জনিরূপ, থেকে আজটেক, মিশরীয়, এথেনীয়, প্রুশীয়, সর্বহারা পাদ্রী বা সরকারী স্কুলের ছাত্র তৈরি করা যায়।

একথাও বলা বাহুল্য যে মানুষ টুপি নয়। সে এক অনন্য সামাজিক উৎপন্ন। যন্ত্রের জন্মদানকারী যে যন্ত্রের কল্পনা বাটলার করেছিলেন, সেই যন্ত্রের মূল। মানুষ নিজেই সেই যন্ত্রের একটা। টুপির সঙ্গে তুলনায় মানুষ সম্পর্কে মৌলিক সত্য এই যে, সে টুপি নয়, সে সেই মানুষ যে টুপিটা পরে। আর সমাজ কর্তৃক মানুষকে এই সজ্জিত করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মৌলিক সত্য হল এই যে, সজ্জিত করাটা হল মুখ্যতঃ তার চেতনার দ্বারা সজ্জিত করা, একটা প্রক্রিয়া যা অন্য কিছুর সঙ্গে ঘটে না।

এখন যেহেতু সমাজ তার চেতনাকে বিস্তারিত করে, ঠিক সেই কারণেই মানুষ টুপিরই মত একটা সামাজিক সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করতে সক্ষম ; আর টুপি অচেতন হওয়ার কারণে স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করতে অক্ষম। মানুষের সত্তাবান হয়ে ওঠা (coming-to-be), তার 'বড় হয়ে ওঠা' হল সমাজের নিজেকেই তৈরি করা, পূর্বতন চেতনাগুচ্ছের দ্বারা সৃষ্ট এক গুচ্ছ চেতনার আর এক গুচ্ছ চেতনা সৃষ্টি করা। সুতরাং স্বাধীনতার দীপশিখা এক হাত থেকে অন্য হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এবং আরও উজ্জ্বলভাবে তা জ্বলছে। কিন্তু বাঁচার মধ্য দিয়েই মানুষের চেতনা তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন লাভ করে, আর বাঁচার অর্থই হল নানা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করা।

কিন্তু জিগির তোলা হবে মানুষ—স্বতন্ত্রব্যক্তি, জগৎকে—পাহাড়, আকাশ, সমুদ্রকে—নিজে একা একা দেখে। নিজে পড়ার ঘরে বসে সে ভাগ্য ও মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করে ; ঠিকই, কিন্তু পাহাড় সমুদ্র এসবের একটা অর্থ আছে তার কাছে, আর সেটা এই জন্যই যে সে ভাষা-ভাষী, যেহেতু তার একটা সামাজিকভাবে ছাঁচ পাওয়া চেতনা আছে। মৃত্যু, ভাগ্য ও সমুদ্র হল অত্যন্ত উন্নতভাবে উদ্ভূত সামাজিক প্রত্যয়। সেগুলিকে পরিবর্তিত ও বিস্তারিত করাতে প্রত্যেক ব্যক্তির অল্প কিছু দান থাকে। কিন্তু অতীতের প্রচণ্ড চাপের তুলনায় সেই দান কতটুকু। ভাষা, বিজ্ঞান ও শিল্প সবই হল মানুষের নিজের আকাঙ্ক্ষাকে বহির্বাস্তবের উপর আরোপ করার উদ্দেশ্যে বহির্বাস্তব ও নিজের সম্পর্কে জানার জন্য সামাজিক দিক থেকে তার সহযাত্রীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফল মাত্র। জ্ঞান এবং প্রচেষ্টা দুই-ই একমাত্র সহযোগিতার মধ্য দিয়েই সম্ভব এবং দুই-ই আরও স্বাধীন হওয়ার জন্য মানুষের সংগ্রামের দ্বারা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

এইভাবে মানুষের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা, সচেতন ইচ্ছা সচেতন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যা সক্রিয়, তা হল সমাজের একটা উৎপন্ন ; এটা একটা অর্থনৈতিক উৎপন্ন। স্বাধীনতার সন্ধানে সমাজ যে সব উৎপন্ন অর্জন করে, তার মধ্যে এটি সব থেকে মার্জিত। সামাজিক প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক চেতনা প্রস্ফুটিত হয়। প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সহজপ্রবৃত্তিগত আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করি। কি করে সেগুলি আয়ত্ত করতে হয় তা শিক্ষা করে আমরা বাস্তবের প্রকৃতি সম্বন্ধে এবং কি করে তাকে বশ করতে হয় সেই সম্বন্ধে কিছুটা শিক্ষালাভ করি। এই জ্ঞান আমাদের আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করে ; তা হয়ে ওঠে আরও সচেতন, বাস্তবের যথাযথ প্রতিরূপে আরও বেশি পূর্ণ। এইভাবে সমৃদ্ধ হয়ে, আকাঙ্ক্ষাগুলি হয়ে ওঠে সূক্ষ্মতর এবং আরও বেশি বিস্তারিত অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্যে, গভীরতর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ

ক'রে বাস্তব সম্পর্কে তা আরও বেশি গভীর অন্তর্দৃষ্টিলাভ করে, এবং পরিণতি হিসাবে, নিজেরাই আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এইভাবে দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, সামাজিক সত্তা সামাজিক মন সৃষ্টি করে এবং গভীরতর হয়ে ওঠা অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাস্তবের মধ্যকার এই পারস্পরিক ক্রিয়া সংস্কৃতির দ্বারা সংরক্ষিত ও পরবর্তী-কালের হাতে হস্তান্তরিত হয়। সমাজ যত অগ্রসর হয় মানুষের চেতনা তত কম কম মাত্রায় অ-রূপান্তরিত সহজপ্রবৃত্তির দ্বারা গঠিত হয়, এবং আরও বেশি বেশি মাত্রায় সামাজিক দিক থেকে ওঠা জ্ঞান ও আবেগের দ্বারা গঠিত হয়। মানুষ তার নিজের সত্তার ও বহির্বাস্তবের প্রয়োজনগুলিকে আরও বেশি স্পষ্ট করে বুঝতে থাকে। আরও বেশি বেশি মাত্রায় সে স্বাধীন হতে থাকে।

আমাদের মানসিক অবস্থার কার্যকারণতা সম্পর্কে আমরা যে পরিমাণে অচেতন থাকি, পশুদের মত, আমাদের মনও সেই পরিমাণে স্বাধীন, এই বিভ্রমই আমাদের স্বাধীনতাহীনতাকে সুনিশ্চিত করে। বুর্জোয়া সমাজ আজ কাজের মধ্য দিয়ে এই সত্যটাকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে ; তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করে আমরা এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছি। বুর্জোয়ারা বিশ্বাস করে যে, সামাজিক সংগঠনের অস্তিত্ব না থাকাটাই স্বাধীনতা ; তাঁরা বিশ্বাস করেন যে স্বাধীনতা একটা নেতিবাচক গুণ, তার যেসব বাধা রয়েছে সেগুলির ক্ষমতাহ্রাসই (deprivation) হল স্বাধীনতা ; এবং স্বাধীনতা কোনও ইতিবাচক গুণ নয়, প্রয়াস ও জ্ঞানের সুফল নয়। এই বিশ্বাসটাই হল বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কের ফল। ফলে, যে কার্যকারণতা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর চেতনাকে সেটা যা তাই করে তুলেছে, সেই কার্যকারণতা সম্পর্কেই তিনি অচেতন। স্নায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি এই কথা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন যে তাঁর বাধ্যবাধকতা (compulsion) হল একটা বিশেষ অচেতন কমপ্লেক্সেরই ফল। স্বাধীনতাকে বুর্জোয়ারা সামাজিক বাধানিষেধের নিছক ক্ষমতাহ্রাস হিসাবে ধারণা করে থাকেন। স্বাধীনতা সম্পর্কে এই ধারণাটি যে বুর্জোয়া সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকেই উদ্ভূত, এবং এই বিভ্রমটাই যে তাঁকে সব দিক থেকে বাধা দিচ্ছে, এই কথাটা সেই স্নায়ুরোগীর মত বুর্জোয়াও বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন। এটা তিনি দেখতে চান না যে তাঁর নিজের সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা, শ্রমিকের বন্দীত্ব এবং সমস্ত বিকাশমান বুর্জোয়া সম্পর্কগুলি—নিষ্ক্রিয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধ, ঘৃণা, নৃশংসতা, ব্যাধি—একই কার্যকারণতার জালে আবদ্ধ, যে প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটির দ্বারা প্রভাবিত, এবং সেইকারণে হেতুগুলি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতিরেকেই, স্বাধীন মানুষের ইচ্ছার এক নিছক প্রচেষ্টাই ফ্যাসিবাদ, যুদ্ধ এবং মন্দাকে দূর করবে এই অনুমানটাও যুক্তির দিক থেকে দোষদুষ্ট। তার যুক্তির এই মৌলিক দোষদুষ্টতার জন্যই এই ধরনের বুদ্ধিজীবী

অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা বিবেকের আপত্তি ইত্যাদি নেতিবাচক ব্যক্তিগত কর্মের দ্বারা যুদ্ধ ইত্যাদির মত সুস্পষ্ট সামাজিক অন্যায়গুলি দূর করার সর্বদা চেষ্টা করেন। এইরকম যে ঘটে তার কারণ, ব্যক্তি স্বাধীন, এই পূর্ব-অনুমান থেকে তিনি কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না। কিন্তু আমরা দেখিয়েছি যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি কখনই স্বাধীন নয়। সামাজিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই মাত্র তিনি স্বাধীনতা লাভ করতে পারেন। সামাজিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করার দ্বারাই মাত্র তিনি যা চান তা করতে পারেন। অতএব তিনি যদি দারিদ্র্য, যুদ্ধ ও দুঃখকষ্ট বন্ধ করতে চান তাহলে সেটা তাঁকে করতে হয় সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ব্যবহার করার দ্বারা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা নয়। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ব্যবহার করতে হলে তাঁকে সেগুলিকে বুঝতে হবে। সমাজের নিয়মগুলি সম্পর্কে তাঁকে সচেতন হতেই হবে, ঠিক যেমন একটা পাথরকে লিভারের চাড় দিয়ে যদি তুলতে হয় তাহলে লিভারের নিয়মগুলি তাঁকে জানতেই হবে।

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী একবার যদি দেখতে পান যে সমাজ স্বাধীনতার একটা উপকরণ (instrument) মাত্র, তাহলে স্বাধীনতার পথে আরও এক ধাপ তিনি এগিয়ে যাবেন। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতাহীন। একথা ঠিক যে তিনি একজন তর্কশাস্ত্রবিদ, প্রকৃতির কার্যকারণতা, আইনস্টাইনের তত্ত্বগুলি, সামাজিক আবিষ্কারের যাবতীয় চমৎকার সরঞ্জাম (apparatus) তিনি বোঝেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সব তত্ত্ব থেকে মুক্ত এক যাদুময় সামাজিক সম্পর্কের জগতকে তিনি বিশ্বাস করেন, যে জগতে বুর্জোয়া স্বাধীনতার দেবতাই একমাত্র আধিপত্য করে। কেবলমাত্র তাঁর তত্ত্বেই নয়। তার স্বাধীনতার নীতিটিও যেরকম ঈশ্বরতত্ত্বগত মতবিশ্বাস (dogma) হিসাবে গৃহীত হয় এবং যেভাবে যাবতীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের সঙ্গে কখনই যে সেটাকে খাপ খাওয়ানো হয় না, তা থেকেও একটা প্রমাণিত হয়। তাঁর কর্মের মধ্যেও এটা প্রমাণিত হয়। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী তখন বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতাহীনতার বিকাশকেও বন্ধ করতে অক্ষম। জরিমানার যাবতীয় বাধ্যবাধকতা, ফ্যাসিবাদ ও অর্থনৈতিক দুর্দশা আধুনিক সমাজকে ক্ষতবিক্ষত করছে, আর তার বিরোধিতা করতে গিয়ে সে যা করছে তা হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্ম, বিবেকভিত্তিক আপত্তি আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। সে যদি স্বাধীনতাহীন হয় তাহলে এইরকমই হতে বাধ্য। যে লোক বিশ্বাস করে যে সে গভীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে সে যেমন জলে ডুবে যায়, সেইরকম বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী বেশ খানিকটা স্বাধীনতা আছে বলে জোর দিয়ে ঘোষণা করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই এবং সেইকারণেই সে মানসিক দিক-

থেকে এবং দৈহিক দিক থেকে স্বাধীনতাহীন। বুর্জোয়া সমাজে আজ লৌহকঠিন বাধ্যবাধকতা যে আধিপত্য করছে এটা কে না দেখতে পায়? আমরা যা ইচ্ছা করি সেটা যখন করতে পারি তখনই আমরা স্বাধীন। সমাজ সেই পরিমাণেই স্বাধীনতার উপকরণ যে পরিমাণে তা মানুষ যা চায় তাকে আয়ত্ত করে। বুর্জোয়া সমাজের সদস্যরা, শ্রমিক, পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদী বুদ্ধিজীবী সকলেই চায় বস্তুগত সম্পদ, সুখ, সংঘাত থেকে মুক্তি, মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি এবং নিরাপত্তা। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজ আজ বস্তুগত সম্পদের হ্রাসত্ব সৃষ্টি করছে এবং বেকারত্ব, দুঃখ, সংঘাত, নিরাপত্তাহীনতা, অবিরাম যুদ্ধেরও জন্ম দিচ্ছে। অতএব বুর্জোয়া সমাজে যারাই বাস করে—গণতন্ত্রবাদী, ফ্যাসিবাদী বা রুজভেল্টপন্থী সকলেই স্বাধীনতাহীন। কারণ তারা যা আকাঙ্ক্ষা করে বুর্জোয়া সমাজ তা দিচ্ছে না। তাদের ভোট বা 'কথা বলার স্বাধীনতা' আছে কি নেই, তার দ্বারা তাদের স্বাধীনতাহীনতা কোনওভাবেই পরিবর্তিত হয় না।

বুর্জোয়া সমাজ কেন তার তার সদস্যদের অভাব পূরণ করছে না? যেহেতু তা অর্থনৈতিক উৎপাদনের নিয়মগুলি বুঝতে পারছে না—যেহেতু তা অসংগঠিত ও অ-পরিকল্পিত। অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে তা অচেতন এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক উৎপাদনকে দিয়ে সে তার আকাঙ্ক্ষাগুলিকে পূরণ করতে পারে না। অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে সে অচেতন কেন? কারণ, ঐতিহাসিক কারণে, সেই সমাজ বিশ্বাস করে যে যখন প্রত্যেক মানুষেরই যেটা উৎপাদন করা তার নিজের কাছে সব থেকে বেশি লাভজনক বলে সে মনে করে সেটাই উৎপাদন করার স্বাধীনতা থাকে, সেই অর্থনৈতিক উৎপাদনটাই সর্বোত্তম। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজের ক্রিয়ায়, অর্থনৈতিক উৎপাদনে ব্যক্তির সামাজিক সংগঠনের অভাবের দ্বারাই স্বাধীনতা আয়ত্ত হয় বলে সেই সমাজ বিশ্বাস করে। আমরা আগে দেখেছি, অচেতনতার মধ্য দিয়ে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একটা ভ্রান্তি মাত্র। অচেতন, ভ্রান্ত বুর্জোয়া সমাজ সেইকারণে স্বাধীনতাহীন। এমন কি রাসেলও স্বাধীনতাহীন, এবং পূর্ববর্তী যুদ্ধের মত আগামী যুদ্ধেও তাঁকে জেলে যেতে হবে।

সমাজের মূলগত ক্রিয়ায় এই স্বাধীনতাহীনতাই—যাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বলা হয়—শেষ পর্যন্ত সব রকমের বহিঃস্থ বাধানিষেধ সৃষ্টি করে। বুর্জোয়া বিপ্লবী একটা যুক্তিদোষদুষ্ট স্বাধীনতার কথা জোর দিয়ে ঘোষণা করেছেন—তা হল এই যে মানুষ স্ব হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রতিষ্ঠানগুলি তাকে কু করছে। দেখা গেল এই, যে স্বাধীনতার দাবি সে করছে তা হল ব্যক্তিগত উৎপাদনের

ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। যখন দেখা গেল সেটা যুগপৎ একটা বাধানিষেধ তখন স্বাধীনতা হিসাবে তার যুক্তিদোষদুষ্ট প্রকৃতিটা উদঘাটিত হল। কারণ এটা কেবল নামেই স্বাধীনতা, উৎপাদনের উপায়গুলির মালিকানা লাভের বাধানিষেধহীন অধিকারের দ্বারাই তা আয়ত্ত করা যায়। এই বাধানিষেধহীন অধিকার নিজেই হল যারা এইভাবে জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের উপর একটা বাধানিষেধ। স্পষ্টতঃই আমি সেটারই মালিক যেটা ছোঁয়ার অধিকারটুকুও আমার প্রতিবেশীর নেই।

কর্তব্য ও বিশেষ সুযোগসুবিধার উপর প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় সামাজিক সম্পর্কগুলি বুর্জোয়া বিপ্লবের দ্বারা নগদমূল্যের উপর মালিকানার একান্ত ও প্রবল (exclusive and forcible) অধিকারে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য, মুনাফার জন্য উৎপাদন করি। সুতরাং, স্বভাবতঃই, আমি বাজারের জন্য উৎপাদন করি, ব্যবহারের জন্য নয়। নগদমূল্যের জন্য আমি কাজ করি, আমার প্রভু বা সামন্তপ্রভুর প্রতি কর্তব্যের জন্য করি না। রাষ্ট্রের প্রতি আমার সমস্ত কর্তব্য এখন নগদমূল্যের দ্বারা আপোষে মেটানো যেতে পারে। চুক্তির প্রতি আমার যাবতীয় বাধ্যবাধকতা, তা সে বিবাহই হোক আর সামাজিক সংগঠনই হোক, নগদমূল্যের দ্বারা আপোষে মেটানো যেতে পারে। মানুষও মানুষের মধ্যকার, যে মানুষরা অন্য ব্যাপারে আপাতঃদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন তাদের মধ্যকার, একমাত্র বাধ্যবাধকতা হিসাবে দেখা দিল নগদমূল্য,—স্বাধীন মালিক, স্বাধীন শ্রমিক, স্বাধীন উৎপাদনকারী, স্বাধীন ভোগী, অবাধ বাজার, অবাধ বাণিজ্য, স্বাধীন ব্যবসায়-উদ্যোগী, হাত থেকে হাতে, জমি থেকে জমিতে পুঁজির অবাধ প্রবাহ। এবং এমন কি নগদের কাছে মানুষের বাধ্যবাধকতা তার নিজের কাছে নগদের বাধ্যবাধকতা বলে, অনপেক্ষভাবে তার নিজেরই মালিকানাতেই থাকবে বলে প্রতীয়মান হয়।

সামাজিক বাধ্যবাধকতার এই বিলয়কে (dissolution) সমর্থন করা যেত যদি মানুষ নিজের মধ্যে স্বাধীন হত, এবং নিজের পক্ষে যা সর্বোত্তম বলে মনে হত সেটাই করে, নিজের ভালো ও মুনাফার জন্য সেটাই ক'রে সে যদি নিজে যা আকাঙ্ক্ষা করে সেটাই পেত এবং তার ফলে স্বাধীনতা তার হাতে আসত। এটা হল জঙ্গলের আপাতঃ স্বাধীনতায় প্রত্যাবর্তন, যেখানে প্রতিটি পশুই তার নিজের জন্য সংগ্রাম করে এবং কারও কাছে তার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকে না। কিন্তু আমরা দেখেছি এই স্বাধীনতা একটা বিভ্রম। পশু মানুষের থেকে কম স্বাধীন। জঙ্গলের আকাঙ্ক্ষাগুলি পরস্পরকে বাতিল করে দেয় এবং কেউই ঠিক যা চায় সেটা পায় না। কোনও পশুই স্বাধীন নয়।

এই যুক্তিদোষ সঙ্গে সঙ্গেই একটা যুক্তিদোষ বলে যেভাবে উদঘাটিত হয়ে যেত

তা নীচে বলা হল। সম্পত্তির মালিকানালাভের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ হল সমাজটা পাওয়া-পক্ষ আর না-পাওয়া পক্ষ এই দুইভাগে ভাগ হয়ে যেত, জঙ্গলের পশুদের মত। স্বাধীনতার বুর্জোয়া নীতি অনুসারে, প্রদত্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই যে যার নিজের পক্ষে যেটা সর্বোত্তম তাই করার চেষ্টায় না-পাওয়ার দল পাওয়ার দলের কাছ থেকে জোর করে সম্পত্তি কেড়ে নিত। কিন্তু সেটা হত পুরাপুরি নৈরাজ্য; এবং যদিও বুর্জোয়া তত্ত্ব অনুসারে নৈরাজ্য হল পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রয়োগের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারে যে জঙ্গলে বাস করাটা স্বাধীন হওয়া নয়। তার জীবনযাপনের রীতিটার ভিত্তিই হল সম্পত্তি। সেই অবস্থায় সামাজিক উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া যায় না এবং সমাজ বিলুপ্ত হয়ে যায়, মানুষ বন্য সমাজের স্তরে (savagery) ফিরে যায় এবং স্বাধীনতা পুরাপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। অর্থাৎ সুরু থেকেই প্রয়োগের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া নিজের তত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। বলপ্রয়োগের দ্বারা বুর্জোয়ার অধিকারকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করা হিসাবে রাষ্ট্র তার বৈশিষ্ট্যমূলক বর্তমান রূপ নিয়েছে। পাওয়ার দলকে না-পাওয়ার দলের 'স্বাধীন' আকাঙ্ক্ষা থেকে রক্ষা করার জন্য পুলিস, নিয়মিত সেনাবাহিনী ও আইন, এই সবকিছু গড়ে তোলা হয়েছে। বুর্জোয়া স্বাধীনতা অচিরেই বুর্জোয়া বলপ্রয়োগের (coercion) জন্ম দিয়েছে; জেল, সেনাবাহিনী, চুক্তি, আইনের যাবতীয় সাবলীলতাহীন ও বাধানিষেধাত্মক সরঞ্জাম, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যাবতীয় মতাদর্শ ও শিক্ষা, যাবতীয় বুর্জোয়া অনুশাসনের জন্ম দিয়েছে। অর্থাৎ, বুর্জোয়া স্বাধীনতা গড়ে উঠেছে একটা মিথ্যার উপরে; কালে তার দ্বন্দ্বগুলি উদ্ঘাটিত হতে বাধ্য।

না-পাওয়াদের মধ্যে বুর্জোয়া স্বাধীনতা নতুন বলপ্রয়োগের জন্ম দিল। স্বাধীন শ্রমিকদের কিছু নেই; যে কোন বাজারে তার শ্রমকে বিক্রয় করার স্বাধীনতা তার আছে। কিন্তু দাসত্বের এই রূপটা, তার বাধানিষেধহীন রূপে, ভূমি-দাসত্বের থেকেও খারাপ; ফ্যাক্টরি-আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার আগেকার অবস্থার যে সব সাংঘাতিক বর্ণনা সরকারী প্রতিবেদনে আছে তার ভয়ঙ্কর শব্দ-বিন্যাসেই তা স্পষ্ট। বাধানিষেধহীন ফ্যাক্টরি শিল্পায়ণ কিভাবে নর, নারী ও শিশুকে পশুতে পরিণত করেছিল, কিভাবে ত্রিশ বছর বয়স হতে না হতেই তারা বুড়ো হয়ে যেত, কিভাবে পরিশ্রান্ত অবস্থাতেই তারা ভোরে ঘুম থেকে উঠত এবং রাত্রেও নিদারুণ শ্রান্ত হয়ে অনেক দেরিতে শুতে যেত, শৈশবাবস্থা ত্যাগ করার আগেই ছোটরা কিভাবে কাজের চাপে বুড়িয়ে যেত সেসব সেখানে দেখা যাবে। দাসের থেকেও জঘন্য অবস্থায় পরিণত হয়ে—কারণ তখনও তার বেকার হওয়ার স্বাধীনতা ছিল—শ্রমিক তার

স্বাধীনতার লড়াই চালাত তার চাকুরিদাতার উপর সামাজিক বাধানিষেধ বলবৎ করিয়ে। অন্যদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দীর্ঘ লড়াই সে সুরু করল, যার ফলে নানা ফ্যাক্টরি আইন, মজুরিচুক্তি ও বিস্তারিত সামাজিক আইন প্রণয়ন ঘটল যা আজকে বুর্জোয়া চাকুরিদাতার উপর বলপ্রয়োগ করছে।

এত সবের পরেও বুর্জোয়া নিজেই কিন্তু স্বাধীন নয়। স্বাধীনতা সম্পর্কে তার বিভ্রমকে বাধানিষেধহীনভাবে অনুসরণ করা তাকে দাসত্বে আবদ্ধ করেছে। তার মতবিশ্বাস চাইছে বাধানিষেধহীন প্রতিযোগিতা, আর সেটা যেহেতু বাধানিষেধহীন সেইকারণে আবহাওয়ার মতই অন্ধ ও প্রচণ্ডভাবে কাজ করছে। বুঝতে-না-পারা এক আপত্তিকের করুণার পাত্রের মত, ঢেউয়ের ধাক্কায় লাফিয়ে উঠতে থাকা ছিপির মতই সে স্বাধীনতাহীন। বাধানিষেধের ব্যাপারে তাই সেও স্বাধীনতার সন্ধান করছে—শিল্পসংযুক্তি (amalgamation), শিল্পচক্র (rings), ট্যারিফ, দ্রব্যমূল্য-চুক্তি, 'অন্যায় প্রতিযোগিতা' বিষয়ক উপধারা, ভর্তুকি ও উপনিবেশগুলিকে শোষণের জন্য সরকারী নিরাপত্তার দ্বারা শিল্পগুলি আরও বেশি বেশি করে আশ্রয় পাচ্ছে। বুর্জোয়া স্বাধীনতা একচেটিয়া হয়ে ওঠার দ্বারা তার স্ববিরোধকে প্রকট করে তুলছে।

বুর্জোয়া বিকাশ ও অবনতির এই হল গোপন আপাতঃ অসম্ভাব্যতা (paradox)। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে বুর্জোয়ারা বিসর্জন দিয়েছিল একটা স্বাধীনতার নামে, যেটাকে সামাজিক বাধানিষেধ থেকে স্বাধীনতা বলে সে কল্পনা করেছিল। সেই ধরনের স্বাধীনতা বন্য সমাজের মানসিকতায় গিয়ে পৌছাত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে যে স্বাধীনতা সে দাবি করেছিল—'বাধানিষেধহীন ব্যক্তিগত সম্পত্তি'—তা বাধানিষেধের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ, তার ফলে সামাজিক সংগঠনের নানা জটিল রূপ দেখা দেয়, যা সামন্ততান্ত্রিক বাধানিষেধগুলির থেকে আরও বেশি বহুমুখী, আরও বেশি বিরামবিহীন, এবং আরও বেশি সর্বব্যাপী। এইভাবে যে নগদের সম্পর্ক যাবতীয় সামাজিক বাধানিষেধের সমাপ্তি ঘটিয়ে তাকে স্বাধীনতা দেবে বলে সে ধারণা করেছিল, তা সামন্ততন্ত্রে যতটা স্বাধীনতা ছিল তার থেকে বেশি মাত্রার স্বাধীনতা তাকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার থেকে আরও অনেক বেশি জটিল সব সংগঠন আরোপ করার দ্বারা তার আশার বিপরীতভাবে তাকে স্বাধীনতা দিয়েছিল। বুর্জোয়া চুক্তি, বাজার সংগঠন, শিল্পভিত্তিক গঠন, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, ট্রেড ইউনিয়ন, ট্যারিফ, সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সরকার, ভোগী ও শ্রম-বাজারের লৌহকঠিন চাপ, অনুদান (dole) ভর্তুকি, লুঠের যাবতীয় বিস্তারিত রূপ—সামাজিক সংগঠনের এই সব

বহুমুখী রূপ—এমন এক শ্রেণী এসবের জন্ম দিয়েছিল যে চেয়েছিল সামাজিক সংগঠনের বিলোপ। আর সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার থেকে বুর্জোয়া সভ্যতা যে তার পরিবেশের উপর আরও বেশি মাত্রার নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছিল—এবং সেই পরিমাণেই তা আরও বেশি স্বাধীন—এই ঘটনাটি ঘটার কারণই হল এই যে, এই সব জটিল সামাজিক সংগঠনের জন্ম দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু অন্ধভাবে।

অন্ধভাবে জন্ম দেওয়া হয়েছে; বুর্জোয়া সভ্যতার চূড়ান্ত স্বাধীনতাহীনতার এটাই উৎস। বুর্জোয়া সমাজ যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তার কারণ এই ঘটনা সম্বন্ধে সে সচেতন নয় যে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, বাধানিষেধহীন প্রতিযোগিতা, এবং তাদের প্রকৃতির নগদমূল্য-কেন্দ্রিকতার জন্য নানা ধরনের বাধানিষেধ দেখা দেয়—সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্নতা, মন্দা ও যুদ্ধের দাসত্ব, বেকারত্ব ও দুর্দশা। অন্ধের মত যেসব নানা ধরনের সামাজিক সংগঠন সে খাড়া করে তুলেছে সেগুলি সব এলোমেলো এবং সেগুলিকে বোঝা হয়নি। সোনার সন্ধানে কোনও পশু সুড়ঙ্গ কাটতে কাটতে যেমন বিরাট মাটির স্তূপ খাড়া করে তুলতে পারে, সেইরকম আর কি! সেগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন হয়ে উঠতে হলে, ইচ্ছার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, সচেতনভাবে সেগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য ব্যবহার করতে হলে তাকে নির্বন্ধতাবাদের প্রবক্তা হতে হবে, স্বাধীনতাকে হত্যা করতে হবে, মৌমাছির চাকধর্মী রাষ্ট্রের জন্ম দিতে হবে বলে সে বিশ্বাস করে। কারণ এখনও বুর্জোয়া নিজের চারদিকে যাবতীয় বিপর্যয় দেখা সত্ত্বেও বিশ্বাস করে যে একমাত্র পশুরাই স্বাধীন এবং সমস্ত রকমের আপতিক ঘটনার শিকার হওয়া, যুদ্ধ, মন্দা ও সামাজিক সংঘর্ষের কৃপাপাত্র হওয়াটাই হল স্বাধীন হওয়া।

স্বাধীনতার যে সংজ্ঞার নিম্নলিখিত অর্থ হয় না সেই স্বাধীনতা বাগাড়ম্বর মাত্র: মানুষ যা চায় তা করার স্বাধীনতা। সেই জনগণই স্বাধীন যার সদস্যরা যা চান তা করার স্বাধীনতা তাঁদের থাকে। যেসব ভালো জিনিস তাঁরা আকাঙ্ক্ষা করেন তা পাওয়ার এবং যেসব মন্দ জিনিস তাঁরা ঘৃণা করেন তা এড়াবার স্বাধীনতা তাঁদের থাকে। মানুষ কি চায়? তারা চায় সুখী হবে, উপবাস করতে বা অবাঞ্ছিত হতে বা জীবনের সুকুমার জিনিসগুলি থেকে বঞ্চিত হতে তারা চায় না। তারা চায় নিরাপত্তা আর সঙ্গীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, হত্যা করার এবং নিহত হওয়ার জন্য যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য না হতে। তারা চায় বিবাহ করতে, সন্তানাদি লাভ করতে এবং পরস্পরকে চায় সাহায্য করতে, পীড়ন করতে নয়। ভোটাধিকার বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তার যদি থাকেও তবু যে এইসব করতে পারে না সে কিসের স্বাধীন?

বুর্জোয়া সমাজে তাহলে স্বাধীন কে? কারণ, কয়েক জন নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিস্থিতির কারণে বেকার হতে, দুর্দশাগ্রস্ত হতে, অবাঞ্ছিত হতে, এবং জীবনের সুকুমার জিনিসগুলিকে উপভোগ করতে অক্ষম হতে বাধ্য হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক বাধ্য হচ্ছে ঘর ছেড়ে গিয়ে নিহত হতে, অথবা পরস্পরকে হত্যা করতে বা পীড়ন করতে। অল্প কিছু চকচকে পুরস্কারের জন্য সঙ্গীদের সঙ্গে সংঘর্ষ করতে এবং বিবাহ সংসার, সন্তানাদি থেকে বঞ্চিত হতে বাধ্য হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। কারণ সমাজ তাদের এসব জিনিস দিতে অপারগ। এগুলি হল স্বাধীনতার উপাদান এবং এগুলি অর্জন করতে না পারা অবধি—একটা সীমাবদ্ধ শ্রেণীর পক্ষে সে স্বাধীনতার সূক্ষ্ম জিনিসগুলি সুনিশ্চিত করতে পারে একথা বিশ্বাস করা বাতুলতা। এইসব প্রয়োজনগুলি যখন পূরণ হবে মাত্র তখনই মানুষ আরও উঁচুতে উঠতে পারে এবং শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা সে কি চায় এবং সে কি পেতে পারে তা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। কারণ তখনই মাত্র প্রয়োজনের এলাকা থেকে সে স্বাধীনতার এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে।

উচ্চতর চেতনার দিকে প্রতিটি পদক্ষেপই সংগ্রাম ও অসুবিধার মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে তৈরি হয়। মানুষের স্বাভাবিক কিন্তু মারাত্মক ভুল এই যে, সে ধরে নেয় যে স্বাধীনতার পথ হল সুগম, সেটা একটা নেতিবাচক ব্যাপার মাত্র, একটা শৈথিল্য, তার পথের একটা বাধা অপসারণ মাত্র। ব্যাপারটা তার থেকে অনেক বেশি। যেরকম আয়াসসাধ্যভাবে আমরা স্বাধীনতার উপকরণ, হাতিয়ার ও যন্ত্রাদি তৈরি করি, সেই রকম আয়াসসাধ্য-ভাবেই প্রকৃত স্বাধীনতাকে সৃষ্টি করতে হয়। মানুষের মনের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতাসহ, বাস্তবের অন্তর থেকে একে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হয়।

এই কারণেই সমস্ত স্বাধীনতাপ্রেমীরা, যারাই স্বাধীনতার প্রকৃতি বুঝতে পেরেছেন এবং বুর্জোয়া চিন্তার মূর্খ বিধেয়গুলি থেকে পলায়ন করতে পেরেছেন তারাই সাম্যবাদের দিকে বাঁক নিয়েছেন। কারণ সাম্যবাদ সেটাই, বুর্জোয়া সমাজ যতটা স্বাধীনতায় পৌঁছাতে পারে তার থেকে বেশি স্বাধীনতা আয়ত্ব করাটাই। সাম্যবাদের ভিত্তি হল সমাজের কার্যকারণতাকে বুঝতে পারা, যাতে করে বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্বাধীনতাহীনতা, পাওয়ার দলের হাতে না-পাওয়ার দলের দাসত্ব, এবং যুদ্ধ, মন্দা, মনোকষ্ট, ও কুসংস্কারের হাতে দু-দলেরই দাসত্বের অবসান হয়। প্রাণহীন বস্তুর নিয়মগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়াটাও নিশ্চয়ই কিছু, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। সমাজের কার্যকারণতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দ্বারা উচ্চতর মাত্রার আত্ম-নির্ধারণের অধিকারী হওয়া, যুদ্ধ, অনাহার, ঘৃণা ও বলপ্রয়োগ থেকে

মানুষকে উদ্ধার করা, সাম্যবাদ এটাই আয়ত্ত করে। সমাজকে নিজের সম্পর্কে সচেতন করে তুলে সাম্যবাদ মানুষের কাছে স্বাধীন ইচ্ছাকে বাস্তব করে তোলে। বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে হলে তার নিয়মগুলিকে আমাদের বুঝতেই হবে। একটা পাথর যদি আমরা নড়াতে ইচ্ছা করি, তাহলে ঠিক মত জায়গায় লিভারটাকে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে আমাদের। না-পাওয়ার দলকে, অর্থাৎ সর্বহারাকে পাওয়ার দলের, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের উৎপাদনের উপায়গুলি অধিগ্রহণ করতেই হবে এবংযেহেতু, আমরা যা আগেই দেখেছি, এই দুই স্বাধীনতা পরস্পর খাপ খায় না, সেই কারণে বুর্জোয়ারা যতদিন তাদের ভূতপূর্ব সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে বলপ্রয়োগকারী রাষ্ট্রের রূপে, বাধানিষেধের অস্তিত্ব ততদিন থাকতেই হবে। কিন্তু এখন অবস্থাটা পূর্ববর্তী পরিস্থিতির মত নয়, এই পর্যায়টা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। এই পর্যায়কে বলা হয় সর্বহারা শ্রেণীর এক নায়কত্ব। বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব থেকে—বুর্জোয়া রাষ্ট্র বলতে যা বোঝায় তা থেকে শ্রেণীহীন রাষ্ট্রে—যাকে বলে সাম্যবাদ, সেখানে পৌঁছানোর জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় ধাপ মাত্র। আর রাশিয়ার দিকে তাকালেই বোঝা যায়, শ্রেণীহীন রাষ্ট্র দেখা দেওয়াব আগে, এমনকি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বেই মানুষ ইতোমধ্যেই আরো বেশি স্বাধীন হয়ে ওঠে। সে এখন বেকারত্ব, সঙ্গীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও দারিদ্র্য এড়াতে পারে। সে বিবাহ করতে ও সন্তানাদির জন্ম দিতে পারে এবং জীবনের সুকুমার জিনিসগুলি অর্জন করতে পারে। সঙ্গীদের পীড়ন করতে এখন আর তাকে বলা হয় না।

শ্রমিকদের কাছে, যারা বেকারত্বের অধীন, প্রাচুর্যের মধ্যে উপবাসী, তাদের কাছে এই পথটা ঘটনাক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক বা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকরা পুরাপুরি স্বাধীন বলে বুর্জোয়ারা যতই আশ্বাস দিক, শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে। আর তখন, সেই সময় তার পাশে কে দাঁড়াবে? যে বুর্জোয়ারা নিজেরাই পুঁজির ক্রমবর্ধমান ঘনীভবনের ফলে ক্লিষ্ট ও ভ্রষ্টাধিকার, নিরুৎসাহিত, নৈরাশ্যবাদী, 'নিয়ন্ত্রণের অতীত শক্তিগুলির' কারণে যুদ্ধে লিপ্ত ও পীড়িত এবং তা সত্ত্বেও তখনও স্বাধীনতার দাবি জানাতে থাকে, সেই বুর্জোয়ারা কি তার পাশে এসে দাঁড়াবে? আজ হোক, কাল হোক, প্রতিটি স্বতন্ত্র বুর্জোয়াকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আর সেই উত্তরের উপর নির্ভর করবে সেইদিন সে মানুষকে স্বাধীন করার জন্য সচেষ্ট হবে, না তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখার জন্য সচেষ্ট হবে! এটাও আবার নির্ভর করবে স্বাধীনতার প্রকৃতিটা সে বুঝেছে—না বোঝেনি তার উপর। যে শ্রেণীর কাছে পুঁজিবাদের অর্থ স্বাধীনতা, সেই শ্রেণী ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে, কিন্তু সেই শ্রেণীভুক্ত যে মানুষরা আজ যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও দারিদ্র্যের দাসত্ব করছে,

স্বাধীনতার যে বুর্জোয়া ব্যাখ্যা বিপুল পরিমাণে মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে তাকে এখনও যারা আঁকড়ে আছে তাদের মুক্তি ঘটতে পারে এবং তারা স্বাধীন হতে পারে একমাত্র স্বাধীনতার সক্রিয় প্রকৃতিটা বুঝতে পারলে তবেই ; আর সেই পথ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর সেই পথ ধরে তাকে এগিয়ে যেতে হবে তবেই স্বাধীনতালাভ সম্ভব হবে। যতক্ষণ তারা স্বাধীনতা চায় অথচ সৃষ্টি করে স্বাধীনতা-হীনতা, ততদিন পর্যন্ত তাদের ইচ্ছা স্বাধীন নয়। যখন তারা সাম্যবাদ ইচ্ছা করবে এবং স্বাধীনতা সৃষ্টি করবে, একমাত্র তখনই তাদের ইচ্ছা স্বাধীন হবে।

এই সামগ্রীর মধ্যেই, স্বাধীনতার মধ্যেই সমস্ত সামগ্রী ধরা আছে। কেবলমাত্র বর্তমান বস্তুগত চাহিবার সাধারণ স্তরেই নয়, যে স্তরে সমস্ত মানুষের আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটবে, স্বাধীনতা হল সেই একই লক্ষ্য, একই পথে তা লভ্য। বিজ্ঞান হল সেই উপায় যার দ্বারা মানুষ কি করতে পারে তা সে শেখে এবং সেইকারণে তা বহির্বাস্তবের আবশ্যকীয়তাকে অনুসন্ধান করে দেখে। শিল্প হল সেই উপায় যার দ্বারা মানুষ কি করতে চায় তা সে শেখে, এবং সেইকারণে তা মানবহৃদয়ের সারবস্তুর অনুসন্ধান করে। আর বুর্জোয়াতন্ত্র, সৌন্দর্যের দিকে চোখ বুঁজে থেকে, বিজ্ঞানের দিকে পিছন ফিরে থেকে, শেষ পর্যন্ত তার নির্বুদ্ধিতাকেই কেবল অনুসরণ করে চলে। সোনার ক্রুশের উপর স্বাধীনতাকে সে বলি দেয়। তাকে যদি প্রশ্ন কর কার নামে সে এই কাজ করছে, সে জবাব দেবে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নামে'।

॥ পরিচিতি ॥

Adler, Alfred ১৮৭০-১৯৩৭ অষ্ট্রীয় মনোবিজ্ঞানী

Ahriman বা আংগ্রা মৈন্যু। জরথুষ্ট্রের ধর্মমতে অমঙ্গলের প্রতিনিধি।

Alexander খৃ পূঃ ৫৬—৩২৩ খৃঃ পূঃ। মাসিদন ও ওলিম্পিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের পুত্র। পেল্লাতে জন্ম, শিক্ষা আরিস্ততলের কাছে। খৃঃ পূ ৩৩৬ অব্দে রাজা হন। ৩৩৪ এ হেলেসপন্ত অতিক্রম করে পারস্য আক্রমণ করে দারিয়ুস্ বংশকে বন্দী করেন এবং মিশর জয় কবে আলেকজান্দ্রিয়ার পত্তন করেন। পরে ভারত আক্রমণ করেন। থেইসের প্ররোচনায় পারসিপোলিশ ধ্বংস কবেন বলে কথিত।

Aphrodite দ্রঃ ভেনাস।

Aragon, Louis ১৮৯৭—ফরাসী সুররিয়ালিস্ট কবি ও লেখক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময হিটলার-অধিকৃত ফ্রান্সের প্রতিরোধ যুদ্ধের সৈনিক ও কবি। ফরাসী কমিউনিস্ট লেখকদের নেতৃস্থানীয়।

Aristotle খৃঃ পূ ৩৮৪-৩২২। মাসিদোনিয়ার স্তাগেয়িরাতে এই গ্রীক দার্শনিকের জন্ম। আথেন্সে প্লাতোর কাছে শিক্ষা। সেখানে কুড়ি বছর বাস করেন। আলেকজান্দারের শিক্ষক ছিলেন। ৩৩৫ খৃ-পূর্বাব্দে আলেকজান্দার রাজা হলে আথেন্সে ফিরে এসে লাইসিয়ামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইখানে তের বছর বাস করেন ও তাঁর অধিকাংশ রচনা সম্পন্ন করেন। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্দেহ দেখা দেওয়ায় চালসিসে বাস করতে থাকেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। যুক্তিবিদ্যা 'লজিকেব' প্রতিষ্ঠাতা। জীববিদ্যায় বর্গীকরণ প্রয়োগ করেন। 'এথিকস্' 'পলিটিকস' ও 'পোয়েটিকস' বিখ্যাত রচনা।

Athene—জ্ঞান, শ্রম ও অধ্যবসায়ের গ্রীক দেবী। রোমানরা এঁকে মিনার্ভার সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। জিউস ও মেতিসের কন্যা। সন্তান তাঁর থেকে বেশি শক্তিশালী হওয়ার আশঙ্কায় জিউস গর্ভবতী মেতিসকে খেয়ে ফেলেন। পরে পূর্ণ গঠিত ও সশস্ত্র রূপে পিতার মস্তিষ্ক থেকে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। জলপাইয়ের আবিষ্কার এঁর কীর্তি।

Attila ?—৪৫৩। হান রাজা। ৪৪৫-৫০ অব্দে প্রাচ্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। পরে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে আয়েতিয়াসের হাতে চালন্সে পরাস্ত হন।

Baal কানানীয় ও ফিনিশীয়দের প্রধান দেবতা। খৃষ্টধর্মীয়দের মতে সেইকারণে মিথ্যা দেবতা হিসাবে ধিকৃত।

Barbusse, Henri ১৮৭৩-১৯৩৫। ফরাসী ঔপন্যাসিক। প্রথম মহাযুদ্ধের

যতে লেখা 'Le Feu' জগৎবিখ্যাত। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চে বসেই বারবুস বইটি রচনা করেন। ১৯১৭তে গ্রন্থটির জন্য গঁকুর পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৮তে এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসাবে Clarte প্রকাশিত হয়। প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিয়ে লেফেভ্‌র্‌, জর্জ ক্রয়ের এবং ভেলেঁ কুত্রের সঙ্গে একত্রে একটি গণতান্ত্রিক সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থার নাম ছিল A. R. A. C. এবং এর মারফত সারা বিশ্বে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার চালাতে থাকেন। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে clarte লেখকগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয় সম্ভবতঃ ১৯২১ সালের শেষ দিকে এবং কবিকে তাঁদের clarte পত্রিকায় লেখার অনুরোধ জানান। আমস্টার্ডম সম্মেলন (১৯৩২) আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী কংগ্রেস হিসাবে বিখ্যাত। এই 'সম্মেলনের গৌরব বারবুসের নামের সহিত জড়িত', লিখেছেন রলাঁ (শিল্পীর নবজন্ম)। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অক্লান্ত এই সৈনিকের মৃত্যু ঘটে ১৯৩৫ অগাস্ট। L' Enfer. Le Enchainements. Elevation প্রভৃতি উপন্যাস ছাড়াও জোলা, ও স্তালিনের জীবনীকার হিসাবে বিখ্যাত।

Bleuler, Eugen (১৮৫৭-১৯৩৯) সুইশ মনোরোগ বিশারদ। মনোরোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। স্কিজোফ্রেনিয়া শব্দটি তিনিই তৈরি করেন এবং এই রোগের লক্ষণগুলিকে মানসগত উৎস থেকে উদ্ভূত বলে স্থির করেন। পূর্বসূরীরা সেগুলিকে শারীরবিদ্যাগত উৎস থেকে উদ্ভূত বলে মনে করতেন।

Buddha খৃঃ পূ পঞ্চম শতকে গৌতম, সিদ্ধার্থ বা শাক্যমুনির জন্ম নেপালের কপিলাবস্তুতে। রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র। বোধিলাভ করে নাম হয় বুদ্ধ। এঁর প্রতিষ্ঠিত মতবাদের নাম বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্মের প্রধান সূত্রগুলি হল : দুঃখ-ভোগ অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। দুঃখভোগের প্রধান কারণ বাসনা। বাসনাকে দমন করলে তবেই দুঃখকে দমন করা সম্ভব এবং নির্বাণ লাভ করা যায়। নির্বাণ হল ব্যক্তিগত অস্তিত্বের অবসান এবং পরম-আত্মার মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া।

Bukharin, Nikolai Ivanovich (১৮৮৮-১৯৩৮), রুশ রাজনীতিবিদ। ১৯১৬তে নিউ ইয়র্কে লেনিনপন্থী 'নোভি মীর' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রুশ বিপ্লবের পর কমিণ্টার্ণের একজন প্রধান নেতা হয়ে ওঠেন এবং 'প্রাভদার' সম্পাদক হন। ১৯২৪এ পলিটব্যুরোর সদস্য হন। রাষ্ট্রীয় 'কৃষি সমবায়' নীতির বিরোধিতা করেন। ১৯৩৮এ রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে প্রাণদণ্ড হয়।

Butler, Samuel ১৮৩৫—১৯০২, 'Erewhon' নামে বিখ্যাত উপন্যাসের (১৮৭২) রচয়িতা। কোন এক কলোনির সুদূর প্রান্তে পাহাড় পার হয়ে এক দেশে পৌঁছে গল্পকার সেখানে যেসব প্রতিষ্ঠান প্রচলিত দেখেন সেগুলির এক ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন এই গ্রন্থে। ভণ্ডামি, আপোষ ও মানসিক বৈকল্যের

বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ লেখকের উদ্দেশ্য। A Psalm of Montreal গ্রন্থে গ্রীক শিল্প ও আধুনিক ধর্মোপদেশের মধ্যকার সংঘাতকে উপলক্ষ্য করে তীব্র ব্যঙ্গ করেন। এর পরে বিতর্কমূলক বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থে ডারুইনীয় মতবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। Life and Habit (৭৭), Evolution Old and New (১৮৭৯), Unconscious Memory (১৮৮০) ও The Deadlock in Darwinism ইত্যাদি বিখ্যাত। ডারুইন জগতের বিবর্তনের ইতিহাস থেকে মনকে বর্জন করেছিলেন। বাটলার অর্জিত গুণ সন্তানের মধ্যে বংশানুক্রমে হস্তান্তরের সম্ভাব্যতার সমর্থক। ইতোমধ্যে হোমার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ দেখা দেয়। তাঁর ধারণা ছিল ওদিসি একজন স্ত্রীলোকের রচনা এবং সিসিলির ত্রাপানিতে এর উৎস বলে তিনি মনে করতেন। এই বিষয়ে তাঁর রচনা ১৮৯৩-এ একটি প্রবন্ধে এবং ১৮৯৭-এ একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

Caesar, Julius ১০২ ?—৪৪ খৃঃ পূঃ। গল জয় করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেবল বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ ও রাষ্ট্রনায়কই নয়, বাগ্মী ও ঐতিহাসিক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি আছে। তাঁর যে একমাত্র পুস্তকটি আমাদের কাল পর্যন্ত টিঁকে আছে সেটির নাম কমেণ্টারিয়ি। গল যুদ্ধের প্রথম সাত বছর ও গৃহযুদ্ধের যুগের কিছু অংশের বিবরণ এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

Calvin, Jean ১৫০৯—৬৪। বিখ্যাত ফরাসী ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক লেখক ও ধর্মসংস্কারক। পিকার্দির নয়নে জন্ম। ১৫৩৬ এ জেনেভায় বসবাস করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে Servetus কে জীবন্ত দগ্ধ করার ব্যাপারে দায়ী। Institution de la religion chr´etienne (প্রথমে লাতিনে ১৫৩৫) গ্রন্থে আদি পাপ, ও পূর্বনির্ধারিত জীবনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রোমবিরোধী স্কটিশ প্রেসবেটিরিয়ান ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। প্রোটেস্টাণ্ট মতবাদ এই ক্যালভিনীয় শৃঙ্খলাবোধের ভিত্তিতে সংগ্রাম চালায়।

Charcot, J. M ১৮২৫—১৮৯৩। ফরাসী স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ।

Conquistador আমেরিকায় বিশেষতঃ ষোড়শ শতকে মেক্সিকো ও পেরুতে স্প্যানিশ বিজয় অভিযানের স্পেনদেশীয় নেতা।

Corporate State নিগমবদ্ধ রাষ্ট্র। এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় একই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ও মালিকরা কর্পোরেশন বা নিগমে সংগঠিত হয়। অন্যান্য নিগমের সঙ্গে একত্রে এগুলিও জাতীয় নীতি নির্ধারণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ফ্যাসিস্ত আমলে ইতালিতে মুসোলিনি নিগমবদ্ধ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন নিগমগুলির মধ্যে মতপার্থক্য ঘটলে নিজেই চূড়ান্ত মধ্যস্থতাকারী হবেন বলে মুসোলিনি ঘোষণা করেন।

Cicero, Marcus Tullius (১০৬—৪৩ খৃঃ পূঃ)। আর্পিনামের কাছে জন্ম। আইন ও দর্শনের ছাত্র। ৬৩ খৃঃ পূর্বাব্দে কনসাল নিযুক্ত হন। কাতিলিনের

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিখ্যাত। সিজার ও পম্‌পেয়ির মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় পম্‌পেয়ির পক্ষ অবলম্বন করেন। ফার্সালিয়ার যুদ্ধের পর সিজার তাঁকে ক্ষমা করেন। সিজার নিহত হওয়ার পরে তিনি রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্ব দেন এবং মার্ক অ্যাণ্টনির প্রবল বিরোধিতা করেন। Triumvirate প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। De Oratore, De Legibus, De Republica, De Officiis, De Senectute, De Amicitia, De Natura Deorum ইত্যাদি বিখ্যাত রচনা।

Cromwell, Oliver ১৫৯৯—১৬৫৮। ইংরেজ সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। ১৬৫৩—৫৮তে ইংলণ্ডে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার লর্ড প্রোটেক্টর ছিলেন।

Croesus লিদিয়ার শেষ রাজা। মানবজাতির মধ্যে সব থেকে ধনী বলে কথিত। দার্শনিক সোলোনের সঙ্গে কথাবার্তায় নিজেকে সব থেকে সুখী মানুষ বলে দাবি করায় সোলোন বলেন জীবন সুখীভাবে শেষ হওয়ার আগে একথা বলা যায় না। রাজা সাইরাসের হাতে পরাজিত হয়ে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞায় জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার আগের মুহূর্তে তিনবার তিনি সোলোনের নাম উচ্চারণ করেন। সাইরাস এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সোলোনের কথা উল্লেখ করলে মানবজীবনের এই অস্থিরতার কথা শুনে সাইরাস তাঁকে মুক্তি দেন ও বন্ধু হিসাবে স্বীকার করেন।

Crusoe, Robinson ইংরেজ ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল ডিফো (১৬৬০ ?—১৭৩১) রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের নায়ক। পুস্তকটি ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। জাহাজডুবি হয়ে একটি দ্বীপে আশ্রয় পেয়ে সামান্য কিছু জিনিসপত্র সম্বল করে নিজের চেষ্টায় ক্রুসো ছাগল পোষ মানিয়ে, ঘর বানিয়ে এবং শেষে একটি নৌকা বানিয়ে জীবনধারণ করতে থাকেন। অসভ্য গুড ফ্রাইডেকে উদ্ধার করে (মৃত্যুর হাত থেকে) শেষ অবধি একটি ইংরেজ জাহাজের সাহায্যে দেশে ফিরে আসেন।

Dadaism সৌন্দর্য ও সংগঠনের নিয়মগুলির প্রতিষেধ এবং সুচিন্তিত যৌক্তিকতা বিরোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক শিল্প আন্দোলন।

Darwin, Charles Robert ১৮০৯-৮২। বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসক ইরাসমাস ডারুইনের (১৭৩১-১৮০২) পৌত্র। এডিনবরা ও কেমব্রিজে শিক্ষালাভের পর 'বিগ্‌ল্' জাহাজে প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবে বৈজ্ঞানিক অভিযানে যাত্রা করেন। সেখানকার লব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে নানা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৫৯এ প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত গ্রন্থ On the Origin of Species by means of Natural selection। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বাদপ্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু হাক্সলি, লায়েল ও স্যর জোসেফ হুকারের সমর্থন লাভ করেন তিনি। The Descent of Man প্রকাশিত হয়

১৮৭১এ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিবর্তনবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বনিয়াদ।

Eddington, Sir Arthur Stanley ১৮৮২-১৯৪৪। ত্রিনিতি কলেজে শিক্ষালাভ করে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক হন। নক্ষত্র জগৎ এবং নক্ষত্রের অভ্যন্তরীণ গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিশ্ববিখ্যাত। আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা আছে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা বিষয়ে জনপ্রিয় রচনা The Expanding Universe ১৯৩৩এ প্রকাশিত।

Einstein, Albert ১৮৭৯-১৯৫৬। জার্মানির Wurtemburg প্রদেশের উল্‌ম্ শহরে জন্ম। মিউনিক ও সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ। সুইস পেটেণ্ট অফিসে কাজ করেন ১৯০৯ পর্যন্ত; এইখানে থাকতে তাঁর প্রধান তত্ত্বগুলির উদ্ভব। আলোক ও স্থানকাল নিরবচ্ছিন্নপ্রসার সম্বন্ধে যুগান্তকারী তত্ত্বের স্রষ্টা। ১৯১৯ সালে আপেক্ষিকতার সাধারণসূত্র সপ্রমাণ হয়। এই তত্ত্ব নিউটনীয় বিশ্বধারণাকে নাকচ করে দেয়। পদার্থবিদ্যার নানা ক্ষেত্রে গবেষণা করেন, ১৯২১এ পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। ভর ও শক্তির পারস্পরিক পরিবর্তনীয়তা সম্পর্কিত গবেষণা পরবর্তীকালে পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাবকে সম্ভব করে। মানবপ্রেমিক, সরল ও নিরহঙ্কার এই মানুষটি এযুগের জ্ঞানচিন্তার প্রতীক।

Eliot. T. S ১৮৮৮-১৯৬৫। জন্ম মার্কিন দেশে, ইংরেজ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। বিখ্যাত Criterion পত্রিকার লেখক ও সম্পাদক। কবি ও সমালোচক। শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবিদের অন্যতম। The Waste Land (১৯২২), Ash Wednesday (১৯৩০), Four Quartets প্রভৃতি কবিতা, Murder in the cathedral (১৯৪৫), Cocktail Party প্রভৃতি কাব্যনাট্য ছাড়াও Prelude, Dante ('২৯), Homage to John Dryden ('২৪) ইত্যাদি সমালোচনামূলক রচনা বিদগ্ধ মণীষার স্বাক্ষর বহন করে।

Elizabeth I, Queen, ১৫৩৩-১৬০৩। ইংলণ্ডের রাণী (১৫৫৮-১৬০৩)। রাজা অষ্টম হেনরি ও অ্যান বোলিনের কন্যা।

Engels. F. ১৮২০-৮৯৫। জার্মান সমাজতন্ত্রবাদী। কাল মার্ক্সের সহযোগী তাত্ত্বিক ও সহকর্মী সুহৃৎ।

Encyclopedists—Denis Diderot (১৭১৩-৮৪) এবং D'Alembert (১৭১৭-৮৩) এর নির্দেশনায় ১৭৫ থেকে ১৭৭৬ মধ্যে ৩৫ খণ্ডে L' Encyclopedie নামে এক বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হওয়ার পর পুরাতনপন্থীরা রুষ্ট হন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি গোপনে প্রকাশ করতে হয়। এতে যাঁরা লেখেন তাঁদের মধ্যে আছেন:

Buffon. G. L. L de (১৭০৭-৮৮), বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী; Montes-

quieu, C L (১৬৮৯-১৭৫৫) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক ; Rousseau, Jean-Jacques (১৭১২-৭৮) সমাজবিজ্ঞানী ; Voltaire (১৬৯৪-১৭৭৮), প্রকৃত নাম Francois Marie Arouet তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ও বিখ্যাত। Jacques Turgot (১৭২৭-৮১) অর্থনীতিবিদ। অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিবাদী চিন্তা, সত্যনিষ্ঠা ও কুসংস্কারবিরোধিতা এই বিশ্বকোষের মূল দৃষ্টিভঙ্গী।

Entelechy একটি আরিস্ততলীয় বাচ্য (term) বা পদ। এর অর্থ হল কোন কোন ক্রিয়ার (function) বাস্তবায়ন বা পূর্ণ প্রকাশ। পরবর্তী লেখকরা 'যাহা কোন কিছুকে পূর্ণতা দান করে,' আত্মা হিসাবে তাৎপর্য আরোপ করেছেন এই পদটিতে। Rabelais এর রচনায় এটিকে Lady Quintessnece এর রাজত্ব বলা হয়েছে।

Foch, Ferdinand ১৮৫১-১৯২৯। ফরাসী সেনাপতি। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে 'মার্শাল অব ফ্রান্স'।

Forster, E. M. (১৮৭৯-) ইংরেজ ঔপন্যাসিক। Where Angels Fear to Tread (১৯০৫), The Longest Journey (১৯০৭), A Room With a View (১৯০৮), Howards End (১৯১০), The Celestial Omnibus (১১) ও Passage to India (২৪) বিখ্যাত উপন্যাস। Aspects of the Novel (২৭) উপন্যাস সম্পর্কে বিখ্যাত আলোচনা গ্রন্থ।

French, J. D. P ১৮৫২-১৯২৫। ইংরেজ ফিল্ড-মার্শাল

Freud Sigmund (১৮৫৬-১৯৩৯) অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়া প্রদেশের ফ্রেইবুর্গ শহরে ইহুদী পরিবারে জন্ম। মনোসমীক্ষণ বিদ্যার প্রবর্তক। প্যারির বিখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী শার্পের কাছে অধ্যয়ন করেন এবং মনোবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে হিস্টিরিয়া রোগ সম্পর্কে গবেষণা করেন Dr. Breuer এর সঙ্গে একত্রে। অবচেতন, অবদমন ইত্যাদির অস্তিত্ব চেতনাকে প্রভাবিত করে—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

Galsworthy, John ১৮৬৭-১৯৩৩। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর উদ্দেশ্য হল অন্যের দিকনির্দেশক হিসাবে জীবনের অন্ধকার দিকগুলি, তার অমঙ্গলগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো ও মন্দ, জীবনের দুটি দিককেই তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে ও নাটকে। The Forsyte Saga এবং A Modern Comedy এই দুটি উপন্যাসে সম্পদ আহরণের ও অধিকার প্রয়োগের আগ্রহ এবং প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্তভিত্তি এক সমাজের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম The Silver Box (১৯০৯), Strife (০৯), Justice (১০) এবং Loyalties (২২)। ১৯৩২-এ নোবেল পুরস্কার পান।

Gide, Andre (১৮৬৯-১৯৫১) ফরাসী ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও প্রবন্ধকার।

বেনামে প্রকাশিত La Cahiers d 'Andre´ Walter (১৮৯০) থেকে ফরাসী সাহিত্যে নতুনত্বের জোয়ার নিয়ে আসেন। অন্যতম রচনার মধ্যে আছে L' Immoraliste (১৯০৩), Les Caves du Vatican (১৯১৪), Les Faux Monnayeurs ('২৬), Les Counterfeitres ('২৫) এবং আত্মজীবনী Si le grain ne meurt (১৯২১)। ১৯৪৭ এ নোবেল পুরস্কার পান।

Gilgamesh বিখ্যাত আসিরিয়া-ব্যবিলনের পৌরাণিক মহাকাব্যের নায়ক গিলগামেশ। কাহিনীটি বিষয়বস্তু ও গঠনবিন্যাসের দিক থেকে গ্রীক কাহিনী ওরফিউসের কাহিনীর সমগোত্রীয়। দৈব ঔরসে জাত এই বীর উরুক (বাইবেল কথিত এরক) নগরীর রাজা ছিলেন। প্রিয় বন্ধু এনকিডুর মৃত্যু হলে দুঃখে কাতর হয়ে অমরত্বের রহস্য সন্ধানে যাত্রা করেন। নানা দেবতাদৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে জয়লাভ করেন এবং দুর্গম যাত্রার শেষে লক্ষ্যে পৌছান এবং প্রাণপুষ্পের সন্ধান পান। কিন্তু এক সর্প এসে সেই যাদুলতাটি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ায় অমরত্বলাভে বঞ্চিত হন শেষ অবধি।

Haig, D ১৮৬১-১৯০৮ ইংরেজ ফিল্ড মার্শাল।

Hemingway, Ernst (১৮৯৮-) ইলিনয়ে জন্ম। মার্কিন ঔপন্যাসিক। Fiesta (১৯২৬) [আমেরিকায় The sun also Rises নামে পরিচিত], Men with women (২৭), Farewell to Arms (২৯), ইত্যাদি বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেন। পরিশীলিত, বিবেকসম্পন্ন কিন্তু ভাবালুতাহীন দৃষ্টি ভঙ্গীর লেখক। স্পেনের গৃহযুদ্ধে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের হয়ে যুদ্ধ করেন। ১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার পান।

Herzen, A Ivanovich (১৮১২-৭০) সমাজদর্শনের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ও উনিশশতকের রুশ বুদ্ধিজীবী মহলে আমূলপরিবর্তনকারী ঐতিহ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শিলারের নাটকে অনুপ্রাণিত হন এবং নিকোলাই ওগারিয়োভের সঙ্গে ডিসেম্ব্রিস্টদের বিপ্লবাত্মক চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে যান। 'পরবর্তীকালে এঁরা দুজনে শলিডের প্যানথেয়িস্ট আদর্শবাদের সঙ্গে ফরাসী দার্শনিক স্যাঁৎ সিমনের ইউটোপিয় সমাজতন্ত্রের মিলন ঘটানোর চেষ্টা করেন। ছয় বছরের জন্য নির্বাসিত হন। পরবর্তীকালে, শেলিঙের আদর্শবাদ থেকে সরে এসে হেগেলের 'বাস্তববাদী যুক্তিবাদ' এবং ফয়েরবাখের 'বস্তুবাদের' প্রতি আসক্ত হন। ক্রমে হেগেলীয় বামপন্থী হয়ে ওঠেন।

Hindenburg, Paul ১৮৪৭-১৯৩৪। জার্মান ফিল্ড-মার্শাল ও জার্মানীর রাষ্ট্রপতি (১৯২৫-৩৪)।

Hitler, Adolph ১৮৮৯-১৯৪৫। জার্মান চ্যান্সেলর ও ফ্যুরের। ১৯১৯এ জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই বছরেরই শেষ দিকে এই পার্টির পক্ষে হিটলার প্রচার করতে শুরু করেন। ১৯২০তে এই পার্টির নাম হয় National

Socialist বা Nazi পার্টি। ১৯২১এ হিটলার এই পার্টির নেতা হন। S. A (brown-shirt) এবং S.S (black-shirt) নামে সশস্ত্র জঙ্গী গোষ্ঠী তৈরি করে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা করেন ১৯২৩ সালে। ১৯২৪ এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরে বন্দী থাকার সময় Mein Kampf প্রথম খণ্ড রচনা করেন। ১৯২৯ এর বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাতে জার্মানিতে নাৎসিদের প্রভাব বাড়তে থাকে। শেষে ১৯৩২এ রাইখস্টাগে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি হয়ে ওঠে এই নাৎসি পার্টি। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের অধীনে চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন হিটলার। অগাস্ট ১৯৩৪এ হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর রাইখের প্রেসিডেন্ট হয়ে ফ্যুরের হিসাবে স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। ভের্সেই চুক্তি অগ্রাহ্য করে অর্থনীতিতে জাতীয়তাবাদী স্বনির্ভরতার নীতি গ্রহণ করেন এবং প্রবলবেগে দেশকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করতে থাকেন। একই সঙ্গে ইহুদী দলন ও যাবতীয় সোস্যালিস্ট ও কম্যুনিস্ট ট্রেডইউনিয়নগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন দেশে। ১৯৩৮এ অস্ট্রিয়া দখল করে চেকো-শ্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের সঙ্গে মিউনিক চুক্তি সম্পন্ন করেন। হুমকির মুখে মাথানত করে আপোসরফা ও 'সন্তোষসাধনের' জলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে চেম্বারলেনের নাম প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করে। শেষ অবধি এর পরিণতিতে ১৯৩৯এ বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হিটলার যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ১৯৪১এ রাশিয়া আক্রমণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৪১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা ইউরোপের তথা পৃথিবীর ইতিহাসকে নতুন গতিমুখ দিল। সম্ভবতঃ রাশিয়ার বার্লিন আক্রমণের সময় ৩০ এপ্রিল ১৯৪৫ তিনি আত্মহত্যা করেন।

Horace (Quintius Horatius Flaccus ৬৫-৮ খৃ: পূ:)। রোমান কবি। আপুলিয়া প্রদেশের ভেনুসিয়াতে জন্ম। ওরবিলিউসের বিদ্যালয়ে এবং আথেন্সে শিক্ষালাভ। ফিলিপ্পির যুদ্ধে পরাজিত পক্ষে ছিলেন কিন্তু ক্ষমালাভ করে রোমে ফিরে আসেন। এইখানে অগাস্টাসের আমলে বিখ্যাত নাইট Gaius Citinius Maecenas (৭০-৮ খৃ: পূ:) এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। Satires, Odes, Epodes, Epistles ও Ars Poetica রচনা করেন।

Huxley T. H. (১৮২৫-৯৫) ইংরেজ জীববিজ্ঞানী ও চিকিৎসক। চেয়ারিং ক্রশ হাসপাতালে শিক্ষালাভ করেন। ব্যাটল্‌স্নেক জাহাজে সার্জেন হিসাবে ১৮৪৬-৫০ কাজ করেন। প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয়ক নানা গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা ছাড়াও দর্শন ও ধর্মবিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে ইংরেজ জাতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেন। Ethics and Evolution (১৮৯৩) গ্রন্থে বিবর্তনের সংগ্রামের মধ্যে নৈতিকতার ভিত্তি সন্ধানের প্রবণতার বিরোধিতা করেন। নিজের দার্শনিক ভাবনাচিন্তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে 'Agnostic' বা 'অজ্ঞেয়তাবাদী' শব্দটি সৃষ্টি করেন। ডারুইন তত্ত্বের বিশিষ্ট সমর্থক।

James, Henry (১৮৪৩-১৯১৬)। বিখ্যাত আইরিশ-স্কটিশ James পরিবারে নিউইয়র্কে জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের (১৮৪২-১৯১০) ভাই। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারি ও জেনেভাতে অনিয়মিত শিক্ষালাভের পর ১৮৬২ সালে হার্ভার্ডে আইন পড়েন। ১৮৭৫এ ইউরোপে বসবাস করতে থাকেন। বহু উপন্যাস ও শতাধিক ছোট গল্প ছাড়াও ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন। ১৯১৫ সালে ইংরেজ নাগরিকত্ব লাভ করেন।

Janet, Pierre Marie Felix (১৮৬৯-১৯৪৭) ফরাসী মনোরোগবিশারদ। হিষ্টিরিয়া রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। আপাতঃ ক্ষুদ্র উদ্বেগ দ্বারা প্রপীড়িত ব্যক্তিত্বকে পুনর্শিক্ষিত করার পথ আবিষ্কারের কাজে জীবনের শেষভাগ ব্যয় করেন।

Jansen, Cornelius (১৫৮৫-১৬৩৮) ফ্ল্যাণ্ডার্সে Ypres এর বিশপ। রোমান ক্যাথলিক চার্চের অন্তর্ভুক্ত এক বিশিষ্ট মতগোষ্ঠীর প্রবর্তক। মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিকৃতি ও ভালো হওয়ার অক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। ঈশ্বরের প্রেমলাভ করার যোগ্যতা একমাত্র 'conversion' এর দ্বারাই সম্ভব এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তা হতে পারে। জেসুইটরা এই মতগোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতা করে।

Jellicoe J. R. ১৮৫৯-১৯৩৫। ইংরেজ নৌসেনাপতি।

Joan of Arc, St. (১৪১২-৩১) মিউজ উপত্যকায় ডমরেমি গ্রামের এক কৃষি-জীবী পরিবারে জন্ম। ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লসের আমলে ইংরেজদের হাত থেকে ফ্রান্সকে উদ্ধারের জন্য এই অশিক্ষিতা মেয়েটি অসাধারণ প্রচেষ্টা চালান। অরলিয়ঁ থেকে ইংরেজদের অবরোধ তুলে নেওয়া এবং চার্লসকে রেইমে রাজপদে অভিষেক করার ব্রত উদযাপিত হওয়ার পর নিজ গ্রামে ফিরে যেতে চান। কিন্তু ফরাসী দেশপ্রেমিকদের চাপে বার্গান্দিয়রা তাঁকে বন্দী করে ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়, ইনকুইজিশনের সাহায্যে ফরাসী ধর্মাধিকরণ তাঁকে ডাইনী হিসাবে রুয়েঁ শহরে জীবন্ত দগ্ধ করে।

Joffre, J. J. C ১৮৫২-১৯৩১ ফরাসী ফিল্ড মার্শাল।

Joyce, James (১৮৮২-১৯৪১) আইরিশ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প রচয়িতা। আধুনিক সমাজের নীচতা ও ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে তীব্র সজাগতা ও যৌন জীবন সম্পর্কে স্পষ্টবাদিতা তাঁর উপন্যাসে লক্ষণীয়। সমকালীন মনঃসমীক্ষণবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত মানব মনের বিশ্লেষণ তাঁর উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। Stream of consciousness পদ্ধতির প্রবক্তা। তাঁর রচনা Ulysses (১৯২২) আধুনিক কালের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস বলে মনে করা হয়।

Jung, C. G—(১৮৭৫-১৯৬১) সুইস মনোবিজ্ঞানী।

Kepler, Johann (১৫৭১-১৬৩০) উরটেমবুর্গের বিখ্যাত জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। গ্রহদের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর নিয়ম তিনটি নিউটনীয় গতিবিদ্যার ভিত্তিস্থাপনে অনেক সাহায্য করে।

Keynes, John Maynard ১৮৮৩-১৯৪৬। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ, A General Theory of Employment, Interest, and Money (১৯৩৬) গ্রন্থে নতুন অর্থনীতি তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। ১৯১১-৪৪ Economic Journal সম্পাদনা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ট্রেজারিতে কাজ করেন। ১৯২৫ এ রুশ নর্তকী লিদিয়া লোপোকোভার সঙ্গে বিবাহ হয়। ১৯৪০ এ ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ডিরেক্টর।

Kerensky, Alexander Feodorovich (১৮৮১-) ১৯১৭ ফেব্রুয়ারিতে বিপ্লবের স্রোতে রাশিয়ার জারতন্ত্র ভেঙে পড়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর প্রিন্স লোভক অস্থায়ী সরকার গঠন করলেও ব্যবহারজীবী কেরেনস্কি হন সরকারের প্রকৃত প্রধান। জনগণের প্রতিবাদ, সৈন্যদলের অসন্তোষ সত্ত্বেও তিনি সরকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। বলশেভিক পার্টিকে কার্যতঃ বেআইনী ঘোষণা করেন। প্রধান সেনাপতি কর্নিলভ প্রমুখ প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির সহায়তায় সামরিক একনায়কত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখলেও শ্রমিক সৈনিকদের মিলিত অভ্যুত্থানে নভেম্বর মাসে জারের 'শীতপ্রাসাদ' বিপ্লবীরা দখল করলে এই 'বাক্যবীর' নেতা পলায়ন করেন ও রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

Lamarck, Jean Baptiste (১৭৪৪ ১৮২৯) ফরাসী জীববিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তাঁর মতে প্রজাতিরা অপরিবর্তনযোগ্য নয়; উচ্চতর ও জটিলতর প্রাণরূপগুলি নিম্নতর ও সরলতর রূপগুলি থেকে উদ্ভূত; পরিবেশ ও নতুন প্রয়োজন নতুন অঙ্গ সৃষ্টি করে এবং সেগুলিতে বংশধরদের উত্তরাধিকার হয়। তাঁর অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার তত্ত্বটি ডারুইন গ্রহণ করলেও অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের তীব্র মতপার্থক্য।

Lawrence, D. H. (১৮৮৫-১৯৩০)। ইংরেজ ঔপন্যাসিক, কবি ও প্রবন্ধকার। মানব অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যাগুলি তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। মননের থেকে হৃদয়ের প্রতি আবেদনই তাঁর বেশি লক্ষ্য। আদিম সহজপ্রবৃত্তি ও অতিরাগের উপর গভীর আস্থায় যৌন জীবনকে এক আত্মিক ধর্মীয়বোধের দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছেন। Sons and Lovers (১৯১৩), Aeron's Rod ('২২), Kangaroo ('২৩), The white Peacock, The Rainbow এবং The Prussian Officer ১৯২৯ এ প্রকাশিত। Lady Chatterlcy's Lover (১৯২৮) প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি করে। ১৯২২এ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ Fantasia of the Unconscions প্রকাশিত হয়। ১৯২৮এ প্রকাশিত হয় সমগ্র কাব্যসংগ্রহ।

Lawrence, T. E (১৮৮৮-১৯৩৫)। অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ শেষে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে সিরিয়ায় খননকার্য চালান। বিস্ময়কর ঘটনাপূর্ণ জীবন নানা দুঃসাহসিক ভ্রমণ ও অভিযানে কাহিনী হয়ে উঠেছে। ভ্রমণকাহিনী The

Seven Pillars of Wisdom বিষয়গুণে ও রচনাশৈলীতে বিশিষ্ট। ১৯১৪-১৮ মহাযুদ্ধে ইংরেজ অফিসার হিসাবে ইজিপ্ট থেকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে মক্কার শেরিফকে তাঁর বিদ্রোহে সাহায্য করার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়। আরবদের মধ্যে জনপ্রিয়তার জন্য লরেন্স অব আারাবিয়া নামে খ্যাত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর রয়াল এয়ারফোর্সে যোগ দেন বিমানচালক হিসাবে।

Lenin, Nikolai ১৮৭০-১৯২৪ প্রকৃত নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ। জন্ম সিমবিস্কে'র এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। ১৮৮৭তে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত ও কাজান থেকে নির্বাসিত। ১৮৮৮র হেমন্তকালে কাজানে ফিরে আসার অনুমতি পান। ৮৯১তে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯২তে সামারায় আইনজীবীর পেশার আড়ালে মার্ক্সবাদী প্রচারের মধ্য দিয়ে নারদনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। ১৮৯২তে সেন্ট পিটার্সবুর্গে আসেন। ১৮৯৫তে সেখানকার সমস্ত মার্ক্সবাদী গোষ্ঠীগুলকে ঐক্যবদ্ধ করে 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য লীগ অব স্ট্রাগল' প্রতিষ্ঠা করেন। চোদ্দ মাস কারাবাসের পর ১৮৯৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন এবং সেখানে নাদেঝদা ক্রুপস্কাইয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯০০ সালে নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হলে পুসাকভে বসবাস শুরু করেন এবং জার্মানী থেকে 'ইস্ক্রা' বা স্ফুলিংগ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন (১৯০১) এবং এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন ও অবিরত মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেন। রুশ সরকারের গ্রেপ্তার এড়িয়ে বার বার নানা দেশে আত্মগোপন করে শেষে ১৯১৭ হেমন্তকালে দেশে ফিরে এসে বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংগঠিত করে নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন করেন ও পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। স্টেট অ্যাণ্ড রেভলিউশন' পুস্তকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন অধ্যায় প্রবর্তন করেন। প্যারি কমিউনের পরাজয়ের পরিণতিতে কার্যতঃ ১৮৭২ সালে মার্ক্স প্রতিষ্ঠিত 'প্রথম আন্তর্জাতিকের' (১৮৬৪) অবলুপ্ত ঘটে। পরে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্য ও সংহতির তাগিদে ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমাজতন্ত্রীরা নিজ নিজ দেশের সরকারের পক্ষ অবলম্বন করলে শ্রমিকসাধারণ তাদের ছেড়ে যায়। এদিকে সারা বিশ্ব জুড়ে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নভেম্বর ১৯১৭তে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়লাভ করে। ১৯১৯ মার্চে লেনিনের নেতৃত্বে মস্কোয় আনুষ্ঠানিকভাবে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্বের সর্বহারার একনায়কত্ব বাস্তবে কার্যকর করার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ বসন্তকালে আমেরিকা, বৃটিশ, ফ্রান্স ও জাপান দেশের মধ্যকার প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে একযোগে নবগঠিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করতে থাকলে সামরিক তৎপরতার সঙ্গে তার মোকাবিলা করেন এবং

১৯২০তে তাদের মিলিত শক্তিকে পর্যুদস্ত করে নতুন অর্থনৈতিক নীতি বা 'নেপ' গ্রহণ করেন। আগষ্ট ১৯১৮তে আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হন। ১৯ ৪ সালের ২১ জানুয়ারি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

Leonidas ৪৯১-৪৮০ খৃঃ পূর্বাব্দে স্পার্তার রাজা ছিলেন। ৪৮০ খৃঃ পূর্বাব্দে জেরক্সেসের আগ্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে থার্মোপিলির গিরিসংকটকে রক্ষা করার যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখান।

Lloyd George, D ১৮৬৩-১৯৪৫ ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ ও প্রধান মন্ত্রী (১৯১৬-২২)।

Ludendorff, Erich Friedrich Wilhelm ১৮৬৫-১৯৩৭ জার্মান সেনাপতি।

Luther, Martin (১৪৮৩-১৫৪৬) জার্মানিতে রিফর্মেশনের নেতা। আইসলেবেনে জন্ম। অগাস্তিনীয় মতগোষ্ঠীর সমর্থক হিসাবে রোমে যান। সেখানে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত যাজকসম্প্রদায়ের দুর্নীতিপরায়ণ জীবন দেখে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় এবং পরবর্তীকালে পোপের বিরোধিতা করে উইটেনবুর্গ গির্জার দরজায় তাঁর বিখ্যাত রচনা 'থিসিস' টাঙিয়ে দেন। ১৫২১এ পোপের নিষেধাজ্ঞা জারি হয় তাঁর উপর। সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করে গৃহী হন এবং লীগ অব প্রোটেস্ট্যান্টিজম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। বাইবেল অনুবাদ করেন (১৫৩৪) জার্মান ভাষায়।

Mann, Tom (১৮৫৬-১৯৪১) ইংরেজ শ্রমিক নেতা। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত লণ্ডন ডক-শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত করেন। ১৮৯৪-৯৭ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির সম্পাদক ছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের পর অস্ট্রেলিয়ায় কাজ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

Marlborough, Duke of : ব্যাভেরিয়ায় ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ব্লেনহাইয়ের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি দায়িত্বে উপনীত হয়ে প্রিন্স ইউজিনের সঙ্গে যোগ দেন এবং ফরাসী ও ব্যাভেরিয় সেনাধ্যক্ষ মার্শাল ট্যালার্ডকে পরাস্ত করেন।

Marx, Karl (১৮১৮-৮৩) জন্ম প্রুশিয়ায়। প্রথমে আইন পড়েন ও পরে দর্শনের গবেষণা সাঙ্গ করেন। কোলোন শহরে ১৮৪২এ Rheinsche Zeitung প্রকাশ করেন। আমূল পরিবর্তনকামী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে মুদ্রনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলে প্যারি চলে যান। সেখানে এঙ্গেলসের সঙ্গে পরিচয় ও যৌথভাবে দর্শন বিষয়ক রচনাকার্য করেন। সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ব্রাসেলসে যান। ১৮৪৮ এর বিপ্লবী আন্দোলনের সময় কোলোনে ফিরে আসেন এবং এঙ্গেলসের সহযোগিতায় Neue Rheinische Zeitung সম্পাদনা করেন। বিপ্লবী ও সাম্যবাদী মতামতের জন্য আবার বিতাড়িত হন। শেষে লণ্ডন শহরে বসবাস করেন। বিখ্যাত Communist Manifesto প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক রূপ দেন

এই গ্রন্থে। ১৮৬৭তে প্রকাশিত হয় Das Kapital এর প্রথম খণ্ড। অর্থনীতি তত্ত্বের এই বিশ্ববিশ্রুত রচনাটি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খসড়া কাগজপত্র থেকে সমাপ্ত করেন এঙ্গেলস। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই সমালোচনামূলক পুস্তকটিতে মার্ক্স পুঁজির রূপ ও চরিত্র বিশ্লেষণ করেন এবং পণ্যের মূল্য ও শ্রমিকদের মজুরির মধ্যকার সম্পর্কটি উদ্ঘাটিত করেন এবং উদ্বৃত্ত মূল্য ও মুনাফার মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকদের শোষণের অবসানের উদ্দেশ্যে শ্রেণীসংগ্রামের পথে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে শ্রেণীহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথনির্দেশ করেন। শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন 'প্রথম আন্তর্জাতিকের' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৫এর শেষদিকে লণ্ডন শহরে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তিতে বস্তু ও ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় সাধনেই ইতিহাস ও ব্যক্তিজীবন গড়ে ওঠে।

Midas ফ্রিজিয়ার পুরাণবর্ণিত রাজা। দিয়োনিসাসের শিক্ষক পথভ্রান্ত সিলেনাসকে আতিথেয়তা জানানোর পুরস্কার হিসাবে যা কিছু স্পর্শ করবেন তাই সোনা হয়ে যাওয়ার বর লাভ করেন। বিব্রত হয়ে শেষে দিয়োনিসাসের কৃপায় পাকতোলাস নদীতে হাত ধুয়ে এই বর থেকে অব্যাহতি পান। আর একবার প্যানকে আপোলোর থেকেও বড় বংশীবাদক বলায় ক্রুদ্ধ আপোলোর শাপে তাঁর কান দুটি গাধার কানের মত হয়ে যায়। কানের কথা সকলের কাছে গোপন করলেও তাঁর নাপিত তা দেখতে পায়। প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে অথচ গোপনীয়তা বজায় না রাখতে পেরে নাপিত এক শরবনে গিয়ে সেই কথা চুপিচুপি উচ্চারণ করে। সেই থেকে হাওয়া লাগলেই শরবন বলে ওঠে মিদাসের গাধার মত কানের কথা।

Milton John (১৬০৮-৭৪) শেক্সপীয়রের পর দ্বিতীয় ইংরেজ মহাকবি বলে পরিচিত। গৃহযুদ্ধের কালে প্রখ্যাত রাউণ্ডহেডপন্থীদের উপর যে নির্যাতন চলছিল তা থেকে কোন মতে নিষ্কৃতি পান। ওলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে নবগঠিত কাউন্সিল অব স্টেটের লাতিন সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। অন্ধত্ব দেখা দিলে ওয়েস্কারলিন, মেডোজ ও মারভেল তাঁকে পর্যায়ক্রমে সাহায্য করেন। প্রথম জীবনে Comus (১৬৩৪,), Lycidas ('৩৭) ইত্যাদি কাব্য রচনার পর সনেট রচনায় মন দেন। শেষ জীবনে Paradise Lost, Samson Agonistes ও Paradise Regained রচনা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে Areopagitica (১৬৪৪) নামক ভাষণটি বিখ্যাত গদ্যরচনা।

More, Sir Thomas (১৪৭৮-১৫৩৫), ইংরেজ লেখক ও রাজপুরুষ। ইরাসমাস, কোলেৎ প্রভৃতি মনীষিদের সংস্পর্শে এসে সে যুগের মানবতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। ১৫১৮তে অষ্টম হেনরির প্রিভি কাউন্সিলার হন। অষ্টম

হেনরির নতুন উত্তরাধিকার আইন এবং রাণী ক্যাথারিনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ সমর্থন না করায় রাজদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। অগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে Utopia গ্রন্থে (১৫১৬)। কাল্পনিক আদর্শরাষ্ট্রের চিত্র আছে এই গ্রন্থে। শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ও সমালোচক হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন।

Mussolini, Benito ১৮৮৩-১৯৪৫ ইতালীয় ফ্যাসিস্ট মুখ্যমন্ত্রী ও ডিক্টেটর। ১৯১৫র প্রথম দিকে ইতালির সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে মুসোলিনি ও কোরিদোনির নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠী পৃথক হয়ে গিয়ে ফাসিও ইনতারভেনতিস্তা স্থাপন করে এবং যুদ্ধে 'হস্তক্ষেপ করার' নীতি প্রচার করতে থাকে, এদের পত্রিকার নাম ছিল Il Popolo d' Italia। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে শান্তি স্থাপিত হলে সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রাধান্য বাড়তে থাকে এবং হস্তক্ষেপ নীতির ফলে উৎপন্ন অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে তারা প্রচার করতে থাকে। মুসোলিনি এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন না করে কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছোট গোষ্ঠী তৈরি করেন। এই গোষ্ঠীর নাম ফাসিও নাৎসিওনাল দি কমবাতিমেন্তো, হিংসাত্মক সমেত যে কোন উপায়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রতিরোধ করাই হল এদের ঘোষিত লক্ষ্য। এই ফ্যাসিওর সদস্যদের ফাসিস্তি বলা হত। ক্রমে সমর্থনলাভ করে সারা ইতালিতে এই গোষ্ঠী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২১এর শেষ দিকে সরকার এদের বেআইনী সশস্ত্র বাহিনী হিসাবে ঘোষণা করতে উদ্যত হলে পার্তিতো নাৎসিওনাল ফাসিস্তা নামে একটি নতুন পার্টি স্থাপিত হয় এবং পুরাতন কমবাতিমেন্তো এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। রোমান স্বস্তিকা (fasces) এই পার্টির প্রতীকচিহ্ন হয়। ১৯২২ অক্টোবরে ফাসিস্ত কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। মুসোলিনি দাবি করে সরকার ফাসিস্তদের হাতে শাসনভার অর্পন করুক। তৎক্ষণাৎ এরা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং ক্ষমতা দখল করে। বছর শেষ হওয়ার আগেই মুসোলিনি প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯২৫এ নতুন সংবিধান গৃহীত হলে তিনি রাষ্ট্রের ডিক্টেটর হন। ১৯৩৫-৩৬এ আবিসিনিয়া জয় করেন। ১৯৩৬এ মুসোলিনি ও হিটলার স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং ১ নভেম্বর ১৯৩৬ 'বার্লিন-রোম-অ্যাক্সিস' ঘোষিত হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৩৯এ বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে মুসোলিনি ইতালির নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে, কিন্তু জার্মানির জয়লাভ সুনিশ্চিত মনে হলে জুন ১৯৪০এ 'মিত্রপক্ষের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জুলাই ১৯৪৩এ মিত্রপক্ষ সিসিলি আক্রমণ করলে ফ্যাসিস্ত গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে মিত্রপক্ষের হাতে ধরা পড়লেও জার্মানরা তাঁকে উদ্ধার করে এবং আবার তিনি ইতালিতে ফ্যাসিবাদীদের পরিচালনা করতে থাকেন। শেষে

ইতালীয় পার্টিজানদের হাতে বন্দী হন। ২৮ এপ্রিল ১৯৪৫ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

Napoleon Bonaparte (১৭৬৯-১৮২১)। জন্ম কর্সিকায়। ১৭৯৬-৯৭তে ইজিপ্ট জয় করার জন্য পাঠানো হয় তাঁকে। ১৭৯৯তে ফিরে এসে সেই বছরেরই শেষ দিকে সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করে সরকারের প্রধান পদ গ্রহণ করেন। ইউরোপ বিজয় শুরু করে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। ১৮১২তে রাশিয়া অভিযান করলে ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন শুরু হয়। ওয়েলিংটনের বিজয় ও লাইপজিগের যুদ্ধে পরাজয়ের পর সিংহাসন ত্যাগ করেন। ওয়াটালু'র যুদ্ধে (১৮১৫) পরাস্ত হয়ে সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিতের মৃত্যু বরণ করেন।

Newton, Sir Isaac (১৬৪২-১৭২৭)। বিখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ ও দার্শনিক। আলোকতত্ত্ব, বর্ণতত্ত্ব, গতিসূত্র, মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষ-তত্ত্ব দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। Method of Fluxions নামে গণিততত্ত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিয়ে লাইবনিৎসের সঙ্গে তিক্ত কলহের সূত্রপাত হয়।

Ormuzd or Ormazd আভেস্তায় অহুর মাজদা নামে উল্লেখিত।

Parmenides (জন্ম খৃঃ পূঃ ৫১০ ?—) ইতালির এলেয়া (Elea) অঞ্চলে জন্ম। এলেয়াপন্থী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। হেরাক্লিটাসের মতকে বর্জন করে বিশ্বকে একক, নিরবচ্ছিন্ন, পরিবর্তনহীন, অবিভাজ্য সমগ্র হিসাবে দেখেন। রূপান্তরযোগ্য (mutable) সামগ্রী এবং গতির মতো প্রতিভাসগুলি তাঁর মতে বিভ্রম।

Dos Passos, John Roderigo. ১৮৯৬—মার্কিন লেখক। উপন্যাসে চলচ্চিত্রের পদ্ধতি প্রচলন করেন। বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে যাবতীয় অতিরিক্ত অংশগুলি বর্জন করাই তাঁর লক্ষ্য এবং দৃশ্যগুলিও দ্রুতগতিসম্পন্ন। মার্কিন জীবনযাত্রার প্রচণ্ড গতিবেগ প্রকাশের কাজে যে পদ্ধতিটি তিনি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন তাতে 'ক্যামেরার-চোখ' এবং 'সংবাদ-প্রবাহ' প্রক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। The 42nd Parallel ('৩০), Nineteen-nineteen ('৩১) বিখ্যাত উপন্যাস।

Picasso, Pablo (১৮৮১-১৯৭৩) স্পেনদেশীয় চিত্রকর ও ভাস্কর। জন্ম মালাগায়। গত শতাব্দীর শেষ দিকে প্যারিতে চলে আসেন যখন তখনই রেখাঙ্কনে পারদর্শী। বিংশশতকের প্রথমভাগে শিল্পকলায় কিউবিজম নামে এক নতুন ধারা দেখা দেয়। বস্তু থেকে বক্ররেখা বর্জন করে প্রিজম, কিউব অক্টাহেড্রন প্রভৃতি আদি রূপগুলির মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক প্রকাশের উপর জোর দেওয়া হয় এই মতবাদে। জর্জ ব্রাক, না পিকাসো কে যে কিউবিজমের জনক তা নিয়ে মতভেদ আছে। আবার Paul Cezánne (১৮৩৯-১৯০৬) এর ছবিতেও এর প্রয়োগ দেখা যায়। প্যারিতে এই সময় নিত্য নতুন চিত্রাঙ্কন

ধারার উদ্ভব ঘটতে থাকে। পিকাসো তার স্বীকৃত নেতা। স্পেনের বর্বর গৃহযুদ্ধে ছোট্ট বাস্ক শহরটির উপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগামী বীভৎসতার যে মহড়া হয়ে গেল তাকে বিদ্রূপ করে চিরকাল অম্লান থাকবে Guernica চিত্রটি।

Planck, Max Karl Ernst Ludwig ১৮৫৮-১৯৪৮। জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী।

Plato (? ৪২৭-৩৪৮ খৃঃ পূঃ) আথেন্সের বিখ্যাত দার্শনিক। সক্রাতেসের শিষ্য। সক্রাতেসের মৃত্যুর পর (৩৯৯ খৃঃ পূঃ) মেগারায় চলে যান। ৩৮৬ খৃঃ পূঃ নাগাদ আথেন্সের কাছে একটি জলপাইকুঞ্জে আকাদামিতে দর্শন শিক্ষকতা করতে থাকেন। Dialogues রচনাবলীতে আলোচনাচক্রের ভঙ্গীতে নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। সক্রাতেসকে এই আলোচনা পরিচালকের ভূমিকায় দেখান হয়েছে। দিয়ালোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: Protagoras, Gorgias, Phaedo, Symposium, Republic, Phaedrus, Parmenides, Sophist, Philebus, Laws, Apology (বিচারসভায় সক্রাতেসের আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি)। Republic গ্রন্থে আদর্শ-রাষ্ট্রের প্রথম কল্পনা। Phaedo পুস্তকে সক্রাতেসের মৃত্যুর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মর্যাদায় মহীয়ান। সৌন্দর্য ও জীবন সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতির অন্যতম বাহক। তাঁর Theory of Ideas গ্রন্থকে ইউরোপের ভাববাদী দর্শনের উৎস বলা যায়। এই তত্ত্বে তিনি বস্তুর যে ভাব (Idea) বা রূপের (form) কথা বলেছেন তার প্রকৃতি অনেকটা ওই বস্তু সম্পর্কে আমাদের বিমূর্ত ধারণার মতো, কিন্তু ইন্দ্রিয়বেদী জগতের বাইরেও তার একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এ হল পরিবর্তনশীল অবভাসের (appearance) অন্তরালের অপরিবর্তনশীল বাস্তব। সক্রাতেসের মতো প্লাতোর কাছেও গুণ (virtue) হল জ্ঞান, এই 'পরম ভাব' সম্পর্কে জ্ঞান, যার মধ্যে তাকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা নিহিত আছে। এই পূর্ণাঙ্গ গুণ অল্প কয়েকজনই মাত্র পায়। সাধারণ ব্যবহারিক গুণ হল শিক্ষার দ্বারা বিকশিত, মানুষের যথার্থ প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ আচরণ। শিক্ষা রাষ্ট্রের আইনগুলির বিধিনিষেধের প্রতিনিধিত্ব করে।

Plekhanov, Georgi Valentinovich (১৮৫৬-১৯১৮) রুশ দার্শনিক। ১৮৭৭এ 'জমি ও স্বাধীনতা' নামে একটি পপুলিস্ট প্রতিষ্ঠানের নেতা হয়ে ওঠেন। পরে সন্ত্রাসবাদবিরোধী একটি শান্ত দল গঠনের মধ্য দিয়ে গণবিক্ষোভ গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য জেনেভা ও অন্যত্র বাস করেন। রাশিয়ায় ১৯১৭র ফেব্রুয়ারি বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে দেশে ফেরেন। শেষ দিকে বলশেভিক বিরোধী হয়ে ওঠেন।

Proust, Marcel (১৮৭১-১৯২২) ফরাসী ঔপন্যাসিক। A la recherche du temps perdu উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি ১৯১৪তে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজ দু'পক্ষে বিভক্ত হয়ে যায়—প্রুস্তপন্থী ও প্রুস্তবিরোধী। জীবিত কালে মোট চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়, বাকি চারটি মৃত্যুর পরে।

বইটিতে এক বিশেষ ধরনের তত্ত্ববিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। তা হল : কাল সম্বন্ধে অবাস্তবতা ও দিকপরিবর্তনীয়তা, অতীতের পুনরুদ্ধারের জন্য বৌদ্ধিক স্মৃতির থেকে ইন্দ্রিয়বেদিতার ক্ষমতার প্রাধান্য, এবং কাল ও মৃত্যুকে প্রবঞ্চিত করার জন্য বিষয়ীর যথাযোগ্য ক্ষমতা। এছাড়াও আছে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আর আশ্চর্যজনক বিচিত্র চরিত্রচিত্রণ।

Richardson, Dorothy (১৮৭৩-১৯৫৭) ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিক। বারো খণ্ডে বিখ্যাত উপন্যাস Pilgrimage রচনা করেন ১৯১৫-৩৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর 'চেতনাপ্রবাহ' পদ্ধতির ব্যবহার ভার্জিনিয়া উলফ ও জেমস জয়েসের রচনায় প্রভাব ফেলে থাকতে পারে বলে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। প্রচলিত অর্থে কোন প্লট, কমেডি ট্র্যাজেডি, প্রেমবিষয়ক আগ্রহ বা বিপর্যয় এই উপন্যাসে অনুপস্থিত; আছে শুধু একটিমাত্র চরিত্র মিরিয়ম হেণ্ডারসন, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে বহির্জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির উদ্দীপনা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে যে সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার জন্ম দিচ্ছে তার বিবরণ। মিরিয়মের কাছে জীবন হল 'অসংখ্য পরমাণুর অবিরাম বর্ষণ'। চির-বর্তমান মিরিয়মের মনে।

Rockfeller, John Davison (১৮৩৯-১৯৩৭)। সামান্য অবস্থা থেকে ধনকুবের হয়ে ওঠেন। ১৮৭০এ Standard Oil Co সংগঠিত করেন। ১৮৯০ থেকে মানবকল্যাণে অর্থব্যয় শুরু করেন ; ১৯২৭ পর্যন্ত ১০ কোটি পাউণ্ড এই বাবদ ব্যয় করেন। তাঁর ছেলেও (একই নাম) পিতার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন।

Rolland Ramain (১৮৬৬-১৯৪৪) ফরাসী ঔপন্যাসিক, জীবনীকার, নাট্যকার সঙ্গীতের ইতিহাসরচয়িতা ও সমালোচক। দশ খণ্ডে সমাপ্ত জঁ। ক্রিস্তফ (১৯০৪-১২) পৃথিবীর বৃহত্তম উপন্যাস। Beethoven (১৯০৩), Michel Ange (১৯০৭), রামকৃষ্ণের জীবনী অন্যতম রচনা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যুদ্ধবিরোধী ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও সংগঠক। শেষ জীবনে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করেন।

Romains, Jules ১৮৮৫- । ফরাসী লেখক লুই ফারিগুলের ছদ্ম নাম। আধুনিক ফরাসী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে roman-fleuve বা উপন্যাসনদী নামের একধরনের পারিবারিক কালপঞ্জী রচনার প্রবণতা দেখা যায়। জুলে রোমাঁর Men of Good Will সেই ধরনের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। প্যারিসীয় পরিবেশে আধুনিক মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ লিপিবদ্ধ করাই লেখকের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। এই উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোনও ধরনের ঐক্য, প্রধান ধারণা বা দৃষ্টিকোণ প্রতিষ্ঠার কোনও প্রয়াস উপন্যাসটিতে অনুপস্থিত।

Roosevelt, F. D (১৮৮২-১৯৪৫) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন চার বার। বিখ্যাত নিউ ডিল অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগ করেন। ইউরোপে

শান্তিস্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালান কিন্তু হিটলারের আগ্রাসী নীতি চরমে উঠলে বৃটেনকে নিরঙ্কুশ সাহায্য দেন (লেণ্ড-লীজ নীতি)। পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণ ঘটলে (১৯৪১) অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি যুদ্ধের সময় বিদেশে যান মিত্রপক্ষীয় সরকারের সঙ্গে আলাপআলোচনার উদ্দেশ্যে। চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে এবং হিটলারের পরাজয়ের কিছু দিন আগে মৃত্যু হয়।

Rousseau, Jean Jacques (১৭১২-৭৮) জন্ম জেনেভায়। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক রচনার জন্য কর্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টি আকর্ষণ করেন অতি অল্পদিনের মধ্যেই। Discourse on the influence of Learning and Art (১৭৫০), Discourse on the origin of Inequality (১৭৫৪), La Nouvelle He´loise (১৭৬১), Du Contrat Social (১৭৬২)এবং Emile (১৭৬২)। Emile প্রকাশের পর নির্বাসিত হন। প্রথমে জেনেভায়, পরে ইংলণ্ডে ১৭৬৭ পর্যন্ত বাস করেন। তাঁর মতে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ সুখী ও ভালো ছিল। সেই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সরে যাওয়ার কারণেই মানুষ মন্দ হয়েছে, পাপের কারণে নয়। এই বাঞ্ছনীয় অবস্থায় ফিরে আসার জন্য মানুষকে জীবন থেকে কৃত্রিম জিনিস-গুলিকে বর্জন করতে হবে। সহজপ্রবৃত্তির নির্দেশেই আমাদের চলতে হবে, কারণ তার মধ্যেই আছে এক করুণাময় দৈব আত্মা যা গুণকে পুরস্কৃত করে, অপরাধকে শাস্তি দেয় এবং মানুষের আত্মা স্বাধীন ও মৃত্যুহীন। রাজনৈতিক দর্শনের দিক থেকে রাষ্ট্রকে তিনি জনগণের প্রভু মনে করেন না। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল জনগণের বাধ্যতামূলক নির্দেশদাতা (peoples mandatory)।

Russell, Bertrand Arthur (১৮৭২—) ইংরেজ গণিতবিদ ও দার্শনিক। The Principles of Mathematics (১৯০৩), The Problems of Philosophy (১২) প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ। যুক্তিবাদী চিন্তাধারার আপোষহীন প্রবক্তা। তাঁর তত্ত্বকে বাস্তববাদী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। প্রয়োগবাদ ও অভিজ্ঞতার বহুত্বের স্বীকৃতি তার মধ্যে আছে, আবার ব্যবস্থার সংবদ্ধতার বিষয়েও তিনি নিঃসংশয় নন কিন্তু বৈচিত্র্যকেও তা এক বৌদ্ধিক ও অবিভাজ্য (irreducible) বৈশিষ্ট্য দান করে। পারমাণবিক যুদ্ধের বীভৎসতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে যে প্রবল আন্দোলন ইউরোপে গড়ে উঠতে থাকে তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

Shakespeare, William (১৫৬৪-১৬১৬)। আভন নদীর ধারে স্টাটফোর্ড গ্রামে জন্ম। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবি হিসাবে স্বীকৃত। ট্র্যাজডি, কমেডি, ঐতিহাসিক নাটক এবং কাব্য রচনার সংখ্যা ত্রিশের অধিক। অন্যান্য নাট্যকারের সঙ্গে যৌথভাবে নাটক লেখারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

রাজদরবার থেকে শুরু করে জল্লাদ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের মানুষের মর্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। জীবনবোধের গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে নাটকগুলি বিশ্বের সম্পদ। সমগ্র রচনাবলী প্রথম সম্পাদিত হয় মৃত্যুর সাত বছর পরে (১৬২৩)। এই প্রথম ফোলিও সংস্করণ থেকে অদ্যাবধি বহু পণ্ডিত বহু সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন। বহু গবেষণার উপলক্ষ্য এই মহাকবির জীবন ও রচনা।

Sheol ইহুদীপুরাণের (O. T.) Revised Versionএ শব্দটি প্রায়ই উল্লেখিত। Authorised Versionএ এটিকে নরক, কবর বা গহ্বর হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। হীব্রু জাতির লোকেরা এটিকে মৃতদের বাসস্থান, ঘন অন্ধকারে আবৃত পাতালের এলাকা হিসাবে মনে করত।

Spengler, Oswald ১৮৮০-১৯৩৬ জার্মান দার্শনিক।

Stalin, Joseph ১৮৭৯-১৯৫৩। প্রকৃত নাম যোসেফ ভিসারিয়োনাভিচ জুগাসভিলি। জর্জিয়ার গোরী শহরে জন্ম। ১৮৯৪তে তিফলিসের পাদ্রীদের সেমিনারিতে ছাত্র এবং ১৮৯৯ সালে 'রাজনৈতিক দিক থেকে অবাঞ্ছিত' হিসাবে সেখান থেকে বহিষ্কৃত। ১৯০১ সালে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। দীর্ঘ ষোল বছর ধরে আত্মগোপন, গ্রেপ্তার, কারাবাস, নির্বাসন ভোগ ও বার বার পলায়ন করেন এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের পরিচালনায় অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় জাতি ও ভাষা সমস্যার বিষয়ে নীতিনির্ধারণ করেন। লেনিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত দেশে ধনতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রেলিপ্ত চক্রান্তকারীদের পর্যুদস্ত করেন এবং ১৯২৮এ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলা কালে ১৯৪১ জুন হিটলারের ফ্যাসিস্তবাহিনী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করলে অসীম বুদ্ধিমত্তায় যুদ্ধ পরিচালনা করে ফ্যাসিস্ত শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন এবং মার্ক্সীয় চিন্তাধারা ও বিশ্ব ইতিহাসের অগ্রগতিতে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। ১৯৫৩ মার্চে তাঁর মৃত্যু হয়।

Stein, Gertrude ১৮৭৪-১৯৪৬। মার্কিন লেখিকা।

Sulla Felix, Lucius Cornelius। ১৩৮-৭৮ খৃঃ পূঃ। রোমান সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ।

Tamburlane (—১৪০৫)। তৈমুরলঙ। চেঙ্গিস খানের বংশজাত বলে কথিত। সমরখন্দে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রাস ও ধ্বংসের বন্যা বইয়ে দেন তুর্কিস্থান, সাইবেরিয়া, পারস্য ও ভারতের নানা অংশে। দিল্লি অধিকার করে ভারতে মোগল রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন।

Toller, Ernst ১৮৯৩। জার্মান বিপ্লবী কবি ও নাট্যকার। ইংরেজি

অনুবাদে তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির নাম 'দি মেশিন রেকার্স' (১৯২৩), 'মাসেস অ্যাণ্ড ম্যান' (১৯২৩) ও 'দি সোয়ালো বুক' (১৯২৪)।

Tolstoy, Leo Nikolaevich ১৮২৮-১৯১০। সম্রান্ত ও ধনীবংশে জন্ম। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এবং সিবাস্তোপোল আক্রমণে উপস্থিত ছিলেন। চিন্তার ক্ষেত্রে আন্তরিক নিষ্ঠার তাগিদে পরবর্তী জীবনে বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করে কৃষকের জীবন যাপন করতে থাকেন। অমঙ্গলের প্রতি অসহযোগ, সরকার ও জাতীয়তা, গির্জা ও ধর্মান্ধতার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর এবং মানব প্রেম তাঁর বৌদ্ধিক সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর বিপুল চরিত্রবল জীবদ্দশায় তাঁকে খ্যাতি ও মহত্ত্বের এমন উচ্চস্তরে উন্নীত করেছিল যে খোদ সম্রাটের সরকারও তাঁর সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলত, যদিও তাঁর রচনাদি যথারীতি সেন্সর করা হ'ত। রাশিয়ার বাইরেও তাঁর খ্যাতি সুপ্রচারিত। নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের কালের দুই রুশ পরিবারের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (১৮৬৫-৭২ রচনাকাল), রাশিয়ার মানুষের জীবন্ত চিত্র: আনা কারেনিনা (১৮৭৫-৭৬), ইভান ইলিয়িচের মৃত্যু (১৮৮৪), ক্রয়েৎজার সোনাতা (১৮৯০) রেজারেকশন (১৮৯৯) ইত্যাদি উপন্যাসে তাঁর ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক চিন্তার প্রকাশ। ছোট গল্পেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ রুশ ঔপন্যাসিক।

Trotsky, Leon ১৮৭৯—১৯৪০। প্রকৃত নাম লেভ দেভিদোভিচ ব্রনস্টাইন। রুশ বলশেভিক পার্টির অন্যতম নেতা। লেনিনের সঙ্গে তীব্র মতভেদ দেখা দেয় এবং 'চিরস্থায়ী বিপ্লবের' তত্ত্বের প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। 'পশ্চিম ইউরোপে গণবিপ্লব না হলে একমাত্র রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র স্থাপন করা যাবে না' এই ছিল তাঁর বক্তব্য। লেনিনের 'বৈদ্যুতীকরণ' নীতিরও বিরোধিতা করেন। লেনিনের মৃত্যুর পর সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের সময় 'আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র মহাযুদ্ধে নাম সামনে উঠেছে, এর ফলে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাবে', এই বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ১৯২৭ নভেম্বরে রুশ বলশেভিক পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন এবং ১৯২৯ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া থেকে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়ে মেক্সিকোতে বসবাস করতে থাকেন।

Venus সৌন্দর্য ও প্রেমের রোমান দেবী। গ্রীক দেবী আফ্রোদিতে এবং সিরীয়দের দেবী আস্তার্তের সঙ্গে অভিন্ন বলে এঁকে মনে করা হয়। সিথেরা দ্বীপের কাছে সফেন সমুদ্র থেকে এঁর উত্থান। কুৎসিততম দেবতা হেফাইস্তোসের (ভালকান) সঙ্গে জিউস এঁর বিবাহ দেন। বিশ্বাস ভঙ্গ করে আরেসের (মার্স) অঙ্কশায়িনী হওয়ায় দেবতাদের উপহাসের পাত্রী হন। আরেসের ঔরসে কন্যা হারমোনিয়া, আরেস, জিউস বা হের্মেসের ঔরসে পুত্র এরোসের (কিউপিড), হের্মেসের ঔরসে পুত্র হের্মাফ্রোদিতাস এবং দিওনিসাসের (ব্যাকাস) ঔরসে পুত্র প্রিয়াপাসের জন্ম দেন। আদোনিস

এবং আনকিসেসের সঙ্গেও ইনি প্রণয়াসক্ত হন। আনকিসেসের ঔরসে পুত্র এলিয়াসের জন্ম দেন। হেরা এবং আথেনের সঙ্গে স্বর্ণআপেল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিস এঁকে পুরস্কার দেওয়ায় ত্রয়ের যুদ্ধের পটভূমি রচিত হয়। বহু ভাস্কর এঁর মূর্তি রচনা করেছেন।

da Vinci, Leonardo ১৪৫২-১৫২৯। বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর, ভাস্কর ও ইঞ্জিনিয়র। ভেরোচিওর শিষ্য হিসাবে কিছুদিন ফ্লোরেন্সে কাজ করেন। পরে মিলানের ডিউক লুদোভিকো ফোর্জার চাকুরি করেন। এইখানে বিখ্যাত ফ্রেস্কোচিত্র 'লাস্ট সাপার' আঁকেন। পরে রোমে যান এবং শেষে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের অধীনে কাজ করেন। আঁবোয়াজে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর আঁকা বিখ্যাত চিত্রের মধ্যে 'লা জিয়োকোন্দা' বা মোনালিসার প্রতিকৃতি লুভ্রেতে রক্ষিত আছে। শিল্প ও বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু নিবন্ধ রচনা করেন।

Washington, G. (১৭৩২-৯৯)। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে জন্ম। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে কন্টিনেন্টাল ফোর্সের সেনাধ্যক্ষ হিসাবে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি (১৭৮৯)। মহান চরিত্র, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার জন্য সুবিখ্যাত।

Wasserman, Jokob (১৮৭৩-১৯৩৪) জার্মান ঔপন্যাসিক। Christian Wahnschaffe (১৯১৯)। The worlds' Illusion নামে ১৯২০তে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত। নামে বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাসে তিনি প্রথম যুগের খৃষ্টধর্মের নিঃস্বার্থপরতায় প্রত্যাবর্তনের উপর জোর দেন। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে Casper Hauser (১৯০৯) অন্যতম।

Wellington, Duke of (Ist)। ১৭৬৯-১৮৫২। ইংরেজ সেনাপতি ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্।

Wells, H.G. ১৮৬৬-১৯৪৬। ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও লেখক। ১৮৯৩ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। তারপর সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণভাবে যোগ দেন। এঁর উপন্যাসগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) অলীক ও কল্পনাশ্রয়ী রোমান্স : চাঁদ, ভবিষ্যৎ বা আকাশের মত বাইরে থেকে মানুষের জীবনকে দেখেছেন এই সব রচনায়। (২) চরিত্র ও হাস্যরস প্রধান উপন্যাস এবং (৩) আলোচনাধর্মী উপন্যাস—মানবজাতির মতাদর্শ ও প্রগতি সেখানে মুখ্যতঃ আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে Short History of the world, The Science of Life। শেষোক্ত গ্রন্থটি জুলিয়ান হাক্সলি ও জি. পি. ওয়েলসের সঙ্গে একত্রে রচিত।

Willson, Woodrow মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৮তম রাষ্ট্রপতি। ১৮৫৬-১৯২৪।

Xenophon খৃঃ পূঃ ৪৩০ ?—। গ্রীক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। আথেন্সের

মানুষ। সক্রাতেসের শিষ্য। স্পার্তার পক্ষে যুদ্ধ করার অভিযোগে (৩৯৪ খৃঃ পূঃ) আথেন্স থেকে নির্বাসিত হন। পরে সেই আদেশ প্রত্যাহৃত হলেও ওলিম্পিয়ার কাছাকাছিই বাস করতে থাকেন। ৩৫৫ খৃঃ পূঃ নাগাদ সম্ভবতঃ করিন্থে তাঁর মৃত্যু হয়। আনাবাসিস, হেলেনিকা নামে ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে সক্রাতেসের 'মেমোরাবিলিয়া' ও 'সিম্পোসিয়াম' অন্যতম। মহান দার্শনিক সক্রাতেসের নীতিসূত্রগুলি ও চরিত্র এই গ্রন্থ দুটিতে উদ্ঘাটিত।

Yahweh কথিত আছে জিহোভার পূর্বতন নাম এটি। কথাটির অর্থ 'যাঁর অস্তিত্ব আছে,' 'স্বয়ম্ভু'। ইহুদীপুরাণের ঈশ্বরের ব্যক্তিনাম হল জিহোভা।

Zoroastrianism ম্যাগীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জরথুষ্ট্রের গ্রীক নামরূপ। পারস্যের অধিবাসী জরথুষ্ট্র খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের মানুষ বলে মনে করা হয়। সাইরাস, ক্যামবিসেস ও দারিয়ুসের রাজত্বকালের মানুষ। এই ধর্মমত অনুসারে দুটি প্রধান আত্মার অস্তিত্ব আছে—আহুর মাজদা বা ওরমাজ্দ্, এবং অহ্রীমান। ওরমাজ্দ্ জ্ঞানী, আলোক ও মঙ্গলের আত্মা। অহ্রীমান হল অমঙ্গল ও অন্ধকারের আত্মা। জগতে এই দুই আত্মার সংঘর্ষ চলছে, ওরমাজ্দ্ সৃষ্ট স্বাধীন সত্তা মানুষের মধ্যে এই সংঘর্ষ কেন্দ্রীভূত। পরকাল, শাশ্বত শাস্তি ও শাশ্বত মৃত্যু এই মতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

Zeus গ্রীক দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। বিভিন্ন জাতির পুরাণকাহিনী এর মধ্যে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকের গ্রীক কবি হেসিয়দের মতে জিউস ক্রোনোস ও রিয়ার পুত্র। পিতা ক্রোনোসের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করে রিয়া একে কোরিবান্তেদের হাতে সমর্পণ করে মাউন্ট ইদাতে (ক্রীট) নিয়ে গিয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। জগতের রাজা পিতা ক্রোনোসকে পরাস্ত করে ইনি সমুদ্রের সাম্রাজ্য দান করেন ভাই পোসেইদনকে (নেপচুন) আর নরকের রাজত্ব দেন হেদিসকে (প্লুতো)। স্বর্গে দৈত্যদের আক্রমণকে প্রতিরোধ করে তাদের ধ্বংস করেন। পুরাণে কথিত আছে যে ভগ্নী হেরা (জুনো) এবং থেমিস ও সেরেস নামের অন্যান্য দেবীদের বিবাহ করেন। বিভিন্ন বেশে অনেক মানবীর সঙ্গেও প্রণয়লিপ্ত হন; স্বর্ণবৃষ্টি হিসাবে দানায়ের সঙ্গে, রাজহংসের রূপে লেদার সঙ্গে, ষাঁড়ের রূপ ধরে ইউরোপার সঙ্গে, দিয়ানার রূপে কালিস্তোর সঙ্গে এবং আমফিত্রিয়ন রূপে আলকমেনার সঙ্গে মিলিত হন।

॥ কয়েকটি সমার্থক শব্দ ॥

absolute অনপেক্ষ
abstraction বিমূর্তন
action ক্রিয়া/কর্ম
adaptation অভিযোজন
affect আবেগোদ্দীপক
altruism পরার্থবাদ
amalgamation শিল্প-সংযুক্তি
anabolism অতিরিক্ত গঠনপ্রক্রিয়া
antecedent cause পূর্বগামী হেতু
antecedent motive পূর্বগামী উদ্দেশ্য
apparatus সরঞ্জাম
aptitude প্রবণতা
arbitrary বিধিবহির্ভূত
archetypal আদি-রূপাত্মক
arrangement বিন্যাস
aspect দিক
assumption পূর্ব-অনুমান
attitude প্রতিন্যাস
autocracy স্বৈরতন্ত্র
'bass' part 'উদারা' অংশ
'becoming' 'হয়ে-ওঠা'
behaviour আচরণ
being সত্তা
category বিধেয়
cathexis কামজ শক্তিলাভ
causality কার্যকারণতা
censor মনের প্রহরী
cerebrum গুরু মস্তিষ্ক

circuit বর্তনী
coereive বলপ্রয়োগকারী/দমনমূলক
cogitation চিন্তন
cognitive জ্ঞানধর্মী
cohesion সংশক্তি
'combination' 'জোট'
communion সম্মিলন
compulsive বাধ্যবাধকতামূলক
conation চেষ্টাশক্তি
concept প্রত্যয়
conditioning সাপেক্ষীভবন
consciousess চেতনা
conservation সংরক্ষণ
constraint বাধানিষেধ
contained বিধৃত
contemplation ধ্যান
continuity নিরবচ্ছিন্নতা
'conversion' সৎপথে প্রত্যাবর্তন।
coordinate সংবদ্ধ করা
corporate State নিগমিত বা নিগমবদ্ধ রাষ্ট্র
correspondence সাযুজ্য
cortex গুরু মস্তিষ্কের বহিঃস্তর
cosmology বিশ্বতত্ত্ব
counterponit বিবাদী স্বরবিন্দু
curative pedagogy আরোগ্যমূলক শিক্ষাবিজ্ঞান।
denouement উদ্ঘাটন (পর্ব)

desideratum বাঞ্ছনীয় অথচ অবিদ্যমান সামগ্রী।
determinism নির্বন্ধতা (বাদ)
de'tour বিকল্প
developmeut বিকাশ
differentiation পৃথকীভবন
disintegration বিযুক্তি
displacement অভিক্রান্তি
dissolution বিলয়
divers et ondayant ভিন্ন ও পরিবর্তনশীল
diverted ভিন্নমুখীকৃত
Divine providence বিধিলিপি
doctrine বিশ্বাসমূলক তত্ত্ব
doctrinal শাস্ত্রগত
dole অনুদান
eclecticism সর্বশাস্ত্রসারবাদ
ego অহং
elaborate বিস্তারিত
emanation ক্ষরণ
empirical অভিজ্ঞতামূলক
engress পরিব্যাপ্ত করা
entelechy প্রকৃতাপুর
enterpreneur (শিল্প) উদ্যোক্তা
entity সামগ্রী
eretogenous কামাত্মক
erethism অস্বাভাবিক বৃদ্ধি
Eros প্রাণশক্তি
eternal শাশ্বত
ethies নীতিশাস্ত্র
eugenics সুপ্রজননবিদ্যা
exclusive অসম্পৃক্ত
extension সম্প্রসারণ
fallacy হেত্বাভাস
fetishism অন্ধভক্তি
first cause আদিকারণ
form রূপ
freedom স্বাধীনতা
fulcrum আলম্ব
function ক্রিয়া
fusion সংযুক্তি
generalised সামান্যীকৃত/সাধারণীকৃত
gene জনি
genetics জনিবিদ্যা
genotype জনিরূপ
heredity বংশগতি
hierarchy ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ
hydraulics উদকবিদ্যা
hypostatised স্বতন্ত্র সত্তাবৎগণ্য,
Id অদস
idea ভাব
identity অভেদ
illusion বিভ্রম
Immaculate Conception আদিপাপ থেকে মুক্ত গর্ভসঞ্চার।
impulse ভাবাবেগ
individuation স্বতন্ত্রীভবন
industrial capitalism শিল্প-পুঁজিবাদ
informous অ-রূপপ্রাপ্ত
ingression বলপূর্বক প্রবেশ
inhibition বাধ
innate সহজাত

innervation উদ্দীপন
insertion সন্নিবেশ
instinct সহজপ্রবৃত্তি
instrument উপকরণ
intangibility অস্পর্শবেদিতা
integration সমন্বয়সাধন
intergrade স্তরে স্তরে ভাগ করা
intelligence বুদ্ধিবৃত্তি
interference ব্যভিচার
intuition স্বজ্ঞা
invariant অপরিবর্তনীয়
involuntary ইচ্ছা-নিরপেক্ষ
iridiscence চিত্রাভা
irradiation বিকিরণ
justice ন্যায়বিচার
kinetics গতিবিদ্যা
liberty বন্ধনমুক্তি / স্বাধীনতা
libido কাম
'life-force' 'প্রাণ-শক্তি'
like সদৃশ
logic তর্কশাস্ত্র
limited liability সীমাবদ্ধ দায়
live circuit ক্রিয়াবাহী বর্তনী
magic যাদু
memory-trace স্মৃতিপথচিহ্ন
melody সুর
metaphysics তত্ত্ববিদ্যা
mimic অনুকরণধর্মী
metagoic উচ্চ প্রাণীসুলভ
minemic স্মৃতিসহায়ক
metabolism বিপাকক্রিয়া
modification রূপান্তর
movement চলন
mutation রূপান্তর
myth পুরাণকাহিণী
Means Test সঙ্গতি পরীক্ষা
narcissism আত্মকাম
necessity প্রয়োজন/আবশ্যকীয়তা
negation প্রতিষেধ
nervous system স্নায়ু-ব্যবস্থা
neurism স্নায়ুক্রিয়া
neurone স্নায়ুকণিকা
neurotic স্নায়ুরোগী
non-restistance অ-প্রতিরোধ
obsession আবেশিক বায়ু
occasionalism উপলক্ষ্যবাদ
outogenesis স্বতন্ত্র প্রাণীর বিবর্তন
organ দেহযন্ত্র/সাধনযন্ত্র
pacifism নিষ্ক্রিয়তাবাদ
paradox আপাতঃ অসম্ভাব্যতা
participation mystique অংশগ্রহণকারী অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা
particle বস্তুকণা
pathology ব্যাধিবিজ্ঞান
pattern ছক/সামগ্রিক আকার
perception প্রত্যক্ষ
personal কাল্পনিক চরিত্র
phenomenon প্রতিভাস/প্রক্রিয়া
phenotype 'প্রকাশিত লক্ষণ'
phylogenesis জীবজগতের বিবর্তন
physiology শারীরবিদ্যা
phosporecence অনুপ্রভ

polymorphous pervers বহুমুখী কামবিকৃতিসম্পন্ন
precise সুনির্দিষ্ট
predestination অদৃষ্ট
prime mover আদি গতিদাতা
process প্রক্রিয়া
projection প্রক্ষেপ
protozoic আদ্য প্রাণীসুলভ
psyche মানস
psychism মানস-ক্রিয়া
psychology মনোবিদ্যা
ratiocination আরোহীতর্কবিদ্যা
rationalisation যুক্ত্যাভাস
regression প্রত্যাবৃত্তি
repression অবদমন
resonance অনুরণন
response প্রতিক্রিয়া
'rings' 'শিল্প-চক্র'
salvation মুক্তি
savage বন্য (সমাজ)
self expression আত্মপ্রকাশ
self-value স্বকীয়-মূল্য
sensibility ইন্দ্রিয়ানুভূতি
sensitiveness সংবেদনশীলতা
sensory ইন্দ্রিয়জ
service সেবা
somatic দেহকোষগত
speculation ভাবনাচিন্তা
spinal reflex সুষুম্না প্রতিবর্ত
stable সপ্রতিষ্ঠ
stimuli উদ্দীপক
sublimation উদ্গতি
substrate অধঃস্তর
super ego অধিশাস্তা
superman অতিমানব
sui generis স্বজাতীয়
survival value উদ্বর্তন মূল্য
synthesis সংশ্লেষণ
system ব্যবস্থা
teleulogy উদ্যোগসাধনবাদ
tension চাপ
Thanatos মৃত্যু-শক্তি
theology ঈশ্বরতত্ত্ব
totalitarian সর্বগ্রাসী
Total return সামগ্রিক মূল্য
transcendency অতিক্রমণ
transference সঞ্চালন
'treble' part 'তারা' অংশ
tribe উপজাতি
Trinity ত্রি-বিভূতি
Unanisme একমতাবলম্বিতা
Unconscious অচেতন/অবচেতন
undertone অনুস্বর
unlike অ-সদৃশ
unlikeness বিষমধর্মিতা
unstalle অপ্রতিষ্ঠ
use উপযোগ
utilitarian উপযোগিতামূলক
utopia কাল্পনিক সুখরাজ্য
Variable ভেদ্য
Variation প্রকরণ
Violence হিংসা
Visceral আন্তযন্ত্রীয়
Volition ইচ্ছন ক্রিয়া
Volvex colony কুণ্ডলীকৃত উপনিবেশ